

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রকাশক। তরুণ সেনগুপ্ত
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রা) লিমিটেড
৪।৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রক। নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ। সুবোধ দাশগুপ্ত

বাঁধাই। নবগ্রন্থনা
৫৯।১বি পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

# গোবিন্দ সামন্ত

## গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

'গোবিন্দ সামন্ত' মূল ইংরেজিতে পড়েননি, চল্লিশোর্ধ্বে' পৌঁছোনো এমন শিক্ষিত বাঙালী নেই বললেই হয়। এই বইয়ের অধুনা-বিস্মৃত লেখক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ১৮২৪ সালে ১৮ই ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার সোনা-পলাশী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। লালবিহারী তাঁর সম্পাদিত ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' ( প্রথম প্রকাশ ১৮৭২ ) পত্রিকায় Recollections of My School Days' by An Old Bengali Boy ছদ্মনামে একটি ধারা-বাহিক বাল্যস্মৃতিমূলক রচনা লেখেন। সেখানে তিনি নিজের গ্রামের নাম অজ্ঞাত কারণে দিয়েছেন 'তালপুর'। সেজন্য তাঁর জীবনীকারেরা ভুল করে 'তালপুর' গ্রামকেই তাঁর প্রকৃত জন্মস্থান বলে নির্দেশ করেছেন। এই সোনা-পলাশী গ্রাম লালবিহারীর 'গোবিন্দ সামন্ত' বইতে 'কাঞ্চনপুর' রূপে দেখা দিয়েছে। এই গ্রামে এক স্বল্পবিত্ত সুবর্ণবণিক পরিবারে লালবিহারীর জন্ম। তাঁর বাবার নাম রাধাকান্ত, ছোট ভাইয়ের নাম বনমালী। এঁদের নাম থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এঁরা বৈষ্ণব ধর্মনিষ্ঠ পরিবার। চৈতন্য দেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রভাবে বাংলাদেশে বিশেষ করে সুবর্ণবণিক সমাজ বৈষ্ণবধর্মের দিকে ঝোঁকে। ছোটবেলায় লালবিহারীর নাম ছিল 'কালা গোপাল'। তাঁর বাবা কলকাতায় থাকতেন, সামান্য বিল-সরকার ও দালালির কাজ করতেন, ইংরেজি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না। তবে শেয়ার, প্রমিসরি নোট, কোম্পানির কাগজ, প্রিমিয়াম, ডিস্‌কাউণ্ট ইত্যাদি শব্দ ও

তাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল ছিলেন। তখনকার দিনে এসব কাজ করে লোকে কৌশলে বা অসদুপায়ে বেশ দু' পয়সা রোজগার করত। কিন্তু লালবিহারীর বাবা দরিদ্র ও সৎ ছিলেন, অন্তরে ধর্মপ্রাণ ছিলেন, মুখে তাঁর হরিনাম লেগেই থাকত। বাবার কথা লালবিহারী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। আর স্নেহসলিলা মায়ের কথা বেদনার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন।

গ্রামের গুরুমশায় গোপীকান্তের পাঠশালায় আর পাঁচটি বালকের মতই লালবিহারীর পড়াশুনা শুরু হল। শুভদিন-ক্ষণ দেখে তাঁর বাল্যশিক্ষার সূচনা হল। তিনি ঐ পাঠশালায় রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ও 'শিশু সেবধি' পড়েছিলেন আর শিখেছিলেন গণিত। এর প্রায় অবিকল বর্ণনা আছে 'গোবিন্দ সামন্ত' বইতে, গোবিন্দের পাঠশালায় শিক্ষা অংশে।

নয় বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে লালবিহারী কলকাতায় আসেন। তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়া শেখাবেন। কিন্তু ইংরেজি লেখাপড়া শেখানো সেই ১৮৩৩-৩৪ সালে খুব সহজ ছিল না। কলকাতায় 'হিন্দু কলেজে' ধনী ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের ছেলেরাই পড়ত। গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল অর্থাৎ 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'ও দরিদ্র ছেলেদের ভর্তি করত না। হেয়ার সাহেবের স্কুল অর্থাৎ 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি' পরিচালিত স্কুলে ভর্তি হওয়াও কঠিন ছিল। হেয়ার সাহেবের পাল্কীর পিছন পিছন ছেলেরা ''me poor boy, have pity on me, me take in your school' বলে ছুটত। এইভাবে ছুটে রামতনু লাহিড়ী, 'ফ্রি বালক' রূপে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। কিন্তু লালবিহারী যখন কলকাতায় এলেন ঐ সময় হেয়ার তাঁর স্কুলে আগের মতো 'ফ্রি বালক' নেওয়া বন্ধ করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডাফ স্কটিশমিশনারী, ১৮৩০ সালে কলকাতায় আসেন। তিনি যখন প্রথম স্কুল খোলেন তখন সহায়তা পেয়েছিলেন রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) কাছ থেকে। রামমোহন রায় বিলেত চলে গেলে (১৮৩০) তাঁর ছেলে রাধাপ্রসাদ রায় ডাফের স্কুল অথাৎ 'জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস্‌টিট্যুশনে'র সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁরই সুপারিশের জোরে লালবিহারী ডাফের স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে বেতন দিতে হতো না। ডাফের স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করায় আত্মীয়স্বজনেরা ভয় দেখিয়েছিলেন তাঁর বাবাকে যে, ছেলে খ্রীষ্টান হয়ে যাবে।

লালবিহারীর বাবা শুধু ভাগ্যের দোহাই দিয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজনদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। ডাফ শুধু শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশে আসেননি। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে হিন্দু ছাত্রদের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত করে তোলা এবং পরে তাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করাই তাঁর ব্রত। তাঁর লেখা 'India and Indian Mission' বইতে তার পরিচয় আছে। ১৮৩২ সালে হিন্দুকলেজের ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৮১৩-৮৫) খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন ডাফ স্বয়ং।

লালবিহারী স্কুলে বেশ ভালো ফল দেখাতে লাগলেন। তখনকার দিনে পরীক্ষা নেওয়া হতো টাউন হলে। লাট-ভগিনী মিস্ ইডেন পরীক্ষার সময় পরিদর্শনে আসতেন। লালবিহারী পরীক্ষায় পর-পর সাফল্য অর্জন করেন ও স্বর্ণপদক পুরস্কার পান।

এই সময় দুটি ঘটনা ঘটল। এক, ডাফের ১৮৩৪ সালে স্বদেশযাত্রা; দুই, লালবিহারীর বাবার পরলোকগমন (১৮৩৮)। এক জ্ঞাতি ভাইয়ের বাসায় থেকে অতিকষ্টে লালবিহারী পড়াশোনা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু 'হিন্দু কলেজে' পড়বার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে তখনো জাগরূক ছিল। তিনি জানতেন, 'স্কুল সোসাইটি'র টাকায় হেয়ার স্কুলের কয়েকটি নির্বাচিত ছাত্র হিন্দুকলেজে পড়বার সুযোগ পায়। তাই ভেবে তিনি হেয়ারের কাছে গেলেন। হেয়ারের সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু হেয়ার যেই শুনলেন লালবিহারী ডাফের স্কুলের ছাত্র তখনই তিনি কোনো সহায়তা করতে চাইলেন না। হেয়ার নাস্তিক অথবা 'সংশয়বাদী' ছিলেন। মিশনারী কর্তৃক হিন্দু ছাত্রদের খ্রীষ্টান করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি লালবিহারীকে বললেন "You read the New Testament ; You are half a Christian. You will spoil my boys." ক্ষুব্ধ লালবিহারী ফিরে এলেন তাঁর পুরানো স্কুলে। সেদিন যদি হেয়ার তাঁকে হিন্দুকলেজে স্থান দিতেন তাহলে লালবিহারী খ্রীষ্টান হতেন বলে মনে হয়না।

লালবিহারী তখনো খ্রীষ্টান হননি। দারুণ অর্থকষ্ট, বই-পত্তর কিনতে পারতেন না। শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে বই এনে পড়ে বা নকল করে নিয়ে ফেরত দিতেন। একখানি ইংরেজি অভিধানের খুব দরকার ছিল কিন্তু কিনবার মতো টাকা তাঁর ছিলনা। শেষে একজন মুসলমান হুকারের

( যাকে সকলে 'চাচা' বলত ) কাছ থেকে কয়েক আনা দিয়ে একখানি "A" বর্জিত পুরোনো অভিধান কেনেন। হিউম্, জন্সন, গিবন্, অ্যাডিসন্ প্রভৃতি প্রখ্যাত মনীষী লেখকদের অনেক বই তিনি এই হকারের কাছ থেকে ধারস্বরূপ নিয়ে পড়ে আবার ফেরত দিতেন। এই সময় তিনি তাঁর মায়ের গহনা বিক্রী করতে বাধ্য হন।

এদিকে ১৮৪৩ সালে ডাফ কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন লালবিহারী খ্রীষ্টধর্মের প্রতি ঝুঁকেছেন। লালবিহারীর 'জর্ণাল' থেকে জানা যায় যে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতিও সাময়িক ভাবে আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। তখন 'তত্ত্ব-বোধিনী সভা'র যুগ। ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বার হয়। ১৮৪৩ সালের ২রা জুলাই তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। এর কিছুদিন আগে মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন ( ১৮৪৩, ৯ই ফেব্রুয়ারি )।

এই সময় বিলেতে এক গোলমাল দেখা দিল। স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় চার্চের উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে সেখানে গুরুতর সংঘাতের সৃষ্টি হলো। ডাফ এ সম্পর্কে লিখলেন :

> "Because the British State now denies all Spiritual independence to the Church as established by law in Scotland and······encouraged judicial interference with almost every sphere of the Church's function".
>
> ( 'Why Separate' )

এই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে দুটি দল হলো। ডাফ 'বিদ্রোহী' দলের নেতারূপে নতুন চার্চ গড়লেন, তার নাম দিলেন "Free Protesting Church of Scotland". ডাফ লালবিহারীকে ডেকে কোনো একটি দল বেছে নিতে বলায় তিনি 'Protesting Church'-এর সঙ্গে থাকবেন বলে জানালেন। ডাফ নতুন স্কুল গড়লেন রাধানাথ সেনের বাড়িতে 'দি ফ্রী চার্চ ইনস্‌টিটুশান'। লালবিহারীর জীবনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পর্ব বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনায় বাস, শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচার ( ১৮৫১ )। এরপর তিনি ১৮৫৫ সালে কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে 'ফ্রী চার্চে'র ধর্মযাজক নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁর সংঘাত বাধল ডাফ সাহেবের সঙ্গে ডাফ নিয়ম করেছিলেন, চার্চগুলির উচ্চতম 'পরিচালক কমিটি'তে কোনে

'নেটিভ' বা দেশীয় খ্রীষ্টানদের স্থান দেওয়া হবে না। 'মিশন্ কাউন্সিল'-এ সাদা-কালোর এই ভেদনীতি লালবিহারী কিন্তু বরদাস্ত করতে রাজি হলেন না। তিনি এর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ পাঠালেন স্কটল্যাণ্ডে সর্বোচ্চ কমিটির কাছে। ডাফ খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তখন লালবিহারী স্থির করলেন তিনি ডাফের 'মিশন' ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু ডাফের সনির্বন্ধ অনুরোধে এক বছরের জন্য 'মিশন' ত্যাগ প্রস্তাব স্থগিত রেখে অম্বিকা-কালনায় চলে গেলেন এবং শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচারের সঙ্গে 'সম্বাদ অরুণোদয়' নামে একখানি বাংলা পাক্ষিক-পত্র সম্পাদনা করতে লাগলেন। ১৮৫৬ সালের আগষ্ট মাস থেকে এই সচিত্র পাক্ষিক পত্রটি প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটি ১৮৬২ সাল অবধি চলেছিল বলে জানা যায়।

হিন্দু জনসাধারণের মনের অন্ধকার দূর করবে খ্রীষ্টধর্মের উদার অরুণোদয়-এই মনোভাব অবশ্যই বাঙলা ভাষার প্রকাশিত এই পাক্ষিক পত্রিকাটির ছিল। কিন্তু পাক্ষিক সংবাদ, সচিত্র বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ বিষয় ( মনসা পূজার ঝাঁপান, কাষ্ঠমার্জার, পেচক, প্রজাপতি, জ্যোতির্বিদ্যা পাঠের ফল প্রভৃতি ), মহম্মদের জীবনচরিত, ব্রিটিশ রাজ্য প্রণালী, Tho Hermit কাব্যের পদ্যানুবাদ ধরণের লেখাও বার হত। মাতৃভাষা-প্রীতি লালবিহারীর যথেষ্ট গভীর ছিল— 'অরুণোদয়' পড়লে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

(ক) "বঙ্গভাষাকে বঙ্গদেশের মাতৃভাষা বলিতে হইবে, যে ব্যক্তি মাতৃভাষাতে বঞ্চিত সে বঙ্গদেশের তাবৎ সুখেই বঞ্চিত।"

( ১ অগষ্ট ১৮৫৮ )

(খ) "দেশভাষা বিশিষ্টরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া যে-কোন ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহাতে অবশ্যই কৃতকার্য হওনের সম্ভাবনা। অতএব স্ব স্ব দেশীয় ভাষা সর্বাগ্রে শিক্ষা করিয়া পশ্চাৎ দেশান্তরীয় ভাষাজ্ঞান সর্বসাধারণের কর্তব্য।" ( তদেব )

'বঙ্গভাষা শিক্ষার উপায় কি?' 'বঙ্গভাষা শিক্ষার উপকার কি?' প্রভৃতি রচনার কথাও এইসূত্রে স্মরণীয়! এই 'অরুণোদয়' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে "ভীরুভূপতির উপাখ্যান" নামে "বঙ্গীয় উপকথা" বার হয় ( ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ )। এখানেই তাঁর পরবর্তীকালের অমর বই "Folk Tales of Bengal" এর সূচনা। আর 'চন্দ্রমুখী' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক উপাখ্যান

লালবিহারী লেখেন ধারাবাহিকরূপে এই 'অরুণোদয়' পত্রিকায়। পরে "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান" নামে ১৮৫৯ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষা, বাঙালীর সামাজিক জীবন সম্বন্ধে লালবিহারীর অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁর Folk Tales of Bengal এবং Govinda Samanta গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া তিনি বাংলার খেলাধূলা, বাংলার পার্বন ও উৎসব সম্পর্কে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন 'ক্যালকাটা রেভিউ' পত্রিকায় ( জুন ১৮৫১, জুলাই ১৮৫২ )।

এই অম্বিকা-কালনায় বাসকালে ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খ্রীষ্টান মিশনগুলি সম্পর্কে কলিন্ ম্যাকেনজির লেখা 'The Mission Camp' নামে একখানি বই লালবিহারীর হাতে আসে। তার থেকে তিনি জানতে পারেন গুজরাটের পার্শি সমাজের খ্রীষ্টান রেভারেণ্ড হরমদ্জি পেস্টনজির বিদুষী কন্যার নাম।

এই কন্যাটিকে বিবাহ করার আশা লালবিহারী পোষণ করতে থাকেন। তিনি ঐ মহিলার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে লাগলেন। ফলে তাঁর এবার সুরাটে যাবার প্রয়োজন হল। কিন্তু তখন সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) শুরু হয়ে গেছে। নানা বাধা-বিঘ্নের পর শেষ পর্যন্ত ১৮৫৯ সালের ২৬শে নভেম্বর লালবিহারী ও শ্রীমতী বাচুভাই-এর 'এনগেজমেণ্ট' হয় এবং তাঁদের বিবাহ হয় ১৮৬০ সালের ২রা জানুয়ারী। বিবাহের পর সস্ত্রীক লালবিহারী কলকাতায় ফিরে এলে ডাফ তাঁদের খুব সমাদর করেন। ইতিমধ্যে ইউয়ার্ট সাহেব পরলোকগত হন এবং তাঁর জায়গায় লালবিহারী কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের চার্চের ভার নেন, এই কার্যভার ছিল "entirely independent of Mission Council." এখানে দীর্ঘ সাত বছর (১৮৬০-৬৭) ছিলেন সস্ত্রীক লালবিহারী, তখন তাঁর মাসিক আয় সর্বসমেত দেড়শ' টাকা। তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃতের পরীক্ষক।

এরপর লালবিহারী সরকারী শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন। তার একটু ইতিহাস আছে। ১৮৬৮ সালে উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় তার ফলে বহু প্রাণহানি হয়। ছোটলাট স্যর সেসিল বীডনের নিশ্চেষ্টতায় এবং ঔদাসীন্যে অবস্থার অবনতি ঘটে। কৃষ্ণদাস পাল ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ

তাঁদের সম্পাদিত যথাক্রমে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বীডনের কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু লালবিহারী তাঁর সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক 'Friday Review' পত্রিকায় বীডনকে দোষমুক্ত করার প্রয়াস পান। তারই পুরস্কারস্বরূপ বহরমপুর কলেজের প্রধান শিক্ষকের পদ তিনি পান। ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন।

১৮৭২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি বহরমপুরে ছিলেন। ১৮৭২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৮৮৬ ডিসেম্বর অবধি তিনি হুগলী মহসিন কলেজের ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। হুগলী কলেজে চাকরিপ্রাপ্তির ব্যাপারে স্যর রিচার্ড টেম্পল তাঁকে সহায়তা করেন। স্যর টেম্পল তাঁর "Men and Events of My Time in India' বইতে লালবিহারীর উচ্চপ্রশংসা করেছেন (পৃঃ ৪২৯)।

লালবিহারী হুগলী কলেজে মোট ষোলবছর অধ্যাপনা করেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্যদর্শনের অধ্যাপনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে ১৮৮৮ সালে অবসর গ্রহণ করলেও চাকরী জীবনে তিনি দুবার কার্যকাল বৃদ্ধির ( Extension ) আদেশ পান। অবশ্য তাঁর চাকরির পদোন্নতির ব্যাপারে সাদা-কালোর মধ্যে বৈষম্যনীতি সরকারী শিক্ষাবিভাগ অনুসরণ করেছিলেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ গ্রিফিথসের কার্যকাল শেষ হওয়ায় ঐ কলেজের সিনিয়র ও কৃতী অধ্যাপক হিসেবে উক্ত পদ তাঁরই প্রাপ্য ছিল কিন্তু তাঁকে ঐ পদ দেওয়া হয় না। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এ সম্পর্কে লিখেছিল "but as of black colour being denied the post ( ১৬ই জুলাই ১৮০৩ )।

'অরুণোদয়' পত্রিকায় লালবিহারীর ধারাবাহিক রচনা 'চন্দ্রমুখী' প্রকাশিত হয়। ১২৬৬ ( ১৮৫৯ ) সালে বই আকারে 'চন্দ্রমুখী' দেখা দেয়। তার অনেক দিন পরে লালবিহারী যখন বহরমপুরে তখন সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রও (১৮৩৮-৯৪ )ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে লালবিহারীর রেষারেষি ছিল, লালবিহারীর ধারণা ছিল তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে ভালো ইংরেজি জানেন। কাজেই যখন Grant Hall Club এর সভাপতি পদের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের নাম প্রস্তাবিত হলো, তখন লালবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করে দিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র সূচনা হয় বহরমপুরে, এরই প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে

লালবিহারী বার করলেন 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' ( অগষ্ট ১৮৭২ )। যাঁরা পত্রিকাখানিকে সহায়তা করবেন জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের লেখকেরা। তাঁরা ছাড়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রকুমার দে, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিরা। এই 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় ১৮৭৫ সালের অগষ্ট মাস থেকে Folk Tales of Bengal এর সূচনা হয়—কথকের জায়গায় নাম লেখা থাকত—"Mother Gooso"। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহোদয় "ঠাকুরমার ঝুলি"র ভূমিকায় লিখেছেন: "ধন্য আমাদের লালবিহারী-আমাদের বরেণ্য পথপ্রদর্শক!"

এর আগে ১৮৭১ সালে উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইংরেজী ভাষায় রচিত "Social and Domestic Life of the Rural Population and Working Classes in Bengal" পর্যায়ে রচনার জন্য পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেন। লালবিহারীর 'Bengal Peasant Life' ( ১৮৭২ ) রচনা তারই ফল। অবশ্য তাঁর রচনাই যে শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী হয়েছে সে খবর পাওয়া যায় ১৮৭৪ সালে। তখন লালবিহারী ঐ রচনাকে পরিবর্ধিত করেন এবং দুখণ্ডে প্রকাশিত এই বইয়ের নাম দেন Govinda Samanta" ( ১৮৭৪ )। প্রথমখণ্ডে তাঁর নিজের ব্যক্তিজীবনের বাল্যস্মৃতিকে আশ্রয় করেছেন। বর্ধমান-রাঢ় অঞ্চলের আগুরী সম্প্রদায়ের দরিদ্র কৃষিজীবী পরিবারের অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। সূতিকাগৃহ থেকে শুরু করে গ্রামের পাঠশালা, গণক ঠাকুর, বিয়ের ঘটকালি, বাসরঘর, ভূত-নামানো, সতীদাহ, বালবিধবাদের দুঃখ, মেয়েলি বৈঠকের অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন লালবিহারী। দ্বিতীয় খণ্ডে সাধারণ দরিদ্র প্রজার উপর একদিকে গ্রাম্য জমিদার তার নায়েব গোমস্তা—নিষ্ঠুর লাঠিয়ালদের অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে নির্মম সুদখোর অসাধু মহাজনের অপকৌশল নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে দেখানো হয়েছে। ঘুষখোর দারোগা ও অসৎ সরকারী কর্মচারীদের মুখোশও তিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন। এই বইয়ের আর একটি

উল্লেখযোগ্য মিস নীলকরপ্রসঙ্গ। ইংরেজী ভাষায় লেখা হলেও 'Govinda Samanta বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম গদ্য-আখ্যান। এই বইয়ের সবচেয়ে বড় সম্মান বিশ্বখ্যাত জীববিজ্ঞানী চার্লস্ ডারউইনের প্রশংসালাভ। তিনি 'Govinda Samanta' পড়ে প্রকাশক ম্যাকমিলান-দের লিখেছিলেন: "I shall be glad if you would tell him with my compliments how much pleasure and instruction I derived from reading a few years ago Govinda Samanta." (১৮ এপ্রিল ১৮৮১)।

কবি টেনিসনও 'Govinda Samanta' পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

'Govinda Samanta' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন ভূকৈলাসের সত্যবাদী ঘোষাল। তিনি প্রথম খণ্ডের অনুবাদ করেন। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ পাইনি। শিবচন্দ্র মুখার্জি নামে এক ভদ্রলোক ১৮৮৩ সালে উক্ত বইয়ের অনুবাদে অগ্রসর হন। কিন্তু লালবিহারী সংবাদপত্রে চিঠি লিখে ঐ পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন "I warn all concerned that legal proceedings will be taken against any person who publishes the translation of Govinda Samanta into Bengali or any other language" (হিন্দু পেট্রিয়ট, ৬ নভেম্বর ১৮৮৩)।

কাজেই বর্তমান আলোচ্য বইটি Govinda Samanta গ্রন্থের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা রূপ। এই ভাষান্তরিত গ্রন্থটি বাংলা কথাসাহিত্যে সম্পদরূপে গণ্য হবে।

লালবিহারী বৃটিশ রাজত্বের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তিনি সাদা চামড়ার মাতব্বরি বা দৌরাত্ম্য একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। একবার রো এবং ওয়েব সাহেব তাঁদের "Hints to the Study of English" (১৮৭৪) বইয়ের ভূমিকায় বাঙালীদের ইংরেজির ভুল প্রয়োগকে "Babu English" বলে কটাক্ষ করেন। তার জবাবে লালবিহারী ঐ বইয়ের Preface থেকেই প্রতি পৃষ্ঠায় ইংরেজির ভুল দেখাতে লাগলেন এবং মন্তব্য করলেন:

"What shall we say then of two gentlemen who laugh at 'Paboo English' and at the same time commit egregious

grammatical blunders and murder the 'Queen's English', (বেঙ্গল ম্যাগাজিন সেপ্টেম্বর ১৮৭৪)।

তাঁর জীবনীকার ম্যাকফারলন্ সাহেব লালবিহারীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন "He thought for himself and adhered to his convictions. This was especially seen in his intercourse with Europeans towards whom he acted and spoke with a manly freedom."

বাংলার দৈন্য-প্রপীড়িত, অত্যাচারিত চাষী সমাজের প্রতি লালবিহারীর অফুরন্ত দরদ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র সকলেই চাষীর স্বার্থ রক্ষার কথা ভেবেছেন। লালবিহারী চাষী সমাজে যাতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দ্রুত প্রসারিত হয় তার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করেন—এ সম্পর্কে তাঁর একটি বিখ্যাত রচনা 'Compulsory Education in Bengal' (১৮৬৯) উল্লেখযোগ্য। সেজন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'downward filtration of education' নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। এই সূত্রে 'বেথুন সোসাইটি'তে পঠিত তাঁর 'Primary Education in Bengal (১০ ডিসেম্বর, ১৮৬৮) প্রবন্ধটি স্মরণ করা যেতে পারে।

শেষজীবনে লালবিহারী সুখ বা শান্তি পান নি। মৃত্যুর আগে বেশ কিছু কাল ভুগেছিলেন পক্ষাঘাতে, চোখ দুটিও অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বড়ো ছেলে ব্যারিষ্টারি পড়তে বিলেতে যান, তিনি আর দেশে ফেরেননি, বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগ রাখেন নি। কিন্তু অন্ধ কবি মিলটনের মতো লালবিহারীও ঈশ্বরের সামীপ্য বোধ করলেন সেই দারুণ দুর্যোগের রাত্রে। ১৮৯৪ সালের ২৮শে অক্টোবর মর্ত্যের বন্ধন তাঁর ছিন্ন হল।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) যিনি 'ক্যালকাটা রেভিউ' পত্রিকায় তাঁর "সুরধুনী কাব্য" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের লালবিহারীকৃত সমালোচনা পড়ে বিরক্ত হয়ে "জামাই বারিক" নাটক "তোতারাম ভাট" বলে লালবিহারীকে ব্যঙ্গ করেন—সেই দীনবন্ধু "সুরধুনী কাব্য" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লেখেন

বিনোদবাসনা লালবিহারী ধীমান্
সরল-স্বভাব ধীর গম্ভীর বিজ্ঞান,
অবাধে লেখনী চলে, ভাষা মনোহর
মধুর বচনে তুষ্ট মানবনিকর।
খৃষ্টধর্ম অবলম্বী ধর্ম সুধাপান
অভিলাষী দিবানিশি দেশের কল্যাণ।

দীনবন্ধুর এই শ্রদ্ধানিবেদনের সঙ্গে আমরাও নিজেদের কণ্ঠ যুক্ত করি।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

# প্রথম অধ্যায়

---

## পল্লী-ধাত্রী

কাঞ্চনপুর বর্ধমান শহরের প্রায় ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে একটি গ্রাম। বৈশাখ মাসের নিশীথ রা'তে একজন পথিক গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে চলেছে।

বারোটারও বেশী বেজে গিয়েছে। আকাশে চাঁদ নেই। চাঁদ মামা অনেক আগেই গাঁয়ের পশ্চিমপ্রান্তে গাছপালার আড়ালে আত্মগোপন করেছে, লক্ষ লক্ষ তারা ঝিক্ মিক্ ক'রে আলোর অভাব পূরণের ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বাংলা পল্লীর নৈশ পথচারীরা এই সমস্ত তারাকে সংস্কারের বশবর্তী হ'য়ে অবাক বিস্ময়েই দেখে থাকে। তা'রা মনে করে, যে সমস্ত মানুষ ইহলোক হ'তে ইন্দ্রপুরীতে প্রস্থান করেছেন, তারাগুলো তাঁদের উজ্জ্বল চোখ। এই সংস্কার বোধ হয় এখনও তা'রা দূর ক'রতে পারেনি। সর্বত্রই নিস্তব্ধ, নিঝুম ও শান্ত ভাব, কেবল মাত্র মাঝে মাঝে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ও গ্রাম্য চৌকিদারের হাঁক শান্তিকে ব্যাহত করছে। পথিকটি পল্লী বাঙালীর চিরন্তন সম্বল মাত্র একখানা ধুতি পরেই জোরে হেঁটে চলেছে, ধুতির বহরও বেশী নয়, হাঁটু পর্যন্ত কোন রকমে পৌঁচেছে। তা'র হাতে একখানা মোটা বাঁশের লাঠি। রাস্তার মোড় ঘুরতেই অস্পষ্ট একটা মানুষের ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একটা লোক দুয়ারের গোড়ায় বসে আছে। লোকটি চেঁচিয়ে বলে—

'কে যায় ?'

'একজন রায়ত,' পথচারী উত্তর দেয়।

প্রশ্নকারী—আর কেউ নয়, স্বয়ং গ্রাম্য চৌকিদার। সে আবার জিজ্ঞাসা করে—'কোন রায়ত ?'

উত্তর আসে, 'আমি মাণিক সামন্ত।'

চৌকিদার বলে, 'মাণিক সামন্ত এত রাতে ?'

'রূপার মাকে আনতে যাচ্ছি।'

'ও, বুঝেছি, এস, বসে তামাক খাও—তামাক তৈরীই আছে।'

'তুমি খাও—আমার সময় নেই।'

এইরকম বলে মাণিক সামন্ত আগের চেয়েও দ্রুত চলে। পল্লীর গৃহ-বহুল অংশ অতিক্রম করে সে ক্রমে এসে পড়ে প্রান্ত দেশে! সেখানে শুধু আমের বাগান, মাঝে মাঝে দু-চারটে কুঁড়ে ঘর।

এই সমস্ত কুঁড়ে ঘরের একটার সাম্‌নে গিয়ে মাণিক থেমে যায়। সে ডাকে, 'রূপার মা! ও রূপার মা!' প্রথমবার ডাকার পরই অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে মাণিক বুঝতে পারে, রূপার মা এখনও জেগে রয়েছে, কিন্তু সে জবাব পায় না। দ্বিতীয় বার সে ডাকে, তবুও উত্তর নেই, তৃতীয় ডাকও এমনি নিস্ফল হয়ে যায়; চতুর্থবার ডাকার পর রূপার মা জবাব দেয়। তাই ব'লে রূপার মা কি কালা? তা নয়, সে ইচ্ছে করেই চতুর্থবার ডাকার পর জবাব দেয়। বাংলার পল্লী জীবনে কুসংস্কারের অভাব নেই। নিশি বা নৈশ-প্রেতিনী, রাত বারটার পর সরল পল্লীবাসীদের ঘুম থেকে জাগিয়ে নদী বা পুকুরে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারে—পল্লীবাসীদের মনে এই বিশ্বাস। ভূত-প্রেতিনীরা নাকি তিন বারের বেশী ডাকে না। তাই তিনবার অপেক্ষা ক'রে চতুর্থবার ডাকের পর সাড়া দিতে হয়। যাই হোক, এবার রূপার মার দরজা খুলে যায়। মাণিক রূপার মাকে বলে, 'এক্ষুনি যেতে হবে।' রূপার মা মেয়ে রূপাকে আলো জ্বালাতে বলে। কেরোসিনের বাতির স্তিমিত আলোয় রূপার মার কুঁড়ে ঘরের অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠে। চাল দেওয়া মাটির দেওয়ালের ঘর। মেঝের মাঝ-খানে মা ও মেয়ের তালপাতার মাদুরের বিছানা পাতা। চারকোণে

কতকগুলো মাটির হাড়ির সমাবেশ, ঐ সমস্ত হাড়িতে চাল, আনাজ, তেতুল, লবণ, সরষের তেল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। গৃহে আসবাব পত্রের বালাই নেই। বাগ্দির মেয়ে রূপার মা, দারিদ্র্যই তার সম্বল। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, একটু বেঁটে ধরনের ছিপ-ছিপে নারী—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুক্নো পদ্মের ডাটার মত কুঞ্চিত, অধি-কাংশ দাঁতই পড়ে গিয়েছে, যে দু-চারটে আছে, তা এত দূরে দূরে অবস্থিত, যার ফলে আশী বছরের বুড়ির মত সে কথা বলে। রূপার মার প্রকৃত নাম কি তা খুব কম লোকেই জানে। লোকে তাকে 'রূপার মা' বলেই ডাকে। মেয়ে রূপার বয়স প্রায় বছর কুড়ি। কাঁকালে গোট নেই, সিঁথিতে সিন্দুরও দেখা যায় না, কাজেই সে যে বিধবা তাতে সন্দেহ নেই, কারণ, বাগ্দীর ঘরে বিশ বছরের আইবুড়ো মেয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব।

ত্বরিৎ-গতিতে রূপার মা মাণিক সামন্তের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। গরীব মানুষ। সঙ্গে নেবার মত বেশী কাপড়-চোপড় কোথায়? একখানা বড় শাড়ী, আরেকখানা ছোট্ট বস্ত্র, এই মাত্র সম্বল। প্রত্যেকদিন স্নান করবার পর ছোট্ট শাড়ীখানা গায়ে জড়িয়ে সে বড়খানা শুকিয়ে নেয়, সাতদিন অন্তর অন্তর কাপড় দু'খানা সোডা অথবা ক্ষার জলে ধুয়ে নেয়। রূপার মা মুখ বাঁধা একটি হাঁড়ি খুলে কতকগুলো ঔষধ বের করে নিয়ে মেয়েকে দুয়ারে তালা লাগিয়ে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে বলে। রূপা ঘরে তালা লাগাচ্ছে এমন সময় চালের উপর শোনা যায় টিকটিকির 'টিক্‌টিক্' শব্দ; আবার কুসংস্কারের কালো ছায়া মা ও মেয়ে দু'জনের মনকে অভিভূত করে। তখন যাত্রা ভঙ্গ করতে হয়। আবার দুয়োর খুলে আলো জ্বেলে প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে, ইত্যবসরে মাণিক অলক্ষুণে টিক্‌টিকির উদ্দেশ্যে খুব একচোট্ গালিবর্ষণ করে। অবশেষে যাত্রা আরম্ভ হয়। মাণিক যে পথে এসেছিল সেই পথে সকলেই রওনা হয়ে গাঁয়ের মাঝামাঝি একটা বাড়ীতে প্রবেশ করে। আকাশে তখন তারার সমারোহ দূর হয়ে

গিয়েছে। একমাত্র শুকতারা পূর্ব দিগ্‌বলয়ের উপর উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে পৃথিবী-বাসীর কাছে দিনের আগমনী সংবাদ ঘোষণা করছে। পল্লীপথে তখন লোক চলাচল আরম্ভ হয়েছে। হুঁকো টেনে কাস্‌তে কাস্‌তে তারা মাঠের দিকে চলেছে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

---

## বাংলার পল্লী

কাঞ্চনপুর সোনার শহর না হলেও একেবারে ছোট্ট গাঁ নয়। প্রায় হাজার দেড়েক লোকের বাস। ছত্রিশ বর্ণের লোকই এখানে বাসা বেঁধেছে, তবে সদ্‌গোপের সংখ্যাই বেশী। গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে কিংবদন্তীও রয়েছে। গ্রামের চাষীরা এক সময় সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতো বলে, গ্রামের নাম কাঞ্চনপুর হয়েছে, প্রবীণদের মত এই হলেও অনেকের মতে, এখানে কয়েকঘর ধনী সুবর্ণবণিকের বাসের জন্য গাঁটি কাঞ্চনপুর আখ্যা ধারণ করেছে। মোটের উপর গ্রামটাকে সমৃদ্ধশালী গ্রাম বলা যেতে পারে। গ্রামে অনেক রাঢ়ী ব্রাহ্মণের বসবাস, কায়স্থের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, অন্যান্য জা'তের মধ্যে উগ্রক্ষত্রিয় বা 'আগুরী' নামক কৃষক সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা সদ্‌গোপের তুলনায় কম হলেও গ্রামে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট রয়েছে।

গ্রামের ঠিক মাঝখানে মুখোমুখি দুটো বিরাট শিবমন্দির সকলেরই চোখে পড়ে। গ্রামের ভেতরে প্রত্যেক বাড়ীর সংলগ্ন উদ্যানে কুল, আম, পেয়ারা, পেঁপে ও দু'চার ঝাড় কলার গাছ অবশ্যই দেখা যায়। গ্রামের মাঝখানে মস্ত বড় একটা সান-বাঁধানো বকুল গাছ, অপরাহ্ণে গাঁয়ের ভদ্রমণ্ডলী এখানে সমবেত হ'য়ে পল্লী-পলিটিক্‌সে মস্‌গুল হয়, অথবা তাস, দাবা, পাশা কিম্বা খোস গল্পে সময় কাটায়।

গ্রামে পাঁচ ছয় খানা মুদীর দোকান, এই সমস্ত দোকানে চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি পল্লীবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

মেলে। গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটা বড় সমতল ক্ষেত্রে সপ্তাহে দুদিন, মঙ্গল ও শনিবারে হাট বসে। শাকসব্জী, কাপড় থেকে আরম্ভ করে ছুরী, কাঁচি, মশলা ইত্যাদি হাজার রকম জিনিস এখানে পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যে পুকুর বা জলাশয়ের অভাব নেই, কিন্তু দুটো বড় বড় জলাশয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে হিমসাগর নামক দীঘি। জল বরফের মত শীতল, সেইজন্য এইরকম নাম হয়েছে। মার্বেল বাঁধানো দুটো বড় বড় ঘাট, একটাতে স্নান করে পুরুষ, আরেকটায় মেয়েরা। ঘাটের উপরে সিঁড়ি যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেখানে দুধারে দুটো তুলসী গাছ। ঘাটের সামনেই চৈতন্যদেবের মূর্তি। আরেকটা বড় দীঘির নাম কৃষ্ণসাগর জল কাকচক্ষুর মত কাল বলে। এখানে নাকি অগাধ জল, থৈ পাওয়া যায় না। তলদেশে রয়েছে মোহরে-ভরা বড় বড় পিতলের কলসী-যক্ষের প্রহরায়। এখানে মাছও রয়েছে অফুরন্ত। জাল ফেলে তুলবার উপায় নেই, কিসে যেন জাল ছিন্ন করে ফেলে। এই দীঘিতে কেউ বড় একটা স্নান করে না। পল্লীর মেয়েরা সকালে ও সন্ধ্যায় এখান থেকে খাওয়ার জল সংগ্রহ করে। কস্মিনকালেও এই দীঘির পঙ্কোদ্ধার করা হয়নি ব'লে, নানাজাতীয় জলজ উদ্ভিদে ইহা পরিপূর্ণ। প্রায় প্রত্যেকটি পুষ্করিণীর পাড়ে বড় বড় তাল গাছ। গাছগুলো যেন গড়-খাইয়ের উপর শান্ত্রীর মত দাঁড়িয়ে শত্রুর মহড়া নিচ্ছে। দীঘির বাঁধের নীচে চারিদিকে আমগাছ, তেঁতুল গাছ, কৎবেল গাছের বড় বড় বাগান। দূর থেকে মনে হয়, যেন নিবিড় অরণ্যানী গ্রামখানাকে ঘিরে রয়েছে।

বৃক্ষকুঞ্জ-শোভিত গ্রামের চারিদিকে শস্যক্ষেত্র। এই সমস্ত ক্ষেত্র বছরের সব সময়ই শস্যশ্যামল। বাংলার মাটি যে সুজলা, সুফলা ও শস্য-শ্যামলা তা এই গ্রামখানার উপরে চোখ বুলালেই যেন বোঝা যায়।

গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহর। নিষ্ঠুর সূর্য চারিদিকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা

বিকীরণ করছে। একরত্তিও বাতাস নেই, দৈত্যের মত দীর্ঘ তাল-গাছের চওড়া পাতাগুলো নিস্পন্দ। গরুগুলো গাছতলায় আশ্রয় নিয়ে চোখ বুজে জাবর কাটছে। পাখীগুলো দুপুর বেলায় বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছে। প্রকৃতি রাণী যখন এই রকম নিস্তব্ধ তখন একজন মাত্র চাষীকে পূর্বদিকে জমি চষতে দেখা যায়। আগের সন্ধ্যায় বজ্রপাত সহ এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তারি সুযোগ নিয়ে মাণিক সামন্ত আউস ধানের জন্য জমি তৈয়ার করছে। মান্ধাতার আমলের লাঙ্গল দিয়েই মাণিক জমি চষছে, সারা অঙ্গ দিয়ে তার ঘাম ছুটে বেরুচ্ছে। লাঙ্গলের মুঠাটা দু'হাতে চেপে ধ'রে সে জোরগলায় বলদ দুটোকে তিরস্কার ক'রে। বলদ দুটোর কিন্তু কাজে তেমন সহযোগিতা দেখা যায় না। একটু চলেই তারা থেমে পড়ছে। মাণিক রাগে গর গর করে বলদ দুটোর লেজে জোরে মোচড় দিয়ে, যেন ওরা পকেট মেরেছে, এই ভাবেই তাদের গাল দিচ্ছে: 'আরে শালারা নড়ছিস না ক্যান্? বেলা হয়ে যাচ্ছে যে? শালার গরু, লাঠি পেটা না করলে দেখছি দুরস্ত হবি নি?' গালিগালাজ নিস্ফল হ'তে দেখে সে তোষামোদ আরম্ভ করে, 'ধন আমার, বাবা আমার, বাছা আমার! একটু টেনে চল, তাহলেই তো হয়ে যায়।' কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। অবসন্ন, তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত পশু দু'টো কোন ভোরবেলা থেকে লাঙ্গল টানা শুরু করেছে, আর তারা নড়তে চায় না এক পাও। পর্যায়ক্রমে গালি-গালাজ ও তোষামোদের একটানা অভিনয়ই চলছিল। খানিকটা দূরে, এক অশ্বত্থ গাছের তলায় দু'জন লোককে দেখা যায়। একজন ছিল ঘাসের উপর শুয়ে, আরেকজন অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটি হুঁকো হাতে করে বসেছিল।

হুঁকো বাংলার কৃষকদের কম সম্পত্তি নয়। চারিদিকে আঁধার ও নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ তার জীবনে এই হুঁকোই যা একটু শান্তি ও সান্ত্বনা এনে দেয়। মাঠে যাওয়ার সময় সে হুঁকো ও ট্যাঁকে একটু

তামাক জড়িয়ে নিয়ে যাবেই। দেশলাইয়ের তারা বড় একটা ধার ধারে না, পোয়ালের শলাকায় আগুন ধরিয়ে নিয়ে যায়। তামাক তারা দোকানেও কেনে আবার সময়ে সময়ে ঘরেও তৈরী করে নেয়। মাটির কল্‌কেয় তামাক সেজে তার উপর পোয়ালের আগুন ঢেলে কল্‌কেটাকে হুঁকোর ন'চের উপর বসিয়ে চাষী যখন ফড়াৎ ফড়াৎ করে টানতে আরম্ভ করে, তখন তার আওয়াজ, কর্মক্লিষ্ট চাষীর কানে বীণা বা তানপুরার বাজনার চেয়েও মধুরতর বোধ হয়। আর সিগারেটের তো কথাই নেই, বিড়ির তুলনাতেও এতে যে ঢের কম খরচ হয় তা বলাই বাহুল্য। গরীব বাঙ্গালী চাষীর পক্ষে এ ছাড়া আর উপায় কি? এই সাদাসিধে কম ব্যয়সাধ্য মৌতাত বস্তুটি চাষীকে কত অসীম আনন্দ ও স্বোয়াস্তিই দান করে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, গভর্নমেণ্ট এই অবশ্য ব্যবহার্য জিনিসটার উপরেও ট্যাক্স বসিয়েছেন!

গাছতলায় বসে তামাক টানতে টানতে মাণিক আর বলদ দুটোর দুর্দশা দেখে উপবিষ্ট লোক দু'জনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটা জোরে চীৎকার করে, 'মাণিক! গরু দুটোকে না হয়, ছেড়ে দাও। ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তুমি বরং গাছতলায় বসে একটু জিরিয়ে নাও।' বলদ দুটোকে ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা পুকুরের দিকে ছুটে গিয়ে সাম্‌নের দু'পা জলে ডুবিয়ে পেটভরে জল পান করে। মাণিক লাঙ্গল কাঁধে গাছতলায় এসে সঙ্গীদের সাথে তামাক ফুকতে থাকে। এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটি আর দু'জনকে বলে, 'ভাই সব, এস আমরা স্নান করে ভাত খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হই। মালতী নিশ্চয়ই এক্ষুণি এসে পড়বে।' সর্বকনিষ্ঠকে—'ভাল কথা, গয়ারাম' এই বলে সম্ভাষণ করে মাণিক বলে, 'আগে বরং তুমিই গায়ে তেল মেখে নাও।' 'বদন দাদাই আগে আরম্ভ করুক', গয়ারাম উত্তর দেয়।

এরা তিনজনেই সহোদর ভাই। জ্যেষ্ঠ বদনের বয়স প্রায় তিরিশ বছর, সে বাড়ির কর্তা, দ্বিতীয় মাণিকের বয়স প্রায় বছর

পঁচিশ, কনিষ্ঠ গয়ারাম বিশ বছরের ছোকরা। গয়ারামের উপর ভার গরু চরানোর, বড় ভাই দুজনে এসেছে লাঙ্গল নিয়ে। ধুতি ছাড়া অন্য কোন পরিধেয় বস্ত্র তাদের অঙ্গে নেই, ধুতি আবার দীর্ঘে আট হাত, বহরে দু'হাত, হাঁটু দুটো কোন রকমে ঢাকে, আর তাদের সঙ্গে রয়েছে অপরিহার্য গামছা। এই বস্ত্রখণ্ড মাথার পাগ, কোমর-বন্ধ, রুমাল, মায় থলিয়ার কাজ পর্যন্ত সম্পন্ন করে।

বদনের দেহের উচ্চতা সাধারণ বাঙ্গালীর মত ; দেহটা বলিষ্ঠ ও সুগঠিত, কপালটা উচো ও চওড়া, চোখ দুটো উজ্জ্বল, দেহটা বিশেষতঃ বুকটা ঘন লোমে আবৃত। গয়ারামের আকার বদনের মত, তবে এখনো তত শক্ত হয় নি।

মাণিকের কিন্তু দুজনের সঙ্গে কোন মিল নেই, অপরিচিত মনুষের পক্ষে তাকে গয়ারামের ভাই বলে ঠাহর করাও দায়। অন্য দু ভাইয়ের তুলনায় তার গায়ের রং ঢের কালো, আব্লুষের মত। বাস্তবিক পক্ষে গাঁয়ে তার মত কালো একজনও ছিল না, সেইজন্য নামটা তার মাণিক হলেও সকলেই তাকে ডাকতো 'কালো মাণিক' বলে। সাধারণ বাঙ্গালীর তুলনায় তার দেহও উচ্চতর, ছয়ফুটের উপর। প্রকাণ্ড মাথায় একরাশ চুল, কোন দিনই দ্বিধা বিভক্ত হয় নি, চিরুণীর পরশ কোন দিনই পায় নি, তার উপর চুলগুলো আবার সজারুর কাঁটার মত খাড়া। মুখের হাঁ-টাও অত্যন্ত বড়, দু' পাটিতে হাতীর দাঁতের মত কোদাল কোদাল দাঁত। বাহু দুটো আজানু-লম্বিত, কাঁধটা ষাঁড় বা পালকী-বাহকদের মত ফুলানো। পাদুটো বাঁকানো, আঙ্গুলগুলো বক্রাকাবের, চলবার সময় আঙ্গুলের সঙ্গে আঙ্গুলের ঘর্ষণধ্বনি বেজে ওঠে। মোটের উপর, এই অপরূপ মূর্তিটা দেখলে ছেলেরা বিশেষ ভয় পায়। কালো মাণিক আসছে— এ কথা শুনলে তারা ঠাণ্ডা হ'য়ে পড়ে। গাঁয়ের কুমারী মেয়েরাও তাকে সুনজরে দেখতো না। কালো মাণিক দাম্পত্য সুখ অনুভব করুক, বদনের বড়ই ইচ্ছা ; কিন্তু ছোট ভাই গয়ারামের জন্য কন্যা

পেতে সামান্য বেগ পেতে না হলেও, বিশাল কাঞ্চনপুর এবং পার্শ্ববর্তী বিশ মাইলের মধ্যে কোন মেয়ের বাপকেই কালো মাণিকের হাতে কন্যা সম্প্রদানে সে রাজী করাতে পারে নি। লোকটা সাদাসিধে ও বোকাটে ধরনের, কিন্তু মানসিক শক্তির এই ঘাটতি বহুগুণে পূরণ হয়েছে তার অতুলনীয় দৈহিক শক্তি ও সাহসে। সে গাঁয়ের অদ্বিতীয় দৌড়বীর, সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারু ও সেরা মল্লযোদ্ধা। ক্রোধোন্মত্ত বেগে ধাবমান ষাঁড়ের শিং ধরে সে ঠাণ্ডা করতে পারে, এক গাদা ধানের আঁটি সে বয়ে নিয়ে যায় অবলীলাক্রমে, গাঁয়ে কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধলে সে দাঁড়াবে পুরোভাবে, ভীমের মত সে গদা ঘোরায়, যমের মতই ছিল তার স্থির লক্ষ্য। গল্প-নায়কের খুড়া, কাঞ্চনপুরের কালো মাণিক ছিলেন এমনি ধারা বীর পুরুষ!

ভাইদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে বদন একটা বাঁশের কেঁড়ে থেকে সরষের তেল বের করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে মালিস করে, কাণে ও নাসারন্ধ্রেও একটু ঢেলে দেয়। কালো মাণিক ও গয়ারামও এইভাবে তেল মাখে। তারপর তারা পার্শ্ববর্তী পুকুরে স্নান করে, কালো মাণিক কিছুক্ষণ সাঁতারও কাটে। স্নান শেষে ভিজা গামছা নিংড়িয়ে কোমরে জড়ায় ও ভিজা কাপড় ঘাসের উপর বিছিয়ে শুকোতে দেয়। তারপর ব'সে প'ড়ে তারা, আর একখানা গামছায় বাঁধা ভিজা মুড়ি চিবোতে আরম্ভ করে, মুড়ি খাওয়া শেষ হলে আঁজল ভরে পুকুর থেকে জলপান করে। মাঠে ময়দানে বাংলার চাষীরা, আর শুধু চাষীরা কেন, পথে-প্রবাসে ভদ্র মহোদয়গণও এই মান্ধাতার আমলের প্রথায় তৃষ্ণা নিবারণ করে থাকেন। জলযোগ শেষে বদন ও কালো মাণিক লাঙ্গলের কাছে যায়, গয়ারাম বসে বসে গরুগুলির উপর লক্ষ্য রাখে। ঘণ্টা খানেক পর যে গাছতলায় গয়ারাম বসেছিল, সেইদিকে ছোট একটা মেয়েকে পুটলী হাতে করে আসতে দেখা দেখা যায়! তাকে দেখেই বদন ও কালমাণিক বলদগুলোকে ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় এসে পড়ে।

বদন বলে, 'বেশ মালতী, তা হ'লে দেখছি ভাত নিয়ে এসেছ। বাড়ীর খবর ভালোতো ?'

ছোট মেয়েটি উত্তর দেয়, 'হাঁ বাবা, একটা খোকা হয়েছে।'

তিন জনেই সমস্বরে চেঁচিয়ে বলে, 'খোকা হয়েছে ! ভাল কথা ! কখন হ'লো ?' 'তুপুর বেলায়', মালতী উত্তর দেয়। আরো কিছু প্রশ্নোত্তরের পর মালতী পুটলীটা খুলে মধ্যাহ্ন ভোজনের আহার্য দ্রব্য বের করে—একরাশ ভাত ও শাকসব্জির সঙ্গে রান্না করা খানিকটা মাছের ঝোল। মালতী তিনখানা কলাপাতায় খাবার দ্রব্য পরিবেশন করে ও পিতলের ঘটী করে পুকুর থেকে জল আনে। তিনজনে পেটভরে ভাত খায়, খাওয়ার শেযে আরাম ক'রে তামাক সেবন করে। পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদে তারা এতবেশী আনন্দ অনুভব করে যে, সেদিনকার মত কাজ স্থগিত রেখে তারা বাড়ীর দিকে রওনা হয়। গয়ারামকে অবশ্য মাঠেই থেকে যেতে হয়, কারণ সন্ধ্যার আগে তো আর গরু বাড়ীতে নেওয়া যায় না।

# তৃতীয় অধ্যায়

---

## রায়তের কুটীর

কালোমাণিক কাঁধে লাঙ্গল ও জোয়াল নিয়ে আর বদন বলদ জোড়াকে তাড়াতে তাড়াতে যখন বাড়ীতে ফিরে আসে তখন মেয়ের দলে বাড়ী ভর্তি হয়ে গিয়েছে। পুত্র হওয়ার শুভ সংবাদ পেয়ে সকলে এসেছে এই কৃষক পরিবারকে অভিনন্দন জানাতে। এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী সৌভাগ্যশালী বদনকে বলে—'বদন, দেবতারা সুপ্রসন্ন হ'য়ে তোমাকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন, বাছা দীর্ঘজীবী হোক।' আরেকজন বৃদ্ধা বলে, 'সুন্দর ছেলে! ভগবান ওকে দীর্ঘজীবী করুন, খাওয়া পরার জন্য যেন কোন কষ্ট না হয়, ওর গোলা ভর্তি ধান চাল হোক।' বদনের মার হৃদয় তখন অনন্দে কানায় কানায় পরিপূর্ণ, সে বদনকে কোন কথা বলতেই পারে না। পল্লী-ধাত্রী, রূপার মার সেদিন জয়-জয়কার। যেখানে কারুর, এমনকি ছেলের বাপেরও প্রবেশাধিকার নেই, সেই চির অপবিত্র সূতিকাঘরের দুয়োর থেকে সে গর্ব ও আনন্দের সঙ্গেই নবজাত শিশুকে দেখাচ্ছে, যেন সে নিজেই ঐ সন্তানকে পেটে ধরেছে, এমনিভাবে। অকেজো তরুণী ও বাক-সর্বস্ব বৃদ্ধার দল যখন অভিনন্দনের পর অভিনন্দন বর্ষণ করে চলেছে, সেই অবসরে এই গরীব চাষীর সামান্য কুটীরের উপর একটু দৃষ্টিপাত করে দেখা যাক্, বেচারীরা কিভাবে জীবন অতিবাহিত করে থাকে। বদনের বাড়ীতে ঢুকতে হয় পুর্বদিকে মুখ করে; আম কাঠের ছোট সদর দরজা পেরিয়েই উঠান। উঠানের অপর পার্শ্বে সদর দরজার সোজা বিপরীত দিকে বড় ঘর। বদনের বাড়ীতে এইখানা সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে বেশী আসবাব

পত্রে পরিপূর্ণ। মাটির চওড়া দেওয়ালের উপর বিচালী-নির্মিত চাল, বাঁশের কাঠামোর উপর প্রায় এক হাত গভীর বিচালী বিছান। মেঝের ভিতটা প্রায় পাঁচ ফুট উচ্চ। ঘরখানা বারান্দাসহ ষোল হাত দীর্ঘ ও বার হাত প্রশস্ত। রারান্দার চাল কয়েকটা তালের খুঁটির উপর দণ্ডায়মান। ঘরখনা ছোট বড় দুটো প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, বড় প্রকোষ্ঠ বদনের শয়ন কক্ষ, ছেটটা বাড়ীর ভাঁড়ার ঘর, খাদ্যদ্রব্য ভরা কতকগুলো মাটির হাঁড়িতে পরিপূর্ণ। বারান্দাটা হচ্ছে বাড়ীর বৈঠকখানা। বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজন এলে এখানে তারা মাতুর পেতে বসে। বদনের শয়ন কক্ষে কাঁসার বাসনকোসন ও বাড়ীর অন্যান্য জিনিস পত্র রাখা হয়। ঘরে কোন খাট নেই, মেঝেয় মাতুর ও তোষক বিছিয়ে বদন অকাতরে নিদ্রা সুখ অনুভব করে। আলোকের নিতান্ত অভাব, বারান্দার চালার কল্যাণে ঘরের ভিতর খুব কম আলোই প্রবেশ লাভ করে, ছোট্ট একটি জানালা, তাও মেঝে থেকে অনেক উপরে। ঘরে আসবাব পত্র নাই বললেই চলে ; এক কোণে মাত্র একটি কাঠের বাক্স অব্যবহৃত অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে। ঘরের একদিকে দুটো আস্ত বাঁশ দেওয়ালে লাগানো রয়েছে। এই বাঁশের উপর কাপড় চোপড় ঝোলানো থাকে। বড় ঘর ও বড় কুটীরটার এইতো হ'ল অবস্থা।

উঠানের দক্ষিণ দিকে বড় কুটীরের সমকোণে অবস্থিত আরেকখানা নিকৃষ্ট ধরনের ছোটঘর। বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকাণ্ড হ'লে মেয়েরা এখানে আশ্রয় নেয়। অন্য সময়, এখানে কৃষিকাজের হালহাতিয়ারগুলো রাখা হয়। বর্তমানে ইহা সুতিকা ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ঘরের বারান্দায় ঢেঁকি পাতা রয়েছে, কাজেই ঘরখানাকে বলা হয় ঢেঁকিশালা বা ঢেঁকশাল।

উঠানের আর এক প্রান্তে ঢেঁকিশালার সমকোণে আর একখানা অপেক্ষাকৃত ভাল ধরনের ঘর। এর ভেতরে গয়ারাম নিদ্রা যায় ; বারান্দাটা ব্যবহৃত হয় রন্ধন কার্যে ; কাজেই এখানা বাড়ীর রান্নাঘর নামে পরিচিত।

বাড়ীর উত্তর দিকে আর একখানা ঘরও আছে। এখানা গোয়াল-ঘর। ঘরখানা আকারেও সবচেয়ে বড়। এর ভেতরে কয়েকটা নাদা-পাতা, নাদাগুলোর কাছে কয়েকটা খুঁটি পোতা। এই সব খুটায় গরুগুলোকে আটকে নাদায় জাব দেওয়া হয়। গোয়ালঘরের এককোণে একটি কুণ্ডলী, এখানে প্রতি সন্ধ্যায় সাঁজাল দেওয়া হয় মশামাছির কামড় থেকে গরুগুলোকে বাঁচানোর জন্য।

বাড়ীর পুর্বদিকে খিড়কির পুকুর, স্নান ও বাড়ীর অন্যান্য সমস্ত কাজ এই পুকুরের জলেই সম্পন্ন হয়। পানীয় জল সংগ্রহ করা হয় গ্রামের বাইরে অবস্থিত বড় বড় পুকুর থেকে ; এই সমস্ত পুকুরের পরিচয় ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। পুকুরের কিনারায় অনেকগুলি ফলের গাছ, মালিক অবশ্য বদনই। পুকুরের ঘাটের উপর একটা তাল গাছ ; ঘাটটার চারিদিকে ঝোপ ঝাড়—মেয়েরা পুকুরে এলে পর আড়াল করে রাখে। পাড় থেকে দূরে একটা জামগাছ ; এবং আর একটু দূরে খেজুর গাছ ; ফল পাকলে জলের উপরেই পড়ে।

উঠানের মাঝখানে গোশালার নিকটে একটা গোলা বা মরাই। এখানে সংসারের প্রয়োজনীয় বছরের ভুজ্‌নো ধান রক্ষিত থাকে। মরাই-এর নিকটেই বিচালীর গাদা, গরুগুলি বছর ধরে এই বিচালী নিঃশেষ করে। রান্নাঘরের পেছনে পুকুরের নিকটে ছাইকুণ্ড ; অগভীর এই গর্তে ছাই, গেবরময় খড়কুটো, তরকারির খোসা ইত্যাদি নিক্ষিপ্ত ও সংরক্ষিত হয়। স্বাস্থ্য রক্ষার দিক থেকে এই ছাইকুণ্ড ক্ষতিকর বিবেচিত হ'লেও রায়তের কাছে ইহা অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ এই ছাইকুণ্ড জমির সার সরবরাহ করে থাকে। বাড়ীতে বাড়ীতে ছাইকুণ্ড ছাড়া আরো নানা প্রকারে গ্রামের ভেতরে ময়লা জমলেও বন্য শূকর-গুলি ময়লা সাফ রাখ্‌তে পল্লীবাসীদের অনেকখানি সাহায্য করে।

এই কৃষক পরিরারের যে-সমস্ত কুটীরের ইতিপূর্বে পরিচয় দেওয়া হল সেগুলো বহুদিন পূর্বে বদনের পূর্বপুরুষরা তৈরী করে গিয়েছিল। প্রত্যেক বছর সামান্য কিছু তালিগুঁজা দেওয়া আর আর পাঁচ-ছয় বৎসর

অন্তর নূতন করে বিচালী দিয়ে ছেয়ে নিলেই যথেষ্ট। খাজনার হারও কম, বছরে দু-এক টাকার বেশী নয়।

বসতবাটির পরিচয় দেওয়ার পর এখন এই কৃষক পরিবারের লোক-জনেরও পরিচয় দেওয়া দরকার। বদন, কালমাণিক ও গয়ারামের সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমাদের পরিচয় হয়েছে। এদের পুরো নাম বদনচন্দ্র সামন্ত, মাণিকচন্দ্র সামন্ত ও গয়ারাম সামন্ত। গ্রামের অধিকাংশ কৃষক অধিবাসী সদ্‌গোপ জাতীয় হলেও এরা উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরী। বেশীর ভাগ এদেরকে বর্ধমান জেলাতেই দেখতে পাওয়া যায়; সাহস,দৈহিক ও স্বাধীন-চিত্ততার জন্য এরা প্রসিদ্ধ। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে সকলের আগে উল্লেখযোগ্য বদন-জননী অলঙ্গ। তাছাড়া, বদনের স্ত্রী সুন্দরী, কন্যা মালতী এবং গয়ারামের স্ত্রী আদুরী,—এই কয়জন স্ত্রীলোকও রয়েছে। ছেচল্লিশ বৎসর বয়স্কা অলঙ্গ হচ্ছে বাড়ীর গিন্নী। মায়ের উপর পুত্র বদনের অসীম ভক্তি। সংসারে মা যা কিছু করে, সে তা মাথা পেতেই স্বীকার করে নেয়। দুই ছেলে আর পুত্রবধুও অলঙ্গকে কম সম্মান করে না। বাড়ীর কর্তার স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সুন্দরী শাশুড়ীর গৃহিণীপণায় একটুও মনক্ষুণ্ণ নয়; বরং বয়োজ্যেষ্ঠা ও অভিজ্ঞা এক নারী যে তার সংসারের উদ্বেগ ও দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়েছে, এজন্য সে মনে মনে কৃতজ্ঞ। বাড়ীর বড় বৌ ব'লে সুন্দরী সংসারের রান্নার কাজ করে, ছোট বৌ আদুরী তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করে থাকে। সুন্দরী এখন সূতিকাঘরে আটকে পড়ায় অলঙ্গই রান্না-ঘরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, কারণ আদুরীর মত অল্পবয়স্কা তরুণীর হাতে এতবড় দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া যায় না।

আদুরী কিন্তু সুন্দরীর মত নয়। মেয়েটি একটু খিট্‌খিটে ধরনের। বিশেষতঃ এখন তাকে একটু বেশী কাজ করতে হচ্ছে ব'লে প্রায়ই মেজাজ দেখায়। মেয়েটি সভাবতই একটু দাম্ভিক গোছের, কারুর তাঁবেদারী করা, এমনকি শাশুড়ীর অধিনতা বরদাস্ত করে চলাও তার অভিপ্রেত নয়। বদনের গৃহের একটানা সঙ্গতের মধ্যে এই মেয়েটাই

বেসুরের সৃষ্টি করেছে। বদন ও কালমাণিকের সঙ্গে অবশ্য জীবনে তার একটা কথার বিনিময়ও হয়নি, হতেও পারেনা; ভ্রাতৃবধুর পক্ষে ভাসুরের চোখে চোখে তাকানোও শীলতাহানির পরিচায়ক। কাজেই আহুরী কেবলমাত্র যে বদন ও কালমণিকের সঙ্গে কোনদিন কথা বলেনি তা নয়; এমন কি তারা কোনদিন তার মুখও দেখতে পায়নি। কারণ তাদের সাম্‌নে বাড়ীর ভেতর চলাফেরা করবার সময় আহুরী মুখখানা পুরাপুরি ঘোমটায় আবৃত রাখে। শাশুড়ীকে সে প্রায়ই মুখের উপর জবাব দেয়; ফলে রাত্রিতে শয়নের সময়ে তাকে স্বামীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এমন কি মাঝে মাঝে কিল-চাপড়ও খেতে হয়। যেদিন অদৃষ্টে কিল-চাপড় জোটে তার পরদিন প্রায় সব সময়েই সে রাগে মুখ ভারী করে থাকে, আর চোখা চোখা বাক্য বর্ষণও করে।

বদন-দুহিতা মালতীর বয়স বছর-সাতেক। রংটা ফরসা না হ'লেও দেখ্‌তে মন্দ নয়। মায়ের মতই সে সুশীলা। বাড়ীতে, দীর্ঘ সময় ধরে সে একমাত্র শিশু হওয়ার আদর-সোহাগ লাভ করলেও মাথাটা তার বিগ্‌ড়ে যায় নি। কোনরকম রূঢ় ব্যবহার বা মুখের উপর জবাব দেওয়া তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। বাস্তবিকই সে বদনের জীবনের আশীর্বাদ। সারাদিন মাঠে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর, সন্ধ্যায় খোলা উঠানে আড়াআড়িভাবে পা দুখানা রেখে বসে পড়ে সে যখন হুঁকোয় টান দিতে থাকে, তখন এই শিশুর মিষ্টি আধ আধ বুলি যেন তার কানে অমৃত বর্ষণ করে। এই ছোট্ট সংসারের সারাদিনের ঘটনাবলী সে শিশুর মুখেই শুন্‌তে পায়। মেয়েটির অমায়িক ব্যবহার যেমনি তেমনি সে কাজের মেয়েও বটে। সংসারের পঞ্চাশ রকম কাজে সে মা ও ঠাকুরমাকে সাহায্য করে, নানারকম ফায়-ফরমাসও পালন করে। গাঁয়ের দোকান থেকে, তেল-লবণ ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিয়পত্র কিনে আনে, বাপ ও কাকাদের জন্যে মাঠে খাবারও নিয়ে যায়।

কৃষক পরিবারের পূর্ণ পরিচয় দিতে হ'লে মানুষগুলোর সঙ্গে সঙ্গে

অতি-প্রয়োজনীয় গৃহপালিত জানোয়ারগুলোরও পরিচয় দেওয়া দরকার। কারণ জানোয়ারগুলোর সহযোগিতাই তো চাষীর ঘরে সমৃদ্ধি এনে দেয়। বদনের প্রায় ছত্রিশ বিঘা জমি, একখানা লাঙ্গল ও একজোড়া বলদ। গায়ের রং-এর দিক থেকে বলদ ছুটো 'কেলে' ও 'সাম্‌লা' নামে পরিচিত। বয়স এদের সাত-আট বছর, কাজেই এখনো বহুদিন এরা গৃহস্বামীর কাজ করবে। সত্য কথা বলতে গেলে, বলদ ছুটোই এই কৃষক পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছে বলে এদের আদর-যত্নও যথেষ্ট। গয়ারাম প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় এদের নাদা ছোট করে কাটা বিচালী ও খইল-জলে ভর্তি করে দেয়। কেলে আর সামলাই যে গোয়াল ঘরের একলা বাসীন্দা তা নয়। গোয়ালে আরো তিনটে রয়েছে ছুগ্ধবতী গাই, ছুটো বড় এঁড়ে বাছুর, ও একটা বড় বকনা। এঁড়ে ছুটোকে লাঙ্গলে জোড়ার জন্য জোংলানো হচ্ছে। সব চেয়ে বুড়ী গাইটার নাম ভগবতী। গাইটা সকালে তিন পোয়া ও সন্ধ্যায় আধ সের ছুধ দেয়। মেজো গাইটার নাম ঝুমরী, এটার ছুধ দেওয়ার পরিমাণ, সকালে দেড় সের, সন্ধ্যায় এক সের, সর্বশেষ গাইটার স্থান কিন্তু সকলের উপরে। নামেও কামধেনু কাজেও প্রায় তেমনি। সকালে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে বটের আঠার মত তিন সের ও ছু-সের ছুধ দেওয়া কি সামান্য কথা? এঁড়ো বাছুর ছুঠোর এখন পর্যন্ত কোন নামকরণ না হ'লেও মালতীর প্রিয় ছু' বছরের বকনাটি কিন্তু লক্ষ্মী নাম ধারণ করছে। গাইগুলোর পরিচর্যার ভার গয়ারামের উপর অর্পিত, বাড়ীর সেই হচ্ছে গরুর রাখাল। সারাদিন মাঠে চরলেও এদের পৃথক নাদা রয়েছে। সকালে এরা খায় শুক্‌নো বিচালী, রাতে আপন আপন নাদায় কর্তিত বিচালীও খইল জল সহ আহার করে। সকালের সেরা গাই কাম-ধেনুর জন্য অবশ্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। মধ্যে মধ্যে সে ভূষি, খুদ ও গুড়ের মণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করে থাকে। প্রতিদিন সকালে গোয়াল পরিষ্কার করার পর মালতী গোয়াল ঘরে ঢুকে লক্ষ্মীর গায়ে হাত

বুলায়, তার ছোট্ট শিং দুটো ধরে টানে। লক্ষ্মীও মালতীকে যথেষ্ট ভালবাসে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এত দুধ দিয়ে বদন কি করে? উত্তরে বল্‌তে হয়, সমস্ত গাই ঠিক একই সময়ে দুগ্ধবতী হয় না। সংসারে প্রতিদিন যতটা দুধ হয় তার একটা অংশ মালতী পান করে, কিছুটা দুধ এক ব্রাহ্মণ পরিবারে বিক্রী করা হয়, কিছুটা দুধ থেকে মাখন তোলা হয় এবং কিছুটায় সংসারের প্রয়োজনীয় দই পাতা হয়। অলঙ্গ যেদিন ঘোল মন্থন করে ঘি তৈরী করে, সেদিন এই কৃষক পরিবারে উৎসবের দিনই বল্‌তে হয়। কারণ ঘোল সকলের প্রিয় খাদ্য।

গরু-বলদ ছাড়া বদনের বাড়ীতে অন্য কোন গৃহপালিত পশু ছিল না। হিন্দু কৃষকের বাড়ীতে হাস-মুর্গীর বালাই নেই। মাত্র বাঘা নামে একটা কুকুর। আহার শেষে বাড়ীর লোকের এক মুঠো ভাতই তার সম্বল। তাছাড়া পাড়া-পড়শীর বাড়ী ও রাস্তাঘাট থেকেও সে কিছুটা আহার্য সংগ্রহ করে থাকে।

## চতুর্থ অধ্যায়

### অদৃষ্ট-লিপি ও নামকরণ

আঁতুড়ঘরে শিশু জন্মের ষষ্ঠ দিবস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইদিন শিশুর রক্ষাকর্ত্রী মা-ষষ্ঠীর পূজো, তাছাড়া এই দিন রাতে বিধাতা পুরুষ স্বয়ং শিশুর কপালে অদৃষ্ট লিপি লিখে দিয়ে যান। এই অদৃষ্ট লিপি বা কপালের লিখার একটুও এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। বিধাতা পুরুষ কালি-কলম সঙ্গে নিয়ে আসেন না; কাজেই আঁতুড়ঘরের প্রবেশ-পথে দোয়াত ও স্বস্তির কলম রাখতে হয়। বদন ও তার ভায়েরা লেখা-পড়ার কোন ধার ধারে না। কাজেই তাদের ঘরে কালি কলম কিছুই নেই। অলঙ্গ পাশের বাড়ী থেকে দোয়াত ও কলম ধার করে এনে আঁতুড় ঘরের ভেতরে চৌকাঠের উপর রেখে দেয়। বিধাতা পুরুষ কোন্ সময়ে আসেন তারও ঠিকানা নেই; রাত্রির যে-কোন সময়ে তিনি আসতে পারেন। কাজেই এক জনের জেগে থাকার দরকার। ধাত্রীর উপরেই জাগরণের ভার পড়ে। রূপার মা সে রাতে আর চোখে পাতা ফেলেনি। উত্তেজনার জন্য বৃদ্ধা অলঙ্গের ভাল ঘুম হয়নি, তাছাড়া সকলেই পড়েছিল ঘুমিয়ে। সেই-জন্য রাতে কি যে ঘটেছিল তা একমাত্র রূপার মা ছাড়া আর কেহই বলতে পারে না। পরদিন সকালে রূপার মা ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বিবৃত করে ঃ

'রাত দুপুরের পর, যেখানে দোয়াত ও কালি ছিল, সেই দিকের দরজায় পয়ের আওয়াজ শুনতে পাই। দুয়োর থেকে, যেখানে মা ও শিশু ঘুমিয়েছিল, সেই স্থান পর্যন্ত একই পায়ের আওয়াজ শোনা

যায়। সঙ্গে সঙ্গে কলম দিয়ে লেখার আওয়াজও কানে আসে, কিন্তু কোন লেখা দেখতে পাই না। আগুনের আলোয় কিন্তু শিশুর মুখে হাসি খেল্‌ছে দেখতে পাই। একটু পরেই চ'লে যাওয়ার পদধ্বনি ; দুয়োরের দিকে ছুটে গিয়ে বলি, 'ঠাকুর! আশাকরি ভালই লিখেছ।' বিধাতা পুরুষ আমাকে ভালোরূপেই চিনে। আমাকে অনেকবার দেখেছে তো। শিশুর কপালে যা লিখেছে তা সবই আমাকে বলে, কিন্তু কোন কথা প্রকাশ করতে বারণ করে দিয়েছে। যদি কোন কথা বলি, গলা টিপে মেরে ফেলবে। কিন্তু মা অলঙ্গ আনন্দ কর। তোমার নাতির অদৃষ্ট ভালো।' বদন আর তার ভাইয়েরা এই কাহিনী বিশ্বাস না করলেও বাড়ীর মেয়েরা, —বিধাতা রূপার মার কাছে শিশুর অদৃষ্ট লিপি সমস্তই খুলে বলেছে একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

দু'দিন পর, শিশুর আটদিন বয়সের সময় 'আট কৌড়িয়া' উৎসবের ধূম। অলঙ্গ ও আদুরী সারাদিন কর্মব্যস্ত! তারা মুড়ী ও আট রকমের কড়াই ভাজে। বদন গ্রাম্য মহাজনের বাড়ী থেকে বিস্তর কড়িও নিয়ে আসে। সূর্যাস্তের সময় পল্লীর একদল কৃষক বালক বদনের বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে ভীষণ সোরগোল ও নাচানাচি আরম্ভ করে। কুলো ঘুরোতে ঘুরোতে তার আঁতুড় ঘরের সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে,—আটকৌড়ি! বাটকৌড়ি! খোকা কি ভাল আছে?" বালকেরা অলঙ্গ ও দাইকে নিয়ে নানাপ্রকার রং তামাসাও করে। তারা নাচে, হাসে ও কুলোর নানারকম আওয়াজ করে। ইতিমধ্যে অলঙ্গ এক ধামা মুড়ী ও কড়াইসহ উঠোনে এসে ছেলেদের মাথায় ছড়িয়ে দেয়। তখন মুড়ী ও কড়াই কুড়ানো নিয়ে ছেলেদের মধ্যে হুড়াহুড়ি, কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এই আটকৌড়িয়া উৎসবে অলঙ্গর আনন্দ দেখে কে?

আঁতুড়ের একুশদিনে সুন্দরী প্রথম স্নান করে সূতিকাঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। এইদিন ষষ্ঠীপূজার পর আবার সে বাড়ীর লোকজনের

মধ্যে মিশে যায়। বাড়ীর কাজকর্মের পুরা অংশ সে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ অধিকাংশ সময়ই তার কেটে যায় নবজাতকের তত্ত্বাবধানে। তাই বলে শিশু নিয়ে যে তাকে বিশেষ ঝক্কি পোয়াতে হয়, তা নয়; কারণ ঠাকুরমা ও কাকীমা সব সময়েই শিশুর দেখা শোনা করে। মালতী সব সময়েই শিশুর পাশে ব'সে উৎসাহের সঙ্গে তার ছোট ছোট হাত পা নাড়ার দৃশ্য দেখে। প্রতিদিন সরষের তেল মাখিয়ে পিঁড়ের উপর শুইয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শিশুকে রোদে ফেলে রাখা হয়। বাঙালী মায়ের বিশ্বাস, শিশুর গা এই ভাবে রোদ পোড়া করলে সে জীবন যুদ্ধের জন্য বেশ প্রস্তুত হবে।

শিশু যখন সাতমাসে পৌঁছায় তখন আউস ধান ঘরে উঠেছে। এইবার চলে অন্নপ্রাশনের আয়োজন। নবজাত শিশু আজ প্রথম অন্ন গ্রহণ করবে। ধনী হিন্দুরা এ নিয়ে মহা ধূমধাম করে। গরীব বদন বেশী খরচ করতে অক্ষম। তাহলে হবে কি? গোঁড়া হিন্দু সে, পূর্বপুরুষরা যা করে গিয়েছেন তা সে যথারীতি পালন করবেই; কাজেই কিছু খরচ করা সে কর্তব্য বলে মনে করে। প্রথমে ষষ্ঠী দেবীর আরাধনা করা হয়: তার পরেই হ'ল জ্ঞাতি ভোজের সমারোহ। বাঙালী চাষীর এই ভোজ তেমন কিছু ব্যয়সাধ্যও নয়! নিমন্ত্রিতদের পাতে পরিবেশন করা হয়—ভাত, ডাল, ছেঁচকী অর্থাৎ আলু বেগুন ইত্যাদির ঘণ্ট, মাছভাজা, মাছের টক, 'এবং শেষ পর্যন্ত দৈ। প্রথমে খাওয়ানো হয় পুরুষদের। মেয়েরা বসে পরে, পৃথক ভাবে। বারান্দার উপব দু' সারে কলাপাতা বিছিয়ে দেওয়া হয় নিমন্ত্রিতদের সামনে। প্রত্যেক পাতার বাঁদিকে জলের গ্লাস, পাতার ডান দিকের কোণে একটু লবণ। পরিবেশনের ভার গ্রহণ করে অলঙ্গ। প্রথমে সে নিয়ে আসে বড় এক থালা ভাত এবং সকলের পাতে বণ্টন করে, তার পর হাজির হয় এক হাঁড়ি ডাল নিয়ে ও কিছু পর তরকারী নিয়ে। অতঃপর খাওয়া আরম্ভ হয়। এই সময় চাষীদের সব চেয়ে প্রিয় বস্তু মাছের টক এসে পড়ে। এক একটা

দশ বার সের ওজনের বড় দুটো রুই মাছের টক। মাছ দুটো বদনের নিজের পুকুরেই ধরা হয়েছে। কাজেই পরিমাণটা একটু বেশী দাঁড়িয়েছে। বদন সকলকে পেট ভ'রে মাছ খেতে আহ্বান করে। অলঙ্গও উৎসাহ ভরে প্রত্যেক কলাপাতায় এক এক রাশি মাছ ঢেলে দেয়; প্রত্যেকেই চেঁচিয়ে ওঠে, 'আর দিয়ো না, যা দিলে তার অর্ধেক পড়ে থাকবে!' শেষ পর্যন্ত কিন্তু কারুর পাতে একরত্তি মাছও দেখা যায় না। সর্বশেষে অলঙ্গ হাজির হয় মস্ত এক হাড়ি দই নিয়ে। দইটা খুব ঘন নয়; পাতলা ধরনের। কলাপাতায় ঢেলে দিলে যাতে ছুটে না পালায়; সেইজন্য প্রত্যেকে আপন আপন পাতার চারি দিকে ভাতের জাঙ্গাল দিয়ে এক একটী বৃত্ত রচনা করে পাতলা দই-এর সদ্ব্যবহার করে। আহার শেষে, সকলে বাঁ হাত দিয়ে ঘটি ধ'রে ঢক্ ঢক্ করে জলপান করে। অতঃপর সকলেই আচমন করতে নামে পুকুরের ঘাটে; তার পর সকলেই পান চিবায় ও উঠানে বিছান মাদুরের উপর বসে পড়ে। এর পর চলে হুঁকো-কলকের সমারোহ। দমভরে তামাক সেবনের পর সকলেই শিশুর মাথায় শত শত আশীর্বাদ বর্ষণ করে! এই দিন শিশু নাম গ্রহণ করে গোবিন্দচন্দ্র সামন্ত।

## পঞ্চম অধ্যায়

### গণক ঠাকুর

'বদন! বাড়ীতে আছো?'

অন্নপ্রাশনের কয়েকদিন পর, একদিন সন্ধ্যায় বদনের দরজায় এই কর্কশ ধ্বনি শোনা যায়।

'কে ডাকে?'—বড় ঘরের বারান্দা থেকে বদন চীৎকার করে সাড়া দেয়। বারান্দায় বসে সে হুঁকোয় মাত্র দু-এক টান দিয়েছে।

'আমি সূর্যকান্ত,' কর্কশকণ্ঠে উত্তর আসে।

'ভেতরে আসুন,' বলেই বদন লাফ মেরে উঠে বারান্দা থেকে সদর দরজায় যায়; ভেতরে আসুন আচার্যি ম'শায়, আজ বড়ই সৌভাগ্যের দিন যে এই গরীবের বাড়ীতে আপনার পায়ের ধূলো পড়েছে! গয়ারাম,আচার্যি ম'শায়কে বসতে একখানা আসন দিয়ে যা।'

আচার্য মহাশয় পায়ের চটি খুলে আসনে বসে বলেন, 'বেশ, বদন! আশা করি কুশলেই আছ। তোমার ছেলের অন্নপ্রাশন ভালোয় ভালোয় হ'য়ে গিয়েছে শুনে সুখী হলাম। আর কেনই বা হবেনা? তোমার পূর্বপুরুষরা গরীব হ'লেও, সকলেই ছিল, সৎ-স্বভাব ধার্মিক; ভগবানকে তারা ভয় করে চল্‌তো, তাদের জন্ম-লগ্নে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও রাশিচক্র, সকলেই শুভ দৃষ্টি করেছে। তোমার ছেলের নাম রেখেছ বোধ হয় গোবিন্দ। ছেলেও যে এইরকম শুভ-লগ্নে জন্মেছে তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। এ শুধু তোমার পুণ্য ও তোমার ছেলের পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। তোমার ছেলের কোষ্ঠি নেওয়া সম্বন্ধে চিন্তা করেছ কি?'

"গোবিন্দর জন্ম-পত্রিকা লেখানোর খুবই ইচ্ছে ; কিন্তু কি বলবো আচার্যি মশায়! আমি বড়ই গরীব। জমিদারের কাছে ইতিমধ্যেই খাজনা বাকী পড়েছে, মহাজনের কাছে ঋণ নিয়েছি, ঘরে সামান্য যা কিছু ছিল, ছেলের অন্নপ্রাশনের জন্য এইমাত্র খরচ হয়ে গিয়েছে!'

'তা' টাকা পয়সার জন্য চিন্তা কেন ? আমার তত তাড়াহুড়া নেই। তাছাড়া জানতো, তুমি আর আমি পুরাতন বন্ধু ; আমি তোমার কাছে বেশী কিছু দাবী করবোনা।'

'ভাল কোষ্ঠির জন্যে কত নেবেন ?'

'যদি কোষ্ঠির খাঁটী মূল্য জান্‌তে চাও, তবে বলি শোন। এই কিছুদিন আগে এক বেনের ছেলের কোষ্ঠি তৈরী করেছি, এক সোনার মোহর পেয়েছি।'

'এক সোনার মোহর! কিন্তু বেনে ও আমার মত গরীব রায়তের মধ্যে আশমান জমিন্‌ ফারাগ, বামন ও চাঁড়ালের পার্থক্যই রয়েছে। গোবিন্দের কোষ্ঠি লিখতে আমার কাছে কত নেবেন ?'

'তুমি আমার কাছে কোষ্ঠির ন্যায্য দাম কত জান্‌তে চেয়েছিলে বলেই আমি সোনার মোহরের কথা বলেছি ; তবে তোমার সঙ্গে দর কষাকষি করারও ইচ্ছে নেই। কোষ্ঠিটা লিখে দিই, তারপর যা খুশী দিয়ো।'

'আমি গরীব মানুষ, আপনার মান কি রাখ্‌তে পারি ? আপনার গ্রহণের যোগ্য টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই ; যদি ভাল কোষ্ঠি করেন, তাহ'লে আসছে ফসল তোলার সময় আপনাকে দু'সলি আউস ধান ও দু'সলি আমন ধান দেব।'

'তুমি বড় কৃপণ হয়ে পড়েছো বদন ; তুমি চার সলি ধান দেবে বলছো, তাছাড়া আখ মাড়াইয়ের সময় আধমন গুড় দিয়ো, তাহ'লেই তোমার ছেলের কোষ্ঠি লিখে দিব।'

'আচার্যি ম'শায় আপানারা বড়ই মিষ্টির ভক্ত। বেশ, আমি

রাজী আছি। এক্ষুনি কাজে হাত দিন। শেষ করতে কতদিন লাগ্‌বে?'

'দেখ কোষ্ঠি তৈরী করা সোজা কাজ নয়; ইহা ছেলেখেলা নয়। আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ও তাদের প্রভাব নির্ণয়ের জটিল গণনার প্রয়োজন একমাসের আগে শেষ করতে পারবোনা।'

'বেশ, একমাস পরেই কোষ্ঠি নিয়ে আসবেন। যা দিতে চেয়েছি ফসল তোলার সময় ও আখ-মাড়াইয়ের সময় তা দেব। কিন্তু দেখুন, ভাল কোষ্ঠি তৈরী করবেন।'

'মেয়ে মানুষের মত কথা বলছো বদন! কি করে শুভ বা অশুভ কোষ্ঠি তৈরী করি? শিশুর জন্ম লগ্নে গ্রহগুলো যে অবস্থায় ছিল, তারি উপর সমস্ত নির্ভর করছে। যদি সুপ্রভাবের সময় জন্মে থাকে, তাহ'লে কোষ্ঠিও ভাল হ'বে, নইলে খারাপ কোষ্ঠি এসে পড়বে। আমি মাত্র আকাশ ও দেবতাদের রহস্য উদ্ঘাটন করবো। তবে কোষ্ঠি যে ভালই হ'বে তাতে সন্দেহ নেই; কারণ তুমি ভাল লোক ও দেব-দ্বিজে তোমার অচলা ভক্তি।'

বদনের সঙ্গে সূর্যকান্ত আচার্যের এই রকম কথাবার্তা হয়। আচার্য মহাশয় কাঞ্চনপুরের গণক ঠাকুর। তার প্রকৃত নামটা বড় একটা কেউ জান্‌তো না। বছর কয়েক আগে, আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয়। লোকে তাকে বল্‌তো, 'আগুনে ঝাণ্ডা'। এই ঝাণ্ডা তারার আবির্ভাবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মড়ক লাগ্‌বে বলে আচার্য মহাশয় ভবিষ্যদ্বাণী করেন। সেই থেকে লোকে তার নাম দিয়েছে, 'ধূমকেতু' এবং সেই নামেই সে পল্লী-সমাজে পরিচিত। বাংলার সমস্ত গ্রাম গণক ঠাকুরের অবস্থিতির সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনা। কাঞ্চনপুর বড় গ্রাম আর এখানে বহু বড় লোকের বসবাস ব'লে এখানে একজন গণক ঠাকুরের অবস্থান সম্ভব হয়েছে। ধূমকেতু কেবলমাত্র কাঞ্চনপুরের নয়, তার পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের ব্যাটা ছেলেদের কোষ্ঠি পেতে থাকে। মেয়েদের কোষ্ঠির বালাই বড় একটা

নেই ; ছোট্ট এক টুকরো কাগজে জন্মের তারিখ, সময় ও গ্রহ-নক্ষত্র সমাবেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখে রাখলেই যথেষ্ট। শুধু কোষ্ঠি পাতাই ধূমকেতুর একমাত্র কাজ নয়। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান থেকে সে শুভ-অশুভ সময় নিরুপণেও সিদ্ধহস্ত! এতেও সে কম পয়সা রোজগার করে না, কারণ গোঁড়া হিন্দুরা গণক ঠাকুরকে দিয়ে শুভ সময় নিরুপণ না করে কখনও বিয়ে ইত্যাদি শুভ কাজে হাত দেয় না, দূর দেশে যাত্রাও করেনা। নতুন বছরের সূচনায় সে প্রত্যেক সঙ্গতি-সম্পন্ন নিষ্ঠাবান হিন্দুর বাড়ীতে নতুন পাঁজীও পড়ে থাকে। নতুন বছরে নৈসর্গিক কোন কোন ঘটনা ঘটবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করাই এই পাঁজী পাঠের উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো বচনও আওড়ানো হয়। নতুন পাঁজী যারাই শোনে, তারাও সাধ্যমত কিছু কিছু দক্ষিণা ও উপহার দ্রব্য গণক মহাশয়কে যুগিয়ে থাকে।

কোষ্ঠি রচনা ও নতুন পাঁজী পাঠই ধূমকেতুর একমাত্র বৃত্তি নয়। গণৎকার অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তার বৃত্তিও তিনি অনুসরণ ক'রে থাকেন! হাতের রেখা ইত্যাদির রহস্য ভেদ ক'রে তিনি যথেষ্ট পয়সা উপার্জন করেন। কোন কৃষকের গোরু হারালে, কারুর কানের দুল, হাতের বালা ইত্যাদি সোনারূপার জিনিস অপহৃত হ'লে, থালা ঘটি-বাটী ইত্যাদি হারালে, ধূমকেতু তার মেটে ঘরের মেজেতে খড়ি পেতে চিত্র ও অক্ষর এঁকে নির্ভুল ভাবে গ'ণে দিতে পারে, কোথায় হারানো জন্তু ও জিনিসপত্র এখন রয়েছে। কে সোণার গয়না চুরি করছে আর কোথায় হারানো গোরুটা রয়েছে তা জানবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে কাঞ্চনপুর ও পাশের গ্রামগুলির ধনী-নির্ধন সকলেই তার সামান্য কুটীরে পদার্পণ করে থাকে। তার গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী অধিকাংশ সময়ে ভুল হ'লেও তার অলৌকিক শক্তিতে লোকের বিশ্বাস একটুও কমেনি ; কারণ কখনো কখনো নির্ভুল হ'তেও দেখা গিয়েছে। মানুষের বিশ্বাস-প্রবণতা এমন বদ্ধমূল যে, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি গণনার ব্যাপারের ত্রুটি-বিচ্যুতি গুলি

সহজেই ভুলে গিয়ে শুধু সাফল্যের স্মৃতিটাই সে যত্নের সঙ্গে মনে করে রাখে। তবে একবার গণনায় এমন একটা ত্রুটি ঘটে, যা বহুদিন ধরে লোকের মনে থেকে যায়। তা'হলেও এতে তার ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে সুনাম একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি। হয়েছিল কি, কাঞ্চনপুর থেকে কয়েকমাইল দূরে অবস্থিত এক গাঁয়ের ভদ্রবেশী দুজন সম্ভ্রান্ত লোক একটা হারাণো গোরুর সন্ধানে ধূমকেতুর কাছে আসে। সাধারণতঃ চাষীরা হারাণো গোরুর সন্ধানে গণৎকারের শরণাপন্ন হয়ে থাকে; কাজেই গণক ঠাকুর মহাশয় ভুল চাল চেলে বসেন। আগন্তুকদের ভদ্র বেশভূষা দেখে ধূমকেতু ভাব্‌তেও পারেননি যে, তারা হারাণো গোরুর সন্ধানে এসেছে। চালাকী বুদ্ধিতে সে মনে করে বসে যে, নিশ্চয়ই, তারা সোনার জিনিস, সোনার চেন্ বা হীরের আংটী খুঁজতে এসেছে। কাজেই চির-আচরিত প্রথা অনুযায়ী সে মেজেয় খড়ি পেতে অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য কতকগুলো চিত্র ও নক্সা এঁকে এই সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে—'তোমার একটি জিনিস হারিয়েছে, জিনিস হারিয়েছে; ধাতুর জিনিস, ধাতুর জিনিস; সোনা, সোনা, সোনা; হীরে, হীরে, হীরে; সোনা ও হীরে সোনা ও হীরে; হাঁ একটা হীরেবসানো সোনার আংটী। জিনিসটা এক টুকরো কাপড়ে বাঁধা অবস্থায় তোমাদের ঝিয়ের ঘরের ছাঁইছে গোঁজা আছে।' লোক দুটো হো, হো করে হেসে উ'ঠে গণক ঠাকুরের মুখের ওপরেই বলে, তাদের একটা ভালো গোরু হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু গণক মশায় কি ঠক্‌বার ও লজ্জা পাওয়ার পাত্র? সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেন ঃ—হাঁ, হাঁ, অমনোযোগবশতঃ ভুল অঙ্ক লিখে বসেছি। গোরুই বটে, তোমাদের চাকরাণীর ঘরেই গোরুটা দেখ্‌তে পাবে।' এহেন গণক ঠাকুর আমাদের উপন্যাস-নায়কের কোষ্ঠি রচনায় মনোনিবেশ করেন।

ধূমকেতু ঠিক একমাস পরেই গোবিন্দর কোষ্ঠি নিয়ে হাজির। প্রায় হাত দশেক লম্বা এক তাড়া হল্‌দে কাগজ। পাতায় পাতায়

অঙ্ক ও রাশিচক্র, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্তই দেবভাষায় ( সংস্কৃত ) লিখিত। জাতকের অদৃষ্টলিপি লেখা হয়েছে একশ' বছর বয়স পর্যন্ত, দু-এক ছত্রে প্রত্যেক বছরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ধন-ধান্য-বৃদ্ধি অর্থাৎ জমির ধান ও সম্পত্তি বৃদ্ধি—এই কথা কয়টি ঐ জন্ম পত্রিকার নানা স্থানে উল্লেখ দেখা যায়। কোষ্ঠিতে কতকগুলো ফাঁড়ার কথাও লেখা আছে। সব চেয়ে বড় ফাঁড়া ঘটবে জাতকের ত্রিশ বছর বয়সে। এই বছর দুষ্ট-গ্রহ শনি জাতককে এমন আক্রমণ করবে, যাতে তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে। বদন কোষ্ঠি-পত্র খানা নিয়ে পূর্বোক্ত, ঘরের কোণে রক্ষিত কাঠের বাক্সে রেখে দেয়। বাক্সে বাড়ীর মূল্যবান দলিলপত্র রাখা হয়। আচার্য মহাশয় বদনের-কাছে এই সমস্ত ফাঁড়ার কোন উল্লেখ না ক'রে, মোটামুটি ব'লে যে, গোবিন্দর জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি ঘট্‌বে। যথাসময়ে ধূমকেতু পূর্বপরিশ্রুত পারিতোষিক, চারসলি ধান ও আধ মণ গুড় লাভ করে।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## শৈশব

গোবিন্দর জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে বিশেষ কোন ঘটনাই ঘটেনি। মাত্র একদিন, শিশু যখন উঠানে বুকে হেঁটে খেলে বেড়াচ্ছিল, তখন সকলের অলক্ষিতে পুকুরের ধারে গিয়ে জলে পড়ে যায়। আতুরী তখন পুকুরের ঘাটে বসে কাসার ও পাথরের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো মাজছিল। গোবিন্দকে পড়তে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠে। ভাগ্যিস যেখানে সে পড়েছিল, সেখানকার জল ছিল অগভীর। আতুরী তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে গোবিন্দকে টেনে তোলে। নিরাপদ অবস্থাতেই সে জল থেকে ওঠে। তারপর গোবিন্দের জীবন চলে একটানা ভাবে—হামাগুড়ি দিয়ে, সারা অঙ্গে ধূলো মেখে, উঠানের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিচরণ। এমনি করে সে বড় হয়ে ওঠে। মালতী প্রায় সব সময়েই তার কাছে থাকে, ওকে হাতে ধরে হাঁটা শেখায়, সঙ্গে সঙ্গে ছড়া আবৃত্তি করে—

হাঁটি হাঁটি,—পা-পা।

শিশুর বয়স যখন পাঁচবছরে পৌঁছায় তখন, গোবিন্দর ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে বদন ও অলঙ্গের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। সঙ্গতিসম্পন্ন হিন্দু পরিবারের শিশু পাঁচ বছর পেরিয়ে ছয় বছরে না যেতেই সরস্বতী পূজো করে হাতে খড়ি দেওয়া হয়। ছেলের হাতে খড়ি দিয়ে, অন্ততঃপক্ষে তার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে কিনা সে সম্বন্ধে সে বেশ কিছুদিন যাবৎ মনে মনে চিন্তা করছে। এ সম্বন্ধে নিজের ক্রটিটা সে মর্মে মর্মেই অনুভব করে। সে লেখাপড়া আদৌ

জানেনা। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, জীবনে তার অক্ষর পরিচয়ও ঘটেনি। সে মনে মনে ভাবে, ছেলে যদি লেখাপড়ার রহস্য ভেদ করতে পারে, তা'হলে সে নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশী উন্নতি করতে পারবে। অন্ততঃ ধূর্ত গোমস্তা ও অত্যাচারী জমিদার তাকে ঠকাতে পারবে না। মাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে এরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজে সে হাত দিতে পারে না। মার উপর তার অপরিসীম ভক্তি; মার সাংসারিক বুদ্ধির উপরেও তার অসীম আস্থা। সুযোগ-সুবিধামতো একদিন মার কাছে মনের কথা খুলে বল্‌বে বলে সে স্থির করে।

কাজে-কাজেই একদিন বিকেল বেলায়, মাঠে ততবেশী কাজ না থাকায়, বদন সকাল-সকাল বাড়ীতে ফিরে আসে গয়ারামের ওপর গোরু দেখা আর কালো মাণিকের উপর নিড়ানোর ভার দিয়ে। মা তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে চরকা নিয়ে ব্যস্ত। পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে, হুঁকোয় তামাক সেজে, সে মার কাছে এসে চরকার পাশেই বসে প'ড়ে।

বদন—'মা! অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বল্‌বো বলে মনে করছি।'

অলঙ্গ—'কি কথা, বাবা বদন? কোন কিছু ঘটেছে কি? তোমার মনে কোনো কষ্ট হয়েছে? কি হয়েছে বল।'

বদন—'তেমন কিছুই ঘটেনি। তবে গোবিনের সম্বন্ধে তোমার কাছে কিছু বলতে চাই।'

অলঙ্গ—'গোবিনের আবার কি হয়েছে, বাবা? অসুখ করছে কি?

বদন—'গোবিনের হাতে খড়ি দেওয়া কি ভাল মনে কর না? লেখাপড়া জানিনে বলে আমাকে কি অসুবিধাই না ভোগ করতে হয়। একপাতা পড়তেও পারিনে, কবুলিয়ৎ লিখ্‌তেও পারিনে, এমন কি, নামটাও সই কর্‌তে জানিনে; লেখাপড়া না জানায় নামের বদলে ঢেরা দিতে বাধ্য হই। চোখ থাক্‌তেও দেখতে পাই না। ঠক্‌বাজ গোমস্তা ও উৎপীড়ক জমিদারের কাছে আমাকে তাদের

হাতের পুতুলই থাক্‌তে হয়। গোবিনকে লেখাপড়া শিখানো কি কাজের মত কাজ হবে না?'

অলঙ্গ—'ও বাবা বদন! লেখাপড়ার কথা বলো না। তোমার বাবা, আমার অমতে তোমার বড় ভাইকে পাঠশালায় পাঠায়। তাতে কি দাঁড়ায়? মাত্র এক বছর ইস্কুলে যাওয়ার পর দেব্‌তারা বাছাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। আমাদের গরীবদের ধাতে লেখাপড়া সয় না। ভয় হয়, যদি স্কুলে পাঠাও, দেবতারা গোবিন্‌কে কেড়ে নেবে। ষষ্ঠীর ধন! বেঁচে থাকুক চিরজীবী হয়ে!'

বদন—'মা কি যে বল তুমি! লেখাপড়া ছেলেকে মেরে ফেলেছে, এমন কথা কেউ কোনদিন শুনেছে কি? বামুন-কায়েতের ছেলেরা লেখাপড়া শিখ্‌তে গিয়ে মরে না কেন?'

অলঙ্গ—'লেখাপড়া বামুন-কায়েত ছেলেদেরই পেশা। ওতে দেবতারা রাগ করে না। কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে জমি চষা; কাজেই লেখাপড়া শেখবার আকাঙ্খা আমাদের মনে স্থান পেলে দেবতারা নিশ্চয়ই আমাদের উপর চটে যাবে।'

বদন—'কিন্তু মা, তুমি কি জাননা যে, আমাদেরই জাতের কোনো কোনো আগুরী লেখাপড়া জানে? নটবর সামন্ত কি লেখাপড়া জানেনা! মধু সিংহ কি মুহুরীগিরি করেনা? দেবতারা এদের মেরে ফেলেনি কেন?

অলঙ্গ—'অন্য লোকের বেলায় যাই হোক না কেন, আমাদের ঘরে লেখাপড়া সহ্য হয় না বলেই মনে হয়। তাই যদি না হবে, তবে তোমার বড় ভাই স্কুলে যেতে না যেতেই মরে গেল কেন? এর উত্তর দাও!'

বদন—'কেন, মরণটা হচ্ছে অদৃষ্টের লিখন, মা! বিধাতাপুরুষ অদৃষ্টে লিখেছে তা ঘটবেই। বিধাতা আমার ভাইয়ের কপালে লিখে-ছিল, সাত বছর বয়সেই সে মারা যাবে তাই সে গেল মরে; বাবা

তাকে স্কুলে পাঠাক আর নাই-ই পাঠাক, সে নিশ্চয়ই ঐ বয়সেই মারা যেত। যে ভাত-জল নিয়ে যে সংসারে এসেছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছিল বলেই সে মরেছে। সবই হচ্ছে অদৃষ্ট মা, সবই অদৃষ্ট।'

অলঙ্গ—'ঠিক কথা বাবা বদন, কপালই হচ্ছে মূল। কাজেই কপালের বিরুদ্ধে লড়বে কেন? চাষী হয়ে অমরা জন্মেছি, জীবন ধরে আমরা চাষীই থাকবো? তোমার বাবা কোনদিন লেখাপড়া শিখেছিল কি? যা তোমার বাপ-ঠাকুরদা কোনদিন করেনি, তা তোমার ছেলেকে দিয়ে করাবে কেন?'

বদন—'আমার বাপ্-ঠাকুরদাদা যে যুগে জন্মেছিল সে ছিল পুণ্য ও ধর্মের যুগ, সেটা ছিল সত্য যুগ। তখন কোন প্রবঞ্চনা ছিল না, অত্যাচারও ছিল না। কাজেই লেখাপড়ারও তখন জরুরী প্রয়োজন ছিলনা। কিন্তু আমাদের আমলে মানুষ প্রবঞ্চক হয়ে পড়েছে,—তারা দেবতা বা মানুষ কাউকে ভয় করে না। যাতে আমরা না ঠকি ও নিগৃহীত না হই, সেই জন্য লেখাপড়া শেখা দরকার।'

অলঙ্গ—'পুরুষ মানুষ তোমরা অনেক কিছু বলতে পার আর যুক্তি দেখাতেও পার। মেয়েমানুষ পুরুষের সাম্‌নে কি বলতে পারে? বাবা বদন, যা ভাল মনে কর, তাই কর; আমার শুধু ভয় হচ্ছে, তোমার বড় ভাইয়ের মত গোবিন্‌কেও দেবতারা কেড়ে নিয়ে যাবে। বাছা গোবিনের পক্ষে লেখাপড়া শিখে মরে যাওয়ার চেয়ে মাঠে গরু চরিয়ে রোজকার ভাত রোজ করে খাওয়া ঢের ভালো।'

বদন—'আমি মা তোমাকে আগেই বলেছি, মরা বাঁচা দেবতাদের হাতে। গোবিনের কপালে যদি লেখা থাকে অমুক দিন সে মারা যাবে—দেবতারা তাকে দীর্ঘজীবী করুক—তাহ'লে, তাকে স্কুলে পাঠানো হোক আর নাই-ই হোক, নিশ্চয়ই তা ঘটবে, কারণ কেহই বিধিলিপি রদ করতে পারে না। মা, তোমাকে মিনতি করে জানাচ্ছি, গোবিনকে রামরূপ সরকারের পাঠশালায় পাঠানোর অনুমতি দাও। অন্য স্কুলের তূলনায় আমি তার স্কুলটাই পছন্দ করি, করণ, লোকটা

জমিদারী হিসাব-পত্রে সুপণ্ডিত। মত দাও, মা।'

অলঙ্গ—'বাবা বদন, যদি তাই চাও, তাহলে তাকে পাঠাও।' গোপীনাথ তাকে রক্ষা করুন। কিন্তু যদি তাকে স্কুলে পাঠাতেই হয়, তাহ'লে, তোমাকে আরো দু-চার দিন সবুর করতে হ'বে যাতে আমি একখানা ধুতির মত সুতো কেটে নিতে পারি।'

মায়ের অনুমতিতে আনন্দোৎফুল্ল বদন হাসিমুখেই এই বিলম্বে সম্মত হয়।

গোবিন্দের জীবনের প্রথম পাঁচবছরের মধ্যে তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি বলে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হলেও একটা বিষয় বাদ পড়ে গিয়েছে। ঠিক কোন সময়ে এটা ঘটে তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয় বলেই এইরকম দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটা গোবিন্দের পাঁচবছর না ছ'বছর বয়সে ঘটে তা অলঙ্গ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনা তবে শনিবারে যে এই কাণ্ড হয় তা তার বেশ মনে আছে।

গোবিন্দর পাঁচ বা ছয় বছর বয়সের সময়, একদিন সকাল বেলায় সে তার মা সুন্দরীর কাছে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় হঠাৎ পড়ে গিয়ে হাত-পা খিঁচতে আরম্ভ করে, মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে, পাগলের মত চুলও ছেঁড়ে। সুন্দরী ভয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে। অলঙ্গ ও আতুরী দৌড়ে আসে। অলঙ্গ গোবিন্দর অবস্থা দেখে, 'বাছাকে আমার পেঁচোয় পেয়েছে," বলে কেঁদে ওঠে।

পেঁচো কাকে বলে? পেঁচো পঞ্চাননের অপভ্রংশ। এই দেবতা সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকের কাছে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, অনেক সময় প্রস্তর খণ্ড তেল সিঁদুর মাখিয়ে এই দেবতার পূজো করা হয়। নিম্নবাংলার এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে গ্রামপ্রান্তে বটতলায় এই ঠাকুরের আস্তানা দেখতে না পাওয়া যায়। যদি কোন ছেলে অসাবধান হয়ে এই পাথরকে মাড়ায় বা কোনরকম অপমান করে তাহলে আর রক্ষে নেই। পেঁচো ঠাকুর বা পেঁচো ভূত অমনি তাকে পেয়ে বসবে। অলঙ্গেরও মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে, সেদিন নিশ্চয়

পঞ্চাননতলায় অন্যান্য রাখাল বালকদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে গোবিন্দ এই ঠাকুরকে অসম্মান করে ফেলেছে। কাজেই দেবতা শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে ছেলেটাকে ধরেছে। তখন সকলে মিলে পেঁচোর কাছে মিনতি জানায়। তাতে কোন ফল না হওয়ায় কুল-পুরোহিত রামধন মিশ্রের শরণাপন্ন হতে হয়। পুরোহিত অবিলম্বে পেঁচো ঠাকুরের পূজোর নির্দেশ দেয়। তখন পূজোর উপচার শুদ্ধু রোগীকে পঞ্চানন তলায় নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক পূজো আরাধনার পর, রোগীর মূর্ছা ছুটে যায়। অলঙ্গের মুখে শোনা যায়, এই ঘটনার পর নাকি গোবিন্দ আর কখনো মূর্ছাগ্রস্ত হয়নি।

## সপ্তম অধ্যায়

---

### কৃষকের সংসার

গোবিন্দ'র লেখাপড়া সম্বন্ধে অলঙ্গ ও বদনের মধ্যে কথাবার্তা হওয়ার পর এই বৃদ্ধাকে তার চরকা নিয়ে বেশী ব্যস্ত হ'তে দেখা যায়। দুপুরবেলা পর্যন্ত অবশ্য তাকে সুন্দরী ও আদুরীর সঙ্গে ঘর-কন্নার কাজেই ব্যাপৃত থাক্‌তে হয়। কিন্তু সমস্ত অপরাহ্নটা সে একমাত্র চরকাতে নিযুক্ত থাকে। এখানে ঘরকন্নার কাজ বিশেষতঃ কৃষকের ঘরকন্নার কাজ কাকে বলে সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু পবিচয় দেওয়ার দরকার; চাষী পরিবারের বয়স্কা মেয়েরা শয্যা ত্যাগ করে কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর সোজা তারা চলে যায় পুকুরে, পুকুর থেকে এসে, গোবরজল গুলে উঠানে ছড়া দিয়ে ঝাঁট দেয় ও তারপর গোবরজলে ন্যাতা বা ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ড ডুবিয়ে ঘরের ভেতর ও দাওয়া নিকায়। গোবর দিয়ে নিকানোর ফলে কোনরকম দুর্গন্ধ বেরোয় না, নিকানো জায়গাটা শুকিয়ে গেলে তাতে ফাটল না ধ'রে মসৃনতাই প্রাপ্ত হয়! স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে গোবরের এইরকম ব্যবহার ঠিক কিনা, তা ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরাই বলতে পারেন। তবে এতে যে কোন ক্ষতি হয় না তা একশ'বার স্বীকার্য।

ঘর নিকানো ও উঠান সাফ করার কাজেই যে গোবরের একমাত্র ব্যবহার তা নয়। বদনের বাড়ীর মেয়েদের গোবর দিয়ে এখনো অনেক কিছু করবার রয়েছে। উঠানে মস্তবড় একরাশ গোবর এখনো সঞ্চিত। এতে বাড়ীর গোয়ালের গোবর এবং গয়ারামের আনা

গোবর দুই-ই আছে ? গয়ারাম শুধু গোরুই চরায় না। গোরু চরাবার সময় নিজের গোরু ও আর পাঁচজনের গোরু যে গোময় ত্যাগ করে তা সে সযত্নে কুড়িয়ে রাখে। গোরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরবার সময় সে বড় এক ঝুড়ি গোবর নিয়েও আসে। অলঙ্গ, সুন্দরী ও আতুরী এবার গোবর নিয়ে আসে। গোবরে একটু জল মিশিয়ে ও তাল পাকিয়ে তারা বাইরের দেওয়ালে হাতের চাপে ঘুটে দিতে আরম্ভ করে। এই ঘুটে শুকিয়ে গেলে তুলে নেয়া হয়। বাঙালী কৃষকের সংসারে ঘুটে একমাত্র না হ'লেও বড় রকমের জ্বালানী ইন্ধন বটে।

মোটের উপর বাঙালী কৃষকের নিকট গরুই হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জন্তু। গোরু নবজাত শিশুদের কয়েক বছর ধ'রে খাদ্য সরবরাহ করে, বলদের সাহায্যে জমি চ'ষে কৃষক নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে। শস্য কর্তনের পর গোরুই গাড়ীতে তা কৃষকের বাড়ীতে পৌঁছে দেয়, গোরু কৃষক পরিবারের জ্বালানী সরবরাহ করে, গাভীর কল্যাণে সে দুধ দই ঘোলের স্বাদ গ্রহণ করে, আর বাঙালীর দেবতা ও বাঙালী বাবুদের নাসারন্ধ্রে এতদূর লোভনীয় ঘি গাভীই সরবরাহ করে। কাজেই বাঙালী হিন্দুরা গাভীকে যে 'মাতা ভগবতী' জ্ঞানে পূজা করবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

ঘর নিকানো ও ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া শেষ হ'লে পর মেয়েদের ঘরকন্নার অন্যান্য কাজ শেষ করতে হয় ; যথা :—ধান সেদ্ধ করা, তা রোদে দেওয়া, কাসা ও পাথরের বাসনগুলো মাজা ইত্যাদি। এর পর আসে স্নানের পালা, তারপর রন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, এতে অলঙ্গই অবতীর্ণ হয় প্রধান ভূমিকায়। বাড়ীর সকলের আহার গ্রহণ এবং কিছু অন্ন মাঠে কার্যরত পুরুষদের কাছে পাঠানোর পর অলঙ্গ খেতে বসে। এই আহারকে প্রাতরাশ বা মধ্যাহ্ন ভোজন দুই-ই বলা যায় ; কারণ, যদিও বেলা দুটো থেকে তিনটে, তখন পর্যন্ত অলঙ্গ মুখে জল দেয়নি, এতে তার তিলমাত্র স্বাস্থ্যহানি ঘটতে দেখা যায় না। আহার শেষে অলঙ্গ বসে চরকায়। এতে তার হাত

এতদূর পেকে গিয়েছে যে, কয়েক দিনের মধ্যেই সে গোবিন্দের ধুতির উপযোগী সূতো কেটে ফেলে। এই ধুতি হ'বে পাঁচ হাত লম্বা, বহরে দেড় হাত, বুনতে দেওয়া উত্তর পাড়ার তাঁতীদের হাতে। অবশ্য এজন্য তাঁতীকে পারিশ্রমিক দিতে হবে।

গোবিন্দ যেদিন প্রথম পাঠশালায় যায়, সেদিন এই কৃষক-পরিবারে তথা গোবিন্দের জীবনে একটী স্মরণীয় দিনই বটে। মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু পরিবারে ছেলেকে প্রথম পাঠশালায় পাঠানোর সময় রীতিমত ধর্মীয় উৎসব প্রতিপালিত হয়। এই গরীবের সংসারে তেমন কিছু না হ'লেও বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। গোবিন্দ জন্মের পর থেকে কখনো অঙ্গে কাপড় জড়ায়নি। বয়স তার পাঁচ বছর হ'লেও সে নগ্ন প্রাকৃতিক অবস্থাতেই দিন যাপন করে। পাঠ-শালা-যাত্রার দিন সকাল বেলায় ইতিপূর্বে যে ধুতির কথা বলা হয়েছে, ঠাকুরমা সেখানা তার কোমরে জড়িয়ে দেয়। বলা বাহুল্য সারা-দেহের অধিকাংশ অনাবৃতই থেকে যায়। এই ভাবে কাপড় প'রে সে ঠাকুরমা, বাবা, কাকা, মা, খুড়ীমা, সকলের পায়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করে ও সকলেই আশীর্বাদ করে। পাঠশালায় প্রথম দিনেই লেখা আরম্ভ হবে বিবেচনা ক'রে বদন গোবিন্দর ধুতির এক প্রান্তে এক টুকরো চক বা রামখড়ি বেঁধে দেয়। অনঙ্গ অবশ্য তার কোঁচায় কিছু মুড়ীও বেঁধে দেয়, যাতে গোবিন্দ খিদে পেলে অনায়াসে হাত ঢুকিয়ে ওগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারে। এই রকম রণসজ্জায় আমাদের ছোট্ট বীর পুরুষ জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রথম আক্রমণ করবার জন্য বের হয়। বদন গোবিন্দর হাত ধরে মুখে তিনবার 'শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি' উচ্চারণ ক'রে পাঠশালা অভিমুখে যাত্রা করে।

# অষ্টম অধ্যায়

## পণ্ডিত মহাশয়

কাঞ্চনপুর গ্রামের মধ্য ভাগে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে হুটো শিব-মন্দির রয়েছে, সে কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। একটা মন্দিরের সামনে একটা বিরাট চালাঘর। এই চালাঘরে গ্রাম্য পাঠপালা অবস্থিত। এখানে শিক্ষালাভ করে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও ধনী বেনেদের ছেলেরা, শিক্ষক একজন ব্রাহ্মণ গুরুমহাশয় বা মহাশয়, কারণ, বর্ধমান জেলায় পল্লীশিক্ষক মহাশয় আখ্যাতেই পরিচিত। এই শিক্ষক খাঁটী শিক্ষককুলেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাপ-ঠাকুরদা থেকে আরম্ভ ক'রে উর্ধ্বতন চৌদ্দপুরুষ পর্যন্ত সকলেই শিক্ষকতা করে জীবন যাপন করেছেন। এই গাঁয়ে আরো একটা পাঠশালা আছে। কিন্তু শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা অনেক নীচে। পণ্ডিত মহাশয় কায়স্থ কুলে উদ্ভুত। কাজেই পূর্বোক্ত পাঠশালার তুলনায় এই পাঠশালায় ছাত্র সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। বড় পাঠশালায় ছাত্র পড়ে ষাটসত্তর জন, কিন্তু এই পাঠশালায় ছাত্র পড়ে বড় জোর কুড়ি জন। তাই বলে ব্রাহ্মণ কায়স্থের চেয়ে যে যোগ্যতর শিক্ষক তা নয়। পূর্বোক্ত পণ্ডিত সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণের কিছু অংশ পড়লেও এবং কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করলেও বাংলায় বর্ণশুদ্ধি জ্ঞান তার ছিল অত্যন্ত কম। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পণ্ডিতটি সংস্কৃতজ্ঞতার কোনরকম অহমিকা না করলেও লোকটার পাটীগণিতে জ্ঞান ছিল অসাধারণ, জমিদারী হিসাবেও তার টন্‌টনে জ্ঞান ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়ের কিন্তু জমিদারী সেরেস্তা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না।

কায়স্থ শিক্ষকের পাঠশালায় সাধারণতঃ নীচজাত ও গরীবদের ছেলেরা শিক্ষালাভ করলেও দু-একজন ব্রাহ্মণের ছেলেকেও দেখা যেত। বিশেষতঃ যারা মনে করতো ছেলেকে অঙ্ক ও জমিদারী সেরেস্তায় অভিজ্ঞ করতে হ'বে, তারা ছেলেকে এখানেই পাঠাতো। বদন দুটো কারণের জন্য কায়স্থ-পণ্ডিতকেই পছন্দ করে। প্রথমতঃ, প্রথমোক্ত পাঠশালায় অভিজাত ঘরের ছেলেরা পড়ে; বদনের ইচ্ছা তার ছেলে সমশ্রেণীর কাছাকাছি শ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষালাভ করে, দ্বিতীয়তঃ, গোবিন্দকে জমিদারী সেরেস্তায় অভিজ্ঞ করে তোলা তার অভিপ্রেত। কাজে কাজেই বদন ও গোবিন্দ রামরূপ সরকারের (কায়স্থ শিক্ষক) বাড়ীতে উপনীত হয়। রামরূপ বাড়ীর উঠোনে, ছায়াবহুল কাঁঠাল গাছতলায় ছেলেদের পড়ায়। বর্ষার সময় পাঠশালা স্থানান্তরিত হয় তার ঘরের বারান্দায়।

'আরে বদন, খবর কি? এখানে কি জন্য?'—ডজন খানেক ছাত্র সামনে নিয়ে মাদুরে উপবিষ্ট রামরূপ জিজ্ঞাসা করে। ছেলেরা কাগজে, কলাপাতায় বা তালপাতায় লিখন-রত।

বদন—'দেখ্ছেন মহাশয়, এই আমার ছেলে; আপনার কাছে রাখ্তে চাই; একে মানুষ করে তুলুন।'

রাম—'বেশ করেছ বদন! তুমি চাও, ছেলে লেখাপড়া শিখুক, তুমি নিজেও তো জান না। ঠিকই করেছ। কবি চাণক্য বলে গিয়েছেন—বিদ্যারত্ন মহাধনম্।'

বদন—'খাঁটি সত্য কথা। যে লেখাপড়া জানে না, সে প্রকৃতই গরীব—সে অন্ধ। আমার দু'চোখ থাকলেও, প্রকৃতই আমি অন্ধ; কারণ, এক টুকরো কাগজে কি লেখা আছে তা পড়তে পারি না।'

রাম—'বদন তুমি বরং বসে একটু তামাক খাও। মধো! তামাক সেজে আন্তো।'

বদন ফাঁকা জমিতেই বসে পড়ে, গোবিন্দ নিকটেই থাকে দাঁড়িয়ে, উচ্চ-শ্রেণীর অন্যতম পড়ুয়া মধু যায় শিক্ষকের জন্য তামাক সেজে

জানতে। বাংলার ও ভারতের নানা প্রদেশে বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে শিক্ষকের জন্য শারীরিক পরিশ্রম করতে ছাত্ররা দ্বিধাবোধ করা দূরে থাকুক অনেক সময় গর্ব বোধ করে। গোবিন্দের দিকে মুখ ফিরিয়ে মহাশয় বলেন, 'ও ছোকরা! তুমি তাহলে পণ্ডিত হতে চাও! আমার কাছে এস।' বেচারা গোবিন্দের পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। সমবয়সী ছেলেদের মুখে সে শুনেছে যে, প্রত্যেক স্কুল মাষ্টার হচ্ছে দ্বিতীয় যম, আর প্রত্যেক স্কুলে ছেলেদের নির্মম ভাবে বেত্রাঘাত করা হয়। কাজেই সে রামরূপের কাছে আসতে ইতস্ততঃ করে, বদন কিন্তু তাকে পণ্ডিতের দিকে ঠেলে দেয়। পণ্ডিত মহাশয় তার মাথায় হাত বুলিয়ে ভাল ছেলে হতে ও শিক্ষককে ভয় না করতে উপদেশ দেয়। উচ্চ শ্রেণীর, একজন ছাত্রকে অতঃপর জমিতে বাংলা বর্ণমালার প্রথম পাঁচ অক্ষর আঁকতে হুকুম দেওয়া হয়। বদন ছেলের কাপড়ের খোঁট থেকে রামখড়িটা বের করে তার হাতে দেয়। রামরূপ খড়িমাটি সহ গোবিন্দের হাত ধরে জমিতে আঁকা অক্ষরগুলির উপর বুলিয়ে নেয়। ইতিমধ্যে, উপর ক্লাসের ছাত্র মধু সুগন্ধ তামাক ভ'রে হুঁকোটা এনে রামরূপের হাতে দেয়। বদন ও রামরূপ এক জা'তের লোক নয়, কাজেই এক হুঁকোয় উভয়ের তামাক খাওয়া চলে না। রামরূপ হুঁকো থেকে কল্‌কেটা নামিয়ে বদনের হাতে দেয়। বদন কল্‌কের নিম্নভাগ দুহাতে চেপে ধ'রে, ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যে মুখ জাগিয়ে ধূম পান করে। দু-তিন মিনিট তামাক টানার পর বদন কলকে গুরুমহাশয়ের হাতে ফিরিয়ে দেয়। গুরুমহাশয়ের তখন মনের সুখে কুণ্ডলীর আকারে ধোঁয়া উড়াতে থাকে।

তামাক পরম শান্তিকর মহৌষধ বলেই লোকের ধারণা। কাঞ্চনপুরের এই দুর্ধর্ষ পণ্ডিত যখন পরম শান্তিতে ধূমপান করছেন, তখন তার মূর্তিটা মানসপটে এঁকে নিতে চেষ্টা করা যাক। কাজটা খুব সহজসাধ্য নয়, বিশেষতঃ তিনি যখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন,

আর এ রকম প্রায়ই ঘটে থাকে—শরীরের প্রতিটি অংশ যখন কেঁপে ওঠে, হাতের বেতটা সপাং সপাং শব্দে বিদ্যুৎ গতিতে হতভাগ্য পড়ুয়াদের পিঠের উপর পড়তে থাকে, তখন তার সম্যক্ চিত্র ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্যই বটে। তার একখানা পায়ের আকার আর যে ভাবে ওখানা স্থাপিত হয়েছে তা দেখে সহজেই বোঝা যায় লোকটা পঙ্গু; পাশেই ঠেকো বা ক্রাচের দৃশ্য তা সত্য বলে প্রমাণও করে। সত্য কথা বলতে কি, তার খঞ্জতা নিতান্ত সাধারণ ধরনেরও নয়। ক্রাচের সাহায্য নিয়ে বাড়ীর মধ্যে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে সে অতিকষ্টে যেতে পারে। রাস্তায় চলাফেরার কথা বলতে গেলে, দু'মাসের মধ্যেও একবার সে এরকম করেছে কিনা সন্দেহের বিষয়। দেহের এই বিকৃতির জন্য, লোকে 'খোঁড়া মহাশয়' বলে ডাকে, পক্ষান্তরে অন্ধ পণ্ডিতকে বলা হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ছাত্রদের কাঁধে ভর দিয়েই সে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়া আসা করে। বল্‌তে বড়ই দুঃখ হচ্ছে যে, বেত্রাঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ হিসেবে ছাত্ররা সময়ে সময়ে তাকে ফেলেও দেয়। লোকটার বয়স প্রায় বছর চল্লিশেক, কৃশকায়, গায়ের রং কালো, শুকপাখীর মত নাসিকা আর কপালটা এত উঁচু, যা বাঙালীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। খঞ্জতা ছাড়া আরো একটা দৈহিক বিকৃতি তাকে খুব বেশী প্রভাবহীন করে ফেলেছে, তাকে ঘৃণার পাত্রেই পরিণত করেছে—সে নাকিসুরে কথা বলে। এই নাকি সুর আবার এমন প্রচণ্ড যে, রাত্রিতে কোন আঁধার ঘরে যদি সে কথা বলে, তাহলে ভূত বলেই ছেলেরা ভয়ে আঁৎকে উঠবে। বাঙালী ভূত আবার 'নাকি' সুরেই কথা বলে থাকে।

সাংঘাতিক দৈহিক বিকৃতি এবং ভূতের মত অনুনাসিক কণ্ঠস্বর সত্ত্বেও রামরূপ ছিল প্রথম শ্রেণীর স্বভাব-দত্ত প্রতিভার অধিকারী। সে ছিল গ্রামের প্রথম গণিতজ্ঞ ব্যক্তি। শুভঙ্করী ছিল তার কণ্ঠস্থ, এমন কি বীজগণিতও কিছু কিছু সে জান্‌তো। গ্রামে অবশ্য

আরেকজন গণিতজ্ঞও ছিল আর এই ব্যক্তি রামরূপকে যথেষ্ট ঘৃণাও করত। ইনি হচ্ছেন, জ্যোতিষী ধূমকেতু। এই প্রতিভাশালী দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য, জ্যোতিষীর কারবার ছিল নভোমণ্ডলের অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে আর পণ্ডিত মহাশয় তার গণিত প্রয়োগ করত পার্থিব বস্তুসমূহের উপর। আর রামরূপ শুধু অঙ্কেই পণ্ডিত ছিল না ; তার্কিক হিসেবেও তার খ্যাতি ছিল বিস্তর। গৌতমের সূত্র না পড়েও সে চমৎকার তর্ক করতে পারতো ; বর্ধমান থেকে খ্রীষ্টান মিশনারীরা এলে খোঁড়া মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করতে ভুলতো না। তর্কযুদ্ধে তারা একেবার পর্যুদস্ত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতো। অন্ততঃপক্ষে গ্রামবাসীদের ধারণা এই রকমই ছিল। কারণ তর্কের সময়, মত থেকে মতান্তরে পরিভ্রমণে লোকটা ছিল সিদ্ধ হস্ত।

নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে রামরূপের ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ক্রাচ ছাড়া মস্ত বড় একটা বাঁশের কঞ্চিও সবসময়েই তার কাছে থাকত। শুধু ছাত্রদের পিঠে ও মাথাতে এই বংশদণ্ড বেজে উঠত। মারবার অনেক কৌশলও সে জানত, ছাত্রদের আঙুলের গাঁট, হাঁটুর গোড়ালিতেও আঘাত করত। স্কুলের সময় এই বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে হলে বাঁশের কঞ্চির সপাং সপাং শব্দ কানে না এসেই পারত না। নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার আরো অনেক ফন্দি সে জানতো। ছেলেদের শাস্তি দেওয়ার এক বিখ্যাত পন্থা ছিল নাড়ুগোপাল প্রক্রিয়া। অপরাধী বালককে এক হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসিয়ে, প্রসারিত দুই হাতের উপর দু'খানা ইঁট পড়লে আর রক্ষা নেই, অপরাধীর মাথার উপর অনবরত কঞ্চির আঘাত বর্ষিত হত। রাম-রূপের দণ্ডবিধির আর একটি ধারা বেশ উল্লেখযোগ্য। অপরাধী বালককে, এই বিধি অনুসারে, পূর্বোক্ত কাঁঠাল গাছের গুঁড়িতে হাত পা বাঁধা অবস্থায় আটকে ফেলে, তার সারা অঙ্গে বিছুটির পাতা প্রয়োগ করা হত। নখ দিয়ে আঁচড়িয়ে প্রদাহের যে কিছুটা উপশম করবে তারও উপায় থাকত না। বেচারীর পক্ষে তখন আর্তনাদ করা

ছাড়া আর উপায় কি ? এই সমস্ত শাস্তি রামরূপের উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত নয়। চিরন্তনী প্রথা হিসেবেই পল্লী বাঙলার পণ্ডিত মহাশয়গণ এর অনুসরণ করে এসেছেন দীর্ঘ সময় ধরে।

এইবার রামরূপের আর্থিক সংস্থানের সামান্য একটু পরিচয় দিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করতে চাই। গড়ে ছাত্রদের মাথাপিছু বেতন এক আনা। অর্থাৎ ছাত্রসংখ্যা যদি ত্রিশ-বত্রিশজন হয়—এর বেশী ছাত্র রামরূপের স্কুলে কোনদিনই দেখা যায়নি—তাহ'লে ছাত্র বেতন বাবদ আদায় মাত্র দু টাকা। অর্থ সংগ্রহের আরো একটা উপায় রামরূপের ছিল। পাঠশালা বসত দুবেলা, সকাল থেকে বেলা এগারোটা, আর অপরাহ্ন তিনটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। অপরাহ্নে স্কুলে আসার সময় অধিকাংশ ছাত্র, পান সুপারি ও কিছু মাখা তামাক নিয়ে আসত তাছাড়া সকলকে মাসে একটা সিদে দিতে হ'ত। চাল, তরকারী, মশলা, তেল, নুন এমনকি ঘি পর্যন্ত সিদের অন্তর্ভুক্ত থাকত। এতে অনেকটা আয় হলেও এই সিদেপত্র ও মাসিক দুই টাকায় রামরূপ, তার স্ত্রী ও দুটো ছেলে নিয়ে গঠিত পরিবারের প্রতিপালন হওয়া অসম্ভব। ঘাটতি পূরণ হ'ত রামরূপের দশবিঘা জমির উৎপন্ন ফসলে। নিজে সে জমি চষতে পারতো না সে গাঁয়ের এক চাষীকে এই জমি আধা ভাগে বন্দোবস্ত করেছিল।

কাঞ্চনপুরের এহেন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতের পাদমূলে ব'সে গোবিন্দ লেখাপড়া আরম্ভ করে।

# নবম অধ্যায়

## মালতীর বিয়ে

এগারো বছরের মেয়ে মালতীর বিয়ে। কথাটা শুনে, আধুনিক উপন্যাসের পাঠকগণ ও শিক্ষিত নরনারী নিশ্চয়ই মুখ টিপে হাসবেন। সাধারণতঃ প্রেমের .শেষ পরিণতি যে বিয়ে তা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদেই বিবৃত হয়, কিন্তু উপন্যাসের গোড়াতেই তা নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? এ আবার কোন ধরনের নব-ন্যাস? কিন্তু পল্লী সমাজে, বিশেষতঃ চাষীদের ঘরে, এগারো বছরের মেয়ের বিয়ে না দিয়ে উপায় নেই। ইচ্ছা থাক আর নাই-ই থাক, তাকে পাত্রস্থ করতেই হবে। দেশের প্রথাই হচ্ছে এই ধরনের। মালতীর বয়স ইতিমধ্যেই এগারোটি বছর অতিক্রম করেছে, এজন্য বদনকে যথেষ্ট কথা শুনতে হচ্ছে। স্নানের ঘাটে মেয়েদের মন্তব্য শুনে অলঙ্গকে অনেক চোখের জলও ফেলতে হচ্ছে। মেয়েরা অনেক সময় অলঙ্গকে বলে, 'আচ্ছা অলঙ্গ? মালতীর বিয়ে হচ্ছে কবে? ডাগর মেয়ে হ'য়ে পড়ল; কলাগাছের মতই যে বেড়ে চলেছে, অথচ বিয়ের কথা ভাবছ না! কন্যা ঋতুবতী হওয়ার আগেই মেয়ের বিয়ে দেওয়ার দরকার। হিন্দু শাস্ত্রকারদের এই হচ্ছে বিধান। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে বারো বছরেই মেয়েরা ঋতুবতী হয়; কাজেই মেয়েকে বড় জোর এগারো বছর পর্যন্ত ঘরে রাখা যেতে পারে। বদন অভাব অনটনের জন্য এতদিন মেয়ের বিয়ে দিতে পারেনি। কিন্তু আর তো উপায় নেই। ধার করে হোক, ভিক্ষা করে হোক মেয়েকে পাত্রস্থ করতেই হবে। ভিক্ষে বদনের কাছে অচিন্তনীয়। আর চাইলেই

যে পাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নাই। কাজেই মহাজন গোলক পোদ্দারের কাছে ঋণগ্রহণই সাব্যস্ত হ'ল। পোদ্দার মহাশয়, অন্যের কাছে বার্ষিক শতকরা একশ থেকে দেড়শ টাকা সুদ আদায় করলেও, বদন তার প্রিয় পাত্র বলে শতকরা পঁচাত্তর টাকা সুদেই ঋণ দিতে স্বীকৃত হয়। তখন মালতীর উপযুক্ত বরের জন্য সন্ধান চলতে লাগলো।

একদিন সন্ধ্যায় বদন, কালোমাণিক ও গয়ারাম মাঠ থেকে বাড়ীতে ফিরে এসেছে, অলঙ্গ সাঁজ-বাতি দেখিয়ে ঘর ও অঙ্গন থেকে ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা করছে, এমন সময়ে উঠানে এক অগান্তককে দেখা যায়। বদন তাকে চিনতে পেরে বলে,—'আরে কে? ঘটক যে! তোমাকে আসতে দেখে বড়ই সুখী হ'লাম। আশা করি সুখবর নিয়ে এসেছ। মালতী ঘটককে একঘটি পা ধোয়ার জল দে। ও গয়ারাম, ঘটকের জন্য তামাক সেজে আন।' মুহূর্তের ভেতরে ঘটক পা ধোয়ার জল পায়, এক মিনিটের মধ্যে তামাকও আসে, ঘটক জোরে জোরে হুঁকোয় টান দেয়।

ঘটক কোন ধরনের জীব? ঘটক শব্দটা শুনতে শ্রুতিকটু হ'লেও এমন মনোরম ও মধুর বৃত্তি আর কটা আছে। অবিবাহিত বালক-বালিকাদের কানে ঘটক শব্দটা বীণার তানের মতই মধু বর্ষণ করে। মানব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যে পেশা বা বৃত্তির একমাত্র পন্থা সে বৃত্তি মনোরম ও মধুর না হয়েই পারে না! ঘটক ঠাকুর আবার দয়ামায়ার অবতারও বটে। বিবাহযোগ্য কুমার কুমারীদের কোন রকম নিন্দা বা ত্রুটি বিচ্যুতির কথাই ঘটকের মুখে বর্ণিত হয় না। মেয়ে যতই কুৎসিত কদাকার হোক না কেন সে ঘটকের চোখে স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিনী, আর বরের যত রকম দৈহিক বিকৃতি থাকুক না কেন, সে একেবারে রূপে কার্তিক। ঘটক আবার এক জাতীয় নয়। এক এক জাতের তরফ থেকে সেই জাতীয় কোন লোক এই বৃত্তি গ্রহণ করে। বদনের গৃহে সমাগত ঘটকটি উগ্রক্ষত্রিয়

জাতীয়। বদন মালতীর যোগ্য পাত্র অনুসন্ধানের ভার এর উপরেই অর্পণ করেছে, সেও নানাস্থানে পর্যটন করে যোগ্য পাত্রের সন্ধান নিয়ে বদনের বাড়ীতে পদার্পণ করেছে। মালতীর ভাগ্যে এখন কি রকম বর জুটতে চল্‌ছে, তা নিম্নের কথাবার্তার উপর চোখ বুলালেই বোঝা যাবে।

বদন—'আচ্ছা, ঘটক, খবর কি? আশা করি সমস্তই পাকা।'

ঘটক—'প্রজাপতির আশীর্বাদে সমস্তই পাকা। তোমার মেয়ে নিশ্চয়ই শুভ লগ্নে জন্মেছে; কারণ, রাঢ়ের সবচেয়ে কুলীন উগ্র ক্ষত্রিয় দুর্গানগরের কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র মাধবচন্দ্র সেনের মত সুশ্রী, সমর্থ, গুণবান পতি সে লাভ করতে চলেছে।'

বদন—'ঘটক তোমরা, প্রত্যেকেরই প্রশংসা করা তোমাদের স্বভাব। এখন বরের কোন দৈহিক বিকৃতি আছে কি না বল।'

ঘটক—'রাম! রাম! আমি কি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি? মাধব দ্বিতীয় কার্তিক, এমন রূপবান ছেলে দুর্গানগরে আর একজনও নেই। সম্পত্তির কথা শুনবে? তার বাবা বুড়ো কেশব দু'মরাই ধান, কাঁসার বাসনের আদি অন্ত নেই। তাছাড়া খাজনা করা জমি বাদ দশ বিঘা লাখরাজও আছে।'

অলঙ্গ—'মালতীকে তারা কি কি অলঙ্কার দিতে চেয়েছে?'

ঘটক—'বুড়ো কেশব, ব্যাটার বৌয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত গয়নায় ভরে দিবে। সে একছড়া চন্দ্রহার, একজোড়া মল, একজোড়া পৈছা, একজোড়া বাউটী, একজোড়া পলাকণ্ঠি, একছড়া তাবিজ, একজোড়া ঝুম্‌কো ও পাসা, একজোড়া বালা ও একটা নথের বায়না দিয়েছে। আচ্ছা বুড়ী, তোমার বিয়ের সময় এতগুলো গয়না পেয়েছিলে কি?'

অলঙ্গ—'সে কথা বলছো কেন ঘটক! আমার যখন বিয়ে হয়, তখন লোকে এখনকার মত গয়নার ভক্ত ছিল না। তখন ছিল সরলতার, মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের যুগ; এখন কিন্তু বিলাসিতার যুগ এসে পড়েছে।'

বদন—'মাধবের খাঁটি বয়স কত ?'

ঘটক—'তার বয়স উনিশ বছর, দশমাস, পাঁচদিন ; তার কোষ্ঠি দেখে এসেছি।'

বদন—'আশা করি, তাদের ও আমাদের গোত্র এক নয়।'

ঘটক—'আচ্ছা কথা বলেছ! বদন, তুমি কি আমাকে নিরেট মুখ্যু পেয়েছো ? ঘটকালি করে চুল পাকালাম, আর তুমি আমাকে আমার ব্যবসা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে এসেছ !'

বদন—'বিয়েতে আমার আপত্তি নেই। এখনি ব্যবস্থা করা যাক। মালতী নিশ্চয়ই মাধবের হাড়িতে চাল দিয়েছে। প্রজাপতির বন্ধন। কে এর ব্যতিক্রম করতে পারে ?'

কথাবার্তায় সুখী হয়ে ঘটক জলযোগ করে, বড় ঘরের বারান্দায় মাছুর পেতে শুয়ে পড়ে এবং সারাদিন পথশ্রান্তির ফলে শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন ভোর বেলাতেই ঘটক ঘুম থেকে উঠে সটান দুর্গানগর অভিমুখে যাত্রা করে। বিশ মাইল পথ অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ হলেও মোটা পুরস্কার লাভের আশায় সে পথের শ্রম ভুলে যায়। এই দীর্ঘ পথের কোন স্থানেই সে অপেক্ষা করে না, মাত্র মায়া নদীর ধারে এসে স্নান করে ও অলঙ্গের দেওয়া চিড়া গুড়ের সদ্ব্যবহার ক'রে আবার যাত্রা সুরু করে। গোধূলির সময় সে দুর্গানগরে পৌছায়। কেশব সেন ও তার স্ত্রী ঘটকের সাফল্যে পরম আনন্দ লাভ করে।

দুদিন পরে, কেশব সেন দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয়ের সঙ্গে একজোড়া শাড়ী ও দুর্গানগরের সেরা এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন নিয়ে কাঞ্চনপুর যাত্রা করে। বদন পরম সমাদরেই অতিথিদের অভ্যর্থনা করে। কেশব মালতীর সৌন্দর্য ও মধুর সারল্যে মুগ্ধ হয়ে বাগদান করে। অতঃপর জ্যোতিষী ধূমকেতুর ডাক পড়ে। সে এসে নানা-রকমের অঙ্ক ক'ষে, খড়ি পেতে স্থির করে যে, ২৪শে ফাল্গুন সবচেয়ে

শুভদিন। ঐদিন নাকি আকাশের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র সবচেয়ে শুভ প্রভাব বিস্তার করবে। বিয়ের দিন স্থির করার পর কেশব ও তার বন্ধু দুর্গানগরে ফিরে আসে।

বিয়ের দু'সপ্তাহ আগে থেকেই কাঞ্চনপুর ও দুর্গানগর বিয়ের উদ্যোগে আয়োজনে মুখর হয়ে উঠে। বদনের বাড়ী আত্মীয় স্বজনে ভরে যায়। গাঁয়ের লোক, জ্ঞাতি কুটুম্ব ও বরপক্ষের লোকজনকে খাওয়াতে হবে। সোজা কথা তো নয়? ঢেঁকি চলে অবিশ্রান্ত ভাবে, চাকিতে নানা জাতীয় ডাল ভাঙ্গা হয়। জেলে ও গোয়ালাদের বায়না দেওয়া হয় মাছ ও দৈএর জন্যে। গাত্র হরিদ্রা ও আইবুড়ো ভাতের দিন কি সমারোহ! সমবেত মেয়েদের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত 'উলু! উলু! উলু!' শব্দে সমস্ত গ্রাম প্রতিধ্বনিত হয়।

দুর্গানগরে উদ্যোগ-আয়োজনের বহর আরো বেশী। প্রতিদিন সকালে কেশবের চণ্ডীমণ্ডপে মানুষের ভীড়, সকলেরই মুখে মাধবের বিয়ের কথা। একদিন বেলা দশটার সময় অন্দর মহল থেকে উত্থিত 'উলু! উলু! উলু!' ধ্বনি গ্রামবাসীর কাছে গাত্র হরিদ্রার কথা সগর্বে ঘোষণা করে। কয়দিন ধরেই মাধবের আইবুড়ো ভাতের সমারোহ চলছে। মাধব কেশবের একমাত্র সন্তান, সেইজন্য কেশব ছেলের বিয়েতে যথাসাধ্য খরচ করতে দৃঢ়-সঙ্কল্প। গাঁয়ের মালাকারকে সে সবচেয়ে দামী টোপর বানাতে বলেছে, কলকাতা থেকে ছেলের জন্য চাঁদির জরি বসানো দামী জুতোও কিনে আনিয়েছে, ধনী প্রতিবেশীর কাছ থেকে চৌদোলাও ধার ক'রে এনেছে, রঙমশাল ইত্যাদি সমস্তই বন্দোবস্ত করেছে। এক সেট জগঝম্প, চারটে ঢোল, দুটো কাসী, দুটো সানাই ও একপ্রস্থ রোসন চৌকীও আনিয়েছে।

দেখতে দেখতে ২২শে ফাল্গুন এসে পড়ে। ভোরের বেলায় বিয়ের শোভাযাত্রা বের হয়। চৌদোলায় উপবিষ্ট বর, তার বাবা, দশ-বার জন আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধব, বাদ্যকরের দল, গুরু, পুরোহিত ও নাপিত একসঙ্গে জাঁকজমক ক'রে রওনা হয়। বেলা তিনটের

সময় কাঞ্চনপুর থেকে একমাইল দূরে দেবগ্রামে বরপক্ষ থেমে গিয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করে। তার পর তারা প্রস্তুত হয় বিপুল সমারোহে কাঞ্চনপুরে প্রবেশ করার জন্যে।

কাঞ্চনপুরে কন্যাপক্ষের লোকজনও চুপ করে বসেছিল না। বদনের বাড়ীতেও প্রচুর উৎসবের ধুমধাম। ভোরবেলা থেকেই চলেছে আয়োজন। গুরু, পুরোহিত, নাপিত, নাপিতানী পর্যন্ত এখানেও সমবেত হয়েছে। মাঝে মাঝে 'উলু! উলু!' ধ্বনিও শোনা যায়। গায়ে হলুদ দেওয়ার পর মেয়েকে সাজাতে তরুণীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মালতীকে অলঙ্কার ও লাল চেলী পরিয়ে তারা বরের আগমন প্রত্যাশা করে। মালতী কিন্তু বুঝে উঠতেই পারে না, কেন এত ধুমধাম।

দেবগ্রামে আম-বাগানের পেছনে সূর্য অস্ত যায়। বরপক্ষ তখন বিপুল সমারোহে যাত্রা করে। বিয়ের বাজনা শুনে বদনের হৃদয় আনন্দে নেচে উঠে। তেমনি পুলক অনুভব করে অলঙ্গ। মালতী কিন্তু উদাসীন, বরং তাকে ম্রিয়মানই দেখা যায়। চিরদিনের জন্য তাকে প্রিয় পিতা, স্নেহময়ী জননী ও আরো বেশি স্নেহাতুরা ঠাকুর-মাকে ছেড়ে অজানা এক পুরুষের সাথে যেতে হবে! অল্প সময়ের মধ্যেই শোনা যায়, 'বর এসেছে! বর এসেছে'! হঠাৎ গ্রামের প্রবেশ পথে বাজনা থেমে যায়। একদল গ্রামবাসী সমবেত হয়ে 'ঢেলাভাঙ্গানি' দাবি করে নইলে বরপক্ষকে একপাও এগোতে দেওয়া হবে না। গ্রামবাসীদের প্রস্তরবর্ষণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এই পণ দাবি করা হয়। বরের পিতা পাঁচ টাকা দিয়ে অব্যাহতি পায়। আরো একদল কিছু সময় পর বাধা দিয়ে গ্রামের জন্য কিছু চাঁদা আদায় করে। ছাত্রদের নিয়ে গঠিত তৃতীয় দল গ্রাম্য পণ্ডিতের পাওনা আদায় করে নেয়। এই সমস্ত ফাঁড়া কাটাবার পর বরপক্ষ শেষ পর্যন্ত কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। বদন এগিয়ে এসে বরপক্ষের লোকজনকে অভ্যর্থনা জানায়। বর মাধব খোলা উঠানের মাঝখানে

চন্দ্রাতপের নিচে বসে। কন্যাপক্ষের লোকজন তাকে ঘিরে বসে। তখন চলে হুঁকোর পর হুঁকোর হিড়িক।

ক্রমে শুভলগ্ন উপস্থিত হয়। বদন গলায় কাপড় দিয়ে হাত জোড় করে শুভপরিণয় আরম্ভ করার জন্য সকলের অনুমতি ভিক্ষা করে। সকলেই খুশিমনে অনুমতি দেয়। ছাদনাতলাটা উঠানের একপাশে বড় ঘর ও ঢেঁকিশালার মধ্যে অবস্থিত। একখানা চওড়া কাঠের পিঁড়ি, তার চারধারে চারটে কলাগাছ। মাধব টুলের উপর বসে। এইবার মালতীকে নিয়ে এসে বর ও কলাগাছগুলোকে সাত বার প্রদক্ষিণ করানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি এবং পিঠে চপেটাঘাতও চলে। একটুও ব্যথা না পেয়ে কনে নিয়ে বর চলে যাবে, তা সঙ্গত হয় কি করে? সুন্দরী অতঃপর বরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করে। গাঁট-ছড়া বাঁধা, মালাবদল, শাস্ত্রীয় মন্ত্র উচ্চারণও যথারীতি সম্পন্ন হয়।

বিয়ের পর্ব সারা হওয়ার পর অভ্যাগতদের ভাত, ডাল, মাছ, দই, ইত্যাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়। পুরুষদের খাওয়ার পর মেয়েরা ডান হাতের ক্রিয়া সম্পন্ন করে। অতঃপর যে যার ঘরে চলে যায়। তবে মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন তরুণী থেকে যায়। বাসর ঘরে জাগবে বলে তারা ইতিপূর্বেই সঙ্কল্প করে এসেছিল।

বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের লোকজন পরিতোষ সহকারে ভোজন সুখ উপভোগ করলেও বর ও কনে উভয়েরই সেদিন কেমন যেন অরুচি ধরেছিল। সবচেয়ে ভাল খাবার দুজনকে পরিবেশন করা হলেও, উত্তেজনার জন্য মাধব সেরকম খেতে পারেনা। আর মালতী! বাস্তবতার রাজ্যে বাস করছিল বলে তার মনে হয় না। মাধবের আহারে ব্যাঘাত ঘটার আরো একটা কারণ ছিল। আহারের সময় তাকে একপাল সুন্দরী ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম গ্রাস মুখে দিতেই একজন সুন্দরী ঠাট্টা ক'রে বলে, 'আমাদের কার্তিকের মত বন্ধুর কী সুন্দর দাঁতের পাটি, এক একটা দাঁত যেন ছোট খাটো কোদাল

আরকি, আর হুঁকোর নলের মতই সাদা।' আরেকজন বলে,—'চোখ দু'টো মরি মরি কি সুন্দর যেন বিড়ালের মত।' তৃতীয় রূপসী তার নাকের প্রশংসা করে বলে শেষ প্রান্তটা কেমন চওড়া। চতুর্থা ভামিনী পেছন থেকে এসে তার পিঠে এক কিল বসায় ভাদ্র মাসের তালপড়ার শব্দে। এই ব্যাপারে মেয়েরা খিল খিল করে হেসে ওঠে। এই সুদীর্ঘ নৈশ ভোজন পর্ব ক্রমে শেষ হয়ে যায়। অতঃপর মাধবকে নিয়ে যাওয়া হয় বাসর ঘরে।

বাসর ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বদনের শয়নকক্ষে। ইংরেজদের মত বাঙালী সমাজে, বিশেষ করে, পল্লীর কৃষক সমাজে মধুচন্দ্রিমার কোন ব্যবস্থা না থাক্‌লেও স্বীকার করতেই হবে যে, সেদিন মাধবের বাসর ঘরে একটা চাঁদের বদলে দ্বাদশ চাঁদের সমবেত কিরণরশ্মির আবির্ভাব হয়েছিল। গরীব বদনের শোবার ঘরে খাট ছিল না। বিবাহ উপলক্ষে প্রতিবেশীর কাছ থেকে সে একখানা তক্তাপোশ ধার করে এনেছিল। তার উপর তোশক ও দু-তিনটে বালিশ বিছিয়ে বরের জন্য শয্যা রচনা করা হয়েছিল। তরুণীদের আদেশে মাধব এই তক্তাপোশের উপর আসন গ্রহণ করলে পর সকলে ধরাধরি করে সলজ্জা মালতীকে তার পাশে বসিয়ে দেয়। বেচারী মুখে কাপড় দিয়ে বসে থাকে। এইবার বয়স্কা মেয়েদের বর-কনেকে আশীর্বাদের পালা। আশীর্বচন শেষে বর-কনে তক্তাপোশ থেকে নেমে বয়স্কা মেয়েদের দণ্ডবৎ করে। মাধব অতঃপর পুনরায় আসন গ্রহণ করে, মালতী কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে মেঝের উপর বিছানো মাদুরের উপর বসে পড়ে। এই সময় অলঙ্গ এসে মাধবকে ঘুমাতে বলে। মাধব খুশি-মনে তা পালন করতেও রাজী ছিল, কিন্তু দুশমন মেয়েরা তা হতে দেয় কি? এক সুন্দরী বলে, 'ওমা! এ আবার কেমন বিয়ে? বিয়ের রাতে কেও ঘুমোয় নাকি? মাধবকে আজ সারারাত আমাদের সঙ্গে বসে কাটাতে হ'বে। এই তো সবে বসন্তকাল, এখন কোন বরকনে ঘুমোনোর কথা ভাবতে পারে? এস, বন্ধুগণ! আমরা

সকলে মিলে স্ফূর্তি করি।' সুন্দরীটি বরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'বেশ, ভাই, ভারী সুন্দর ভালমানুষ স্ত্রী পেয়েছ ; আশা করি এর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।'

মাধব—'কোন লোক স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ?'

প্রথম নারী—'কোন লোক নিজের স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ?' তা যদি না জান, তাহ'লে তুমি নীরেট মুর্খ। কাঞ্চনপুরেই কি এরকম শত শত ঘটনা ঘটছে না ? এই যে, কাদী, প্রায় প্রত্যেক রাতে স্বামী একে মারে।'

মাধব—'বৌকে মারা অত্যন্ত খারাপ। আমার মতে কোন অবস্থাতেই বৌকে প্রহার করা উচিত নয়।'

প্রথম নারী—'বরকে ভাল মানুষ বলেই মনে হয়। ও লো, মালতী ! তোর কপাল ভাল। এমন সুন্দর স্বামী পেয়েছিস্ !'

দ্বিতীয় নারী—'বোন, দেখে মনে হচ্ছে, তুই বরের পীরিতে পড়েছিস। তার চেয়ে বরং তুই ওর বাঁয়ে গিয়ে বো'স, আর আমরা উলু দেই ! বরের কথাগুলো তোকে মজিয়েছে। এখন তার কথা-গুলো মধুর মনে হচ্ছে, কিন্তু দুদিন পর ঐ কথা গরল হয়ে পড়বে। প্রত্যেক বরই এই রকম। পুরুষ জাতই খারাপ। সকলেই স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে।'

মাধব—'মনে হয়, আপন স্বপন পরকে দেখাচ্ছেন।'

দ্বিতীয় নারী—'ভাল কথা, বন্ধু ! তুমি রসিক বটে। তোমার মধ্যে বেশ রস আছে, যেমন ভেবেছিলাম, সেরকম শুক্‌নো কাঠ নও। প্রথমে তোমাকে গোরু মনে করেছিলাম, এখন দেখছি, তোমার মধ্যে কিছু পদার্থ রয়েছে। সাবাস ! সাবাস ! চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক।'

সমবেত মেয়েদের মধ্যে একজন, মাধবকে একটা গল্প ব'লে সকলের মনোরঞ্জন করতে বলে। মাধব বক্তার পরিবর্তে শ্রোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, একজন তরুণী এমন

একটা গল্প জুড়ে দেয়, যাতে হাসির ফোয়ারা উঠতে থাকে। ইতিমধ্যে মাধব ঘুমিয়ে পড়ে। তখন যে মেয়েটি গল্প বলছিল সে মাধবের কান ধ'রে টানে। আবার হাসির লহর ছুটে যায়। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী একটা গাছে কোকিলের কণ্ঠ-ধ্বনি শোনা যায়। মেয়েরা মাধবকে গান করতে বলে। নারী কণ্ঠেই গান ভাল শোনা যাবে, মাধবের এই মন্তব্যের ফলে একজন তরুণী একটা প্রেমের গান গায়। সম্মান রাখবার জন্য মাধবকেও গাইতে হয়। গান শেষ না হ'তেই অলঙ্গ বাসর ঘরের দুয়োর খুলে মাধবকে হাত মুখ ধুতে বলে, কারণ তখন রাত্রি শেষ হয়ে গিয়েছিল। মালতী বেচারী মাদুরে শুয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিল। মেয়েরা কিন্তু 'শয্যাতোলানীর' পারিশ্রমিক না পেলে বরকে ঘরের বের হ'তে দেবে না, এই রকম মত প্রকাশ করে। মাধব দু'টাকা সেলামী দিয়ে অব্যাহতি পায়। মেয়েরাও যে যার ঘরে চলে যায়।

দু'দিন পর বিবাহিত দম্পতি দুর্গানগর যাত্রা করে।

## দশম অধ্যায়

### গেঁয়ো ভূত

'আজ সকালে যে জোয়ান বৈরাগীটা ভিক্ষে নিতে এসেছিল, তার দিকে ও রকম কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়েছিলি কেন?' এক দিন রাতে শোয়ার সময় ঘরে ঢুকে খিল আট্‌কিয়ে গয়ারাম তার স্ত্রী আহুরীকে জিজ্ঞাসা করে।

আহুরী—'কোন বৈরাগী! আমি কোন পুরুষ মানুষের দিকে তাকাই!'

গয়ারাম—'কোন বৈরাগী? যেন কিছুই জান না! আকাশ থেকে পড়লে আর কি!'

আহুরী—'গুরুর নামে বল্‌ছি, আমি তুমি ছাড়া অন্য কোন পুরুষের মুখের দিকে তাকাইনে, মিথ্যে দোষ দিও না।'

গয়ারাম—'তোমাকে মিথ্যে দোষ দিচ্ছি, দুষ্ট শেয়াল! আমি কি নিজের দু'চোখ দিয়ে দেখি নি? বৈরাগীটা উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল, তুমি ভাঁড়ার থেকে এক মুঠো চাল এনে ওর ঝোলায় ঢেলে দিলে। চাল দেবার সময় তুমি ওর মুখের দিকে তাকালে, সে-ও তোমার দিকে তাকাল, আর তুমি একটু বাঁকা মুচ্‌কি হাসি হাসলে। গোয়াল ঘর থেকে আমি সব দেখেছি। অস্বীকার করতে পার?'

আহুরী—'গোপীনাথের দোহাই, সবই মিছে কথা। সত্যিই জোয়ান বৈরাগীটার ঝোলায় এক মুঠ চাল দিয়েছিঁ, কিন্তু আমি যে তাকিয়েছি ও হেসেছি তা অস্বীকার করছি।'

গয়ারাম—'তুমি দেখেছিলে, হেসেওছিলে। না বলো না। গোয়াল থেকে সব দেখেছি।'

আহুরী—'তুমি বড্ড সন্দিগ্ধমনা স্বামী। আর সব দিক দিয়ে ভালো। কিন্তু সব সময়ে সন্দেহ কর, আমি অন্য লোকের দিকে তাকাই, পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা কই। আমি কিন্তু কক্‌খনো অমন করি না। বিয়ে হবার পর কতবারই না সন্দেহ করলে? কিন্তু পরমেশ্বর জানেন, আমি নির্দোষ।'

গয়ারাম—'আমি সত্যি-সত্যিই যে তোমাকে অপরাধী বলছি তা নয়। কিন্তু তোমার মনটা বড় নোংরা; সবসময়েই তুমি ছোকরাদের মুখের দিকে তাকাও। আজ সকালে জোয়ান বৈরাগীটার দিকে যে তাকিয়েছিলে, তা স্বীকার করছো না কেন?'

আহুরী—'আমি হাসিনি। তুমি মিথ্যে কথা বল্‌ছো।'

এতে গয়ারামের রাগ যায় বেড়ে সে স্ত্রীর গালে চড় মারে। আহুরী কেঁদে মাটিতে পড়ে যায়, আবার এত জোরে কাঁদে, মনে হয় যেন প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়েছে। অলঙ্গ ছিল পাশের কুটিরে—ঢেঁকীশালায়। সে জোরে বেরিয়ে পড়ে গয়ারামের ঘরের দুয়ারে গিয়ে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করে! কিছুই হয় নি, ছোটবৌর দুষ্টুমির জন্য তাকে তিরস্কার করা হয়েছে বলে সে কাঁদছে। এই কথা বলার পর, অলঙ্গ তার ঘরে চলে যায়, যাওয়ার সময় বলে যায়, যেন ছোট বৌ-এর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হয় ও মার-ধর করা না হয়। আহুরী মাটির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আপন মনে বিড় বিড় করে বকে, 'ও বিধাতা, আমার কপালে কত দুঃখ লিখেছ! ম'লে সুখী হ'তাম। হাড়ে বাতাস লাগতো।'

গয়ারাম—'এখনও স্বীকার কর। বৈরাগীকে দেখে হেসেছিলে? প্রতিজ্ঞা কর অমন কাজ আর কখনো করবে না; তাহলে তোমাকে ক্ষমা করছি।'

আন্থরী—'গুরুর নামে বলছি, আমি অমন করি নি। আমাকে মন্দ ভেবো না প্রাণেশ্বর।'

গয়ারাম—'আমি নিজের চোখে দেখেছি, একথা বলার পরেও অস্বীকার করছো?'

আন্থরী—'ধর বৈরাগীর দিকে তাকিয়েছি আর হেসেওছি, তাতে কি? কোন অপরাধ করেছি কি?'

নারীর-শালীনতা সম্বন্ধে হিন্দু ভাব-ধারণার বশবর্তী গয়ারাম এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ উত্তরে এতদূর স্তম্ভিত হয়ে পড়ে যে, সে বিছানা থেকে উঠে ঘরের যে কোণে আন্থরী শুয়েছিল সেখানে গিয়ে আন্থরীর পিঠে দু-তিনটে জোর ঘুষি লাগায়। আন্থরী আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে, কিন্তু অলঙ্গ তখন নিদ্রিত, সে কান্না শুন্‌তে পায় না। উভয়ের মধ্যে আর কোন কথাবার্তা হয় না। গয়ারাম মেঝের উপর বিছানো মাদুরের উপর ঘুমিয়ে পড়ে। আন্থরী মেঝের উপর যেখানে শুয়ে ফুঁপাচ্ছিল, সেখানেই নিদ্রা যায়। গয়ারাম ভোর বেলায় উঠে, গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত স্ত্রীর উপর লক্ষ্য না করেই গোরু নিয়ে সটান মাঠে চলে যায়। আন্থরীও ঘুম থেকে উঠে ঘরের কাজে মন দেয়। বদন ও কালোমানিক লাঙ্গল নিয়ে চলে মাঠে, আর গোবিন্দ পুঁথি বগলে চলে পাঠশালায়। সুন্দরী স্নান করে সকলের আগে, কারণ রান্নাঘরের ভার এখন তার হাতে। দুপুর বেলায় মাঠের বাবুরা যখন বাড়ীতে ভাত খেতে আসে, তখন হাতে-কালি মুখে-কালি গোবিন্দও ঘরে ফিরে আসে। সে যে খুব মন দিয়ে লিখতে আরম্ভ করেছে, এতে তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে পুরুষরা আহার সাঙ্গ ক'রে আবার মাঠে চলে যায়, গোবিন্দও চলে যায় পাঠশালার বৈকালিক অধিবেশনে। মেয়েরা দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পুকুরে বাসন মাজতে যায়। অতঃপর অলঙ্গ চরখায় মনোনিবেশ করে সুন্দরী ও আন্থরী মাটির কলসী নিয়ে যায় হিমসাগরে।

বেলা পাঁচটার সময় সুন্দরী ও আন্থরী অলঙ্গর পাশে বসে তূলা

পিঁজে দিচ্ছে এমন সময় আজগুবী এক ঘটনা ঘটে। হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উ'ঠে মাটিতে পড়ে যায়। তাকে মাটি থেকে তোলার পর সে আরো বেশি অট্টহাসি আরম্ভ করে ও বারান্দায় লাফালাফি আরম্ভ করে। অলঙ্গ ও সুন্দরী বেশ বুঝতে পারে যে, আতুরীর বাতাস লেগেছে। আতুরীকে ভূতে পাওয়ার সংবাদ দাবা-নলের মতই গাঁয়ের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাঠে কার্যরত বদন ও তার ভাইরাও তা শুন্‌তে পায় ও ছুটে বাড়ীতে আসে। বাড়ী এসে তারা দেখে লোকে লোকারণ্য। পল্লী বাংলার হিন্দু মেয়েদের পক্ষে ভাসুরের মুখ দেখা ও তার চোখে চোখে তাকানো মহাপাপেরই সামিল। আর আতুরী কিনা বুকে ও মাথায় কাপড় না দিয়েই বদন ও কালোমানিকের সামনে ছুটে এসে হাসতে ও লাফ দিতে আরম্ভ করেছে! কাজেই, আতুরী যে প্রেতগ্রস্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রেত যে কোন শ্রেণীর তা নিয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ডাইনী ও ভূত এই দুই শ্রেণীর প্রেত সচরাচর বাংলায় দেখতে পাওয়া যায়। আতুরীকে ভূতে না ডাইনীতে পেয়েছে? বাড়ীতে যে-সমস্ত লোকজন ভিড় করেছিল, তাদের মধ্যে জনৈকা বৃদ্ধা এই সমস্যার সমাধান ক'রে দেয়। সে বলে একটা হলুদ পুড়িয়ে আতুরীর নাকে ধর। যদি আতুরী তা সহ্য করে, তাহ'লে বুঝতে হবে ডাইনীতে পেয়েছে, আর যদি সহ্য করতে না পারে তা'হলে নিশ্চয় যেন ভূতে ধরেছে। তখন গয়ারাম ও অপর তিন জন শক্তিশালী যুবক আতুরীকে চেপে ধরে—কারণ, তখন তার গায়ে অসম্ভব বল! এক টুকরো হলুদ পুড়িয়ে নাকে ধরতেই আতুরী বিকট চিৎকার ক'রে নিজেকে গয়ারাম ও বন্ধুদের কবলমুক্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। ব্যাপার দেখে আতুরীর ভূতে পাওয়াই সাব্যস্ত হয়। তখন দেবগ্রামের বিখ্যাত ভূতের ওঝাকে শীগ্‌গীর ডেকে আনার ব্যবস্থা করা হয়। এই মহাপরাক্রম ওঝার আসতে বেশ একটু সময় লাগে। ইতিমধ্যে বাঙলার ভূতগুলোর একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করা যাক।

বাংলার ভূত, অর্থাৎ বাঙালী পুরুষ ও বাঙালী নারীর প্রেতাত্মাদের মধ্যেও রীতিমত বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান; অন্ততঃপক্ষে পল্লী বাংলার অশিক্ষিত মানুষ এই সমস্ত ভূতপ্রেত ও তাদের শ্রেণী-বিন্যাসে বিশ্বাস ও তাদেরকে ভয় করেও চলে। মুসলমান ভূতগুলো মাম্‌দো নামে পরিচিত। এখানে তাদের কোন পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে না। প্রধানতঃ হিন্দু ভূতদের সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে। এদেরকে মোটামুটি পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম বা শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ভূতরা ব্রহ্মদৈত্য নামে পরিচিত। মৃত ব্রাহ্মণদের প্রেতাত্মারাই নাকি এই নাম ধরে থাকে। গয়াশ্বত্থগাছ বা বেলগাছ এদের প্রিয়নিকেতন। অন্যান্য ভূতের মত এরা অখাদ্য ও অপবিত্র জিনিস খায় না, বা কাউকে ভয়ও দেখায় না। কিন্তু এদের সম্মানে আঘাত লাগলে আর রক্ষা নেই, একেবারে ঘাড় মট্‌কে ভেঙে দেবে। পাড়াগাঁয়ে অশিক্ষিত মানুষ এজন্য এখনো পারতপক্ষে কখনও অশ্বত্থ গাছ বা বেল গাছে উঠতে চায় না, উঠবার সময়, অন্ততঃপক্ষে গাছের গোড়ায় প্রণাম তারা করবেই ব্রহ্মদৈত্যদের ভয়ে ও ভক্তিতে।

ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতীয় প্রেতাত্মাগুলো সাধারণতঃ ভূত নামে পরিচিত। এরা তালগাছের মত ঢ্যাঙা, অত্যন্ত কৃশকায়, রঙ মিসমিসে কালো। গয়াশ্বত্থ ও বেল গাছ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত গাছে এরা বাস করে। নিশীথ রাতে এরা গ্রামে গ্রামে ও মাঠে মাঠে বিচরণ ক'রে নৈশ পথচারীদের ভয় দেখায়। নোংরা ও অপবিত্র জায়গায় এরা ঘোরাফেরা করে, দেবালয়ের ত্রিসীমানা মাড়াতে চায় না। এরা একেবারে উলঙ্গ। মেয়ে মানুষের উপর এদের ভীষণ আসক্তি এবং প্রায়ই তাদের কাছে থাকে। ভাত ও অন্যান্য সমস্ত ভোজ্যদ্রব্যই তারা খায়, কিন্তু মাছের অত্যন্ত ভক্ত। এজন্য বাঙালী চাষী মাছ হাতে ক'রে কখনই স্থানান্তরে যেতে রাজী হয় না। কালী, দুর্গা, শিব বা ভূতনাথ এবং রামনাম উচ্চারণ করলে ভূতের প্রকোপ থেকে

রক্ষা পাওয়া যায়। লোহার ডাণ্ডাও নাকি ভূতকে দূরে থাকৃতে বাধ্য করে। ভূতেরা সাধারণতঃ নাকি সুরে কথা বলে।

ভূতেরা সাধারণতঃ পুরুষ জাতীয়। মেয়ে ভূতরা পেত্‌নী ও শাঁকচুন্নী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পেত্‌নীদের গায়ে উৎকট গন্ধ, এরা অত্যন্ত কামাসক্ত; এদের খপ্‌পরে পড়লে আর রক্ষে নেই, দেহ ও আত্মা, উভয়েরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। শাঁখের মত শাদা কাপড় পরে ব'লে, মেয়ে ভূতের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে শাঁকচুন্নী। পেতনীদের মত নোংরা না হলেও শাঁকচুন্নীরা মানুষের যথেষ্ট ক্ষতি করে। নিশীথ রাতে গাছের গোড়ায় শাদা ধবধবে কাপড়ের মত এরা দাঁড়িয়ে থাকে।

আর এক শ্রেণীর ভূতের নাম স্কাঁধকাটা; যে সমস্ত লোকের মাথা কেটে ফেলা হয়, তারাই নাকি এই আকার প্রাপ্ত হয়। গাঁয়ের জলাভূমিতে এরা বাস করে। অনেক সময় মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে এরা চলে হাত দুখানা প্রসারিত ক'রে। সেই হাতের মধ্যে এসে পড়লে আর রক্ষা নেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই শ্রেণীর ভূত সব চেয়ে নির্মম ও নিষ্ঠুর।

ওঝা আসার আগেই আতুরীকে বদনের শয়নকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। ওঝা বাড়ীর ভেতর ঢুকতেই আতুরী বিকট চিৎকার ক'রে ঘরের এক কোণে গিয়ে বসে। ভূতুড়ে শক্তিশালী পুরুষ, বয়স মাঝামাঝি। চাষীজাতীয় বলে চেহারাটা রুক্ষ-ধরনের। ঘরের মাঝখানে সে পিঁড়ে পেতে ব'সে বিড় বিড় ক'রে মন্ত্র আওড়াতে আরম্ভ করে। নিম্নে এই সমস্ত মন্তরের একটা নিদর্শন দেওয়া যাচ্ছে ঃ—

ধূলা সত্তম,
মধু পত্তম,
লা ধূলা করম সার;
আশী হাজার কোটী বন্দুম,
তেইশ হাজার লার।

যে পথে যায় অমুক ছেড়ে দে কেশ,
ডাইনী, যোগিনী , প্রেত, ভূত,
বাও, বাতাস, দেব, দূত,
কাহারো নাইকো না বলিও।
কার আজ্ঞা ?
কাম্‌দেব কামাখ্যা হাড়ীর ঝি চাঁদির আজ্ঞা;
শীগ্‌গীর লাগ, লাগ, লাগ।

আসন থেকে উঠে, আতুরীর কাছে গিয়ে ভূতের ডাক্তার বলে—

'কে তুমি? কোথায় থাক?'

আতুরী জোরে নাকি সুরে বলে—'আমার নাম বা যেথায় আমি থাকি, তা শুনে তোমার দরকার?'

ওঝা—'তুমি কে তা বলতেই হবে, নইলে টের পাবে।'

আতুরী—'যা খুশি কর। আমি কে তা বলবো না। আমার ক্ষতি করতে গেলে বাধা দেব।'

ওঝা—'মহাদেবের দোহাই! আমার কথার উত্তর না দিলে হামান দিস্তায় তোমার হাড় গুঁড়ো করবো।'

আতুরী—'তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো না।'

ওঝা তখন যথাশক্তি ফুঁক দিয়ে মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করে; অতঃপর হাতের বংশদণ্ড দ্বারা আতুরীকে বেদম প্রহার করে। আতুরী যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে ওঠে ও নাকি সুরে বলে যে ও সব কথার জবাব দেবে।

ওঝা—'তুমি কে?'

আতুরী—'আমি ভূত, মহাদেবের প্রজা।'

ওঝা—'কোথায় থাক?'

আতুরী—'আগে থাকতাম হিমসাগর পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বড় আমগাছে; কিছুদিন আগে বাসা বদ্‌লিয়ে বদনের বাড়ীর কোণে তালগাছে আশ্রয় নিয়েছি।'

ওঝা—'ভূত হওয়ার আগে কার দেহ আশ্রয় করে ছিলে ?'

আতুরী—'এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার হুকুম নেই। এ হচ্ছে প্রেত জগতের গুপ্ত রহস্য।'

ওঝা—'কিন্তু ছোট বৌকে ধরলে কেন ?'

আতুরী—'রূপের গরব করে, পুরুষ মানুষদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে বলে।'

ওঝা—'এক্ষুণি ওকে ছেড়ে দিতে হবে।'

আতুরী—'জোর করে আমাকে ছাড়াতে পার না।'

ওঝা—'কি বল্লে, পারি না ? দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি।'

এই কথা বলে ওঝা আতুরীকে প্রহার করতে আরম্ভ করে। আতুরীও পাগলের মতো ঘরের মধ্যে ছোটাছুটি করে। কিছু সময় পর আতুরী বলে যে এক ঘণ্টার মধ্যে সে চলে যাবে। ওঝা তাতে রাজী না হয়ে আবার প্রহার করে ও থলের ভেতর থেকে একটা শিকড় বের করে পানের সঙ্গে আতুরীকে খাইয়ে দেয়। কিছু সময় পর আতুরী বা তাকে আশ্রয় করে যে ছিল সেই প্রেতাত্মা বলে যে সে চলে যেতে রাজী আছে, আর যাওয়ার সময় বাটনা বাটার শিলটা দাঁতে করে ঘরের ভেতর থেকে বারান্দায় নিয়ে যাবে। ওঝা তখন শিল আন্‌তে হুকুম দেয়। ওটা ওজনে প্রায় পাঁচ সের। আতুরী সেটা দাঁতে চেপে ধ'রে ঘরের চৌকাট পার হতেই মূর্ছা যায়। দাঁতের ভেতর জাঁতি চালিয়ে মুখে ও চোখে জল ঢেলে মূর্ছা দূর করা হয়, লজ্জা ও শালীনতাবোধ আবার ফিরে আসে। ওঝা নগদ এক টাকা ও পুরানো একখানা ধুতি নিয়ে খুশি মনে বিদায় গ্রহণ করে। গয়ারাম কিন্তু সেই রাতে ও পরবর্তী কয়েক রাত পত্নীর সঙ্গে এক ঘরে থাকতে চায় না। কুলপুরোহিতের দ্বারা শান্তি স্বস্ত্যয়ন ক'রে পরে আবার সে পত্নীর সঙ্গে বাস করে।

# একাদশ অধ্যায়

## পাঠশালায় গোবিন্দচন্দ্র

কাঞ্চনপুরের দুর্ধর্ষ পণ্ডিত রামরূপ সরকারের পাঠশালায় গোবিন্দ চন্দ্রের চকের সাহায্যে মাটির উপর প্রথম অক্ষর পরিচয় সম্বন্ধে ইতি-পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় ছয় মাস ধরে মাটিতে এই ভাবে লেখার পর সে প্রমোশন পায় তালপাতার শ্রেণীতে। খড়িমাটির বদলে এবার সে খাগড়ার কলম ধারণ করে; সেকালে পাঠশালায় শ্লেটের চলনও ছিল না। বাম বগলে এক তাড়া তালপাতা, কানে খাগড়ার কলম ও ডান হাতে মাটির দোয়াত নিয়ে গোবিন্দ প্রতিদিন সকালে ও অপরাহ্নে পাঠশালায় যেত। ভুল অক্ষর লিখলে বা অক্ষর সুন্দর না হলেই সে হাত দিয়ে বা কব্জী দিয়ে তা মুছে ফেলতো। গায়ে ও কাপড়-চোপড়ে কালি মেখে যখন সে ঘরে ফিরতো তখন অলঙ্গ ও সুন্দরী প্রচুর আনন্দ অনুভবই করতো, ছেলের লেখাপড়া শেখার বহর দেখে।

সেকালের পাঠশালায় প্রথম কয়েক বছর ছেলেরা শুধু লিখতো আর একটু-আধটু পাটীগণিতের অঙ্ক শিখতো। বইয়ের সঙ্গে তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। প্রথমে বর্ণমালা ও যুক্তাক্ষর লেখা, তারপর শুধু লোকের নাম। অঙ্ককষা প্রথম প্রথম মেঝের উপরেই নিষ্পন্ন করতে হ'ত। সর্বনিম্ন শ্রেণীটা ছিল মেঝেয় লিখবার ক্লাস; এখানে গোবিন্দকে কাটাতে হয় ছ'মাস। তারপর, পরবর্তী তালপাতার শ্রেণীতে তার কাটে তিন বছর। চতুর্থ বর্ষের প্রারম্ভে সে প্রমোশন পায় কলাপাতার শ্রেণীতে। তার উপর কাগজের শ্রেণী,

এই শ্রেণীতে প্রমোশন পাওয়ার আগেই গোবিন্দকে বিদ্যালয়ের মায়া কাটাতে হয়। কলাপাতের শ্রেণীতে এসে গোবিন্দ লোকের নাম লেখা ছেড়ে দিয়ে মনোনিবেশ করে চিঠি-পত্র লেখার ব্যাপারে। তখনকার দিনে বাংলা লেখাপড়া শিক্ষায় পত্রলিখন বিদ্যাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব'লে বিবেচিত হত। কয়েক বছর ধরে ছাত্রদের এটা আয়ত্ত করতে হত। বাংলায় চিঠিলেখা ততটা সহজসাধ্য নয়; সম্পর্ক, সামাজিক মর্যাদা, ইত্যাদি হিসাবে লিখবার ধরন এবং পদ্ধতিরও প্রকারভেদ ছিল শত শত। দেখতে গেলে এক রকম অকূল সমুদ্রেই গোবিন্দচন্দ্রকে ঝাঁপ দিতে হ'ল। পাটীগণিতও তাকে আয়ত্ত করতে হয়; এখানে তার বিদ্যার দৌড় মাত্র মিশ্র বিয়োগ পর্যন্ত পৌঁচেছিল।

পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসের সময় গোবিন্দকে পণ্ডিতের হাতে নির্যাতন কম ভোগ করতে হয় নি। প্রাণবন্ত ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন কৃষক তনয়ের কাছে পাঠশালার বিধিনিষেধ অসহ্য বিবেচিত হয়। সেজন্য সে প্রায়ই পাঠশালায় না এসে গ্রামের শেষভাগে পুকুরের পাড়ে, আমবাগানে ও তেঁতুল বাগানে রাখাল বালকদের সঙ্গে খেলায় মন দিত। স্কুল থেকে পালিয়েই কি রক্ষা আছে? এই সমস্ত দুষ্ট ছেলেকে সায়েস্তা করবার জন্য, রামরূপ সরকার রীতিমত গোয়েন্দা-বিভাগও কায়েম করেছিল। সর্দার পড়োদের মধ্যে চার জন হৃষ্টপুষ্ট বালকের উপর এই ভার ন্যস্ত ছিল। পলাতক ছাত্রকে যেখান থেকে হোক পাকড়াও করে তারা নিয়ে আসতো। গোবিন্দকেও তারা এই ভাবে অনেকবার গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে এসেছে। স্কুলে নিয়ে আসার পর তাকে প্রচুর প্রহার ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। এই ডিটেক্‌টিভ ফৌজ আরো নানাপ্রকারে গুরুর সেবা করতো। পণ্ডিতের বাড়ীতে কোন উৎসব হলেই এরা পরের কলাবাগানে ঢুকে প্রচুর পাতা কেটে নিয়ে আসতো, আর গুরুমহাশয় অম্লান বদনে সেই সমস্ত পাতা গ্রহণ করতেন।

এই রকম পরিবেশের মধ্যেই গোবিন্দের লেখাপড়া চল্‌তে থাকে।

এই তো গেল দিনের বেলার জীবন। সন্ধ্যে বেলায় এই কৃষক পরিবারের জীবন যাত্রা শান্ত ভাবেই পরিচালিত হয়। কাঞ্চনপুরে গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা মদের দোকানও ছিল। কিন্তু হাঁড়ী ডোম ছাড়া কৃষিজীবীদের কেহই এখানে আসতো না। মদ্যপান তাদের কাছে মহাপাপ রূপেই গণ্য ছিল। বদন, কালোমানিক ও গয়ারাম সাধারণতঃ বাড়ীতেই সন্ধ্যা সময়টা কাটাতো। গ্রীষ্মকালে উঠানে মাতুর পেতে ব'সে তারা চাষবাস ও জমিদার-মহাজনের গল্পেই মশ্‌গুল থাকতো। অলঙ্গও তাদের আলোচনায় যোগ দিত। এই সময় কোন প্রতিবেশী এলে হুঁকা-কল্‌কে দ্বারা তাদের অভ্যর্থনা করা হত।

এই সব সান্ধ্য-সম্মিলনীতে গোবিন্দও হাজির থাক্‌তো। সূর্যাস্তের সময় পাঠশালা থেকে ফিরে এসে বারান্দার এক কোণে তালপাতার তাড়া, খাগড়ার কলম ও মাটির দোয়াতটা রেখে দিয়ে পুকুরে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে আসতো, তারপর ডালভাত খেয়ে মাতুরে বাবা কাকাদের কাছে ব'সে পড়তো। এখানে বসে সে নামতা এবং স্কুলে আর যে সমস্ত পড়া শিখেছে তা আবৃত্তি করতো। বদন এই সময় তাকে পাটীগণিতের তুয়েকটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করতো। বদন এ নিয়ে বিশেষ পীড়াপীড়ি করতো না। পিতার সঙ্গে আলোচনা শেষ হওয়ার পর গোবিন্দ যেত শম্ভুর মার বাড়ী রূপকথা শুনতে। পঞ্চাশ বছরের এই বুড়ী চরকায় সুতো কেটে তাঁতীদের কাছে বেচে কোনরকমে সংসার চালাতো। দশ বছরের ছেলে শম্ভু লোকের গোরু চরিয়ে তু'-পয়সা উপায় করে আনতো। কাঞ্চনপুরের যে পাড়ায় এই বুড়ী বাস করতো, সেই পাড়ার সে ছিল শ্রেষ্ঠ গল্পবক্তা। ছেলেরা তাকে ভয় ও বিস্ময়ের চোখেই দেখতো। ল্যাম্প জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা তার বাড়ীতে হাজির হ'ত। বুড়ীর ল্যাম্পের তেল শ্রোতারাই পালা করে সরবরাহ করতো। বুড়ী যে শুধু গল্পই বলতো তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে

তার চরকাও চল্‌তো ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ ক'রে। কোন করুণ ও বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণার সময় সে চরকা ছেড়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গি করতো।

রাজা-রানী ও ভূতের গল্প এবং চার ইয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত—এই-গুলো ছিল শম্ভুর মার গল্প বলার প্রধান বিষয় বস্তু। শম্ভুর মার প্রত্যেক রাজার দুই রানী, একজন সুয়োরানী আর একজন দুয়োরানী। গল্প শেষে খারাপ রানীর শাস্তি আর ভালো রানীর সুখ-সমৃদ্ধি। চার ইয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিয়ে অনেক গল্প বর্ণিত হলেও প্রত্যেক গল্পেই চার বন্ধু ছিল, রাজপুত্র, পাত্রের পুত্র, কোটালের পুত্র ও সওদাগরের পুত্র। কিন্তু তার সব চেয়ে জনপ্রিয় বা বালকপ্রিয় গল্প ছিল ভূতের গল্পগুলো। এই গল্পগুলো বলবার সময় বুড়ী তার সমস্ত কল্পনাশক্তি উজাড় করেই বর্ণনা করে যেতো। গলার সুর আনত করে, ফিস ফিস শব্দে সে ভূতের আগমন বার্তা ঘোষণা করতো এবং ভূতের মুখে কথা বলবার সময় সে-ও নাকি সুরে কথা বল্‌তো। এই সময়ে তরুণ শ্রোতারা ভয়ে কাঠ হয়ে যেত। একলাটি বাড়ী ফিরতে কারুর সাহস হ'ত না। দল বেঁধে সকলে অগ্রসর হ'ত, প্রত্যেকে আপন আপন বাড়ীর দুয়োরে উপস্থিত হওয়ার পর বাড়ীতে প্রবেশ করতো। গোবিন্দকে কিন্তু সাথীরা বাড়ীর ভেতরে পর্যন্ত রেখে আসতো।

## দ্বাদশ অধ্যায়

### হিন্দু বিধবা

আগস্ট মাস। মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়ে। এত মোটা বৃষ্টির ধারা নাকি কাঞ্চনপুরবাসীর কখনো চোখে পড়ে নি। অজয় নদীর বাঁধ ভেঙে যায়, মায়া নদীর তীর উপচে প্লাবন সৃষ্টি করে। কাঞ্চনপুর জলরাশি বেষ্টিত দ্বীপে পরিণত হয়। চাষবাস সমস্তই মাথায় ওঠে। গাঁয়ের লোক নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকে, কেহ কেহ দড়ি কাটে, আর কোন কোন দুঃসাহসী হাত জাল নিয়ে মাছ ধরতেও যায়। কয়েক দিন পর জল কমে যায়; ধানের জমিগুলো ভেসে ওঠে; বদন, কালোমানিক ও গয়ারাম আউশ ধানের অবস্থা দেখবার জন্য পাচন হাতে মাঠে বেরোয়। গয়ারাম ছুটো ধানের জমির আলের উপর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময়ে তিন হাত লম্বা একটা কাল রংয়ের কেউটে, বিদ্যুৎ বেগে তার দিকে ছুটে আসে। পালাবার কোন উপায় থাকে না। চোখের নিমেষেই কেউটে গয়ারামের গোড়ালিতে পরপর দু'বার ছোবল মারে। কালোমানিক নিকটেই ছিল; সে ছুটে এসে বাঁশের লাঠির এক আঘাতেই সাপটাকে শেষ করে ফেলে। কিন্তু তাতে আর কি হবে? কেউটের বিষ তো সোজা কথা নয়! গয়ারাম মাটিতে পড়ে যায়। বদন ঘটনাস্থলে এসে পড়ে, শরীরের যে জায়গায় কামড়েছে, তার উপর সে শক্ত করে গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলে ও কালোমানিকের সাহায্যে গয়ারামকে বহন করে বাড়ীতে নিয়ে আসে। মেয়েরা আরম্ভ করে করুণ বিলাপ-ধ্বনি। গাঁয়ের লোক প্রায় সকলেই বদনের বাড়ীতে সমবেত হয়। অনেকে গয়ারামের

জীবন ভিক্ষা ক'রে মনসাদেবীর স্তব-স্তুতি করে। নানা জনে নানা প্রকার ঔষধেররও পাতি দেয়। শেষ পর্যন্ত ছ'মাইল দূরবর্তী চন্দ্রহাটির বিখ্যাত মালকে আনার কথা সাব্যস্ত হয়। গয়ারাম বয়সে নবীন, কারুর কোন অনিষ্টও কোনদিন করে নি। গ্রামবাসী সকলেই তার জন্য অন্তরে ব্যথা অনুভব করে।

শেষ পর্যন্ত চন্দ্রহাটির মাল এসে ঝাড়-ফুঁক আরম্ভ করে। সে গয়ারামের দেহ ঘর্ষণ করে বিষ নামাতে চেষ্টা করে, মুখ লাগিয়ে ফুঁ দেয়, এবং বহু মন্ত্রও বলে ; এর মধ্যে একটা মন্ত্র হচ্ছে এইরকম—

হায় মোর কি হলো!
ঘাটাইতে বিষ ম'লো!
নাই বিষ, বিষহরির আজ্ঞা!

ওঝা কেবলমাত্র মন্তরই পড়ে না। নানা রকমের গাছ-গাছড়া চূর্ণ ক'রে, সে রোগীকে সেই সমস্তই সেবনও করায়। সারা রাত্রি ধ'রে মাল যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কখন দেবতাকে ডাকে, কখন ফুঁক দেয়, কখনো আবার ওষুধপত্র প্রয়োগ করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। ভোর হওয়ার আগেই গয়ারাম প্রাণহীন মৃতদেহে পরিণত হয়।

এই ভয়াবহ ঘটনা গরীব কৃষক পরিবারকে অবর্ণনীয় শোকে মুহ্যমান করে। বদন তার ডান হাত কাটা গিয়েছে বলেই মনে করে ; কারণ গয়ারাম কনিষ্ঠ হলেও বয়সের তুলনায় সে ছিল জ্ঞান-বৃদ্ধ ; বহু বিষয়ে সে চমৎকার সুযুক্তি দেখিয়েছে। কালোমানিক বদনের মত মুখে শোকের ভাব ততটা প্রকাশ করতে না পারলেও এই রুক্ষ দেহের ভেতর অন্তরটা ছিল অত্যন্ত দয়াপ্রবণ ও সহানুভূতিশীল। ছোট ভাইয়ের অকাল মৃত্যুতে সে অন্তরে এতদূর ক্লেশ অনুভব করে যে, তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। অলঙ্গর শোক সত্য সত্যই সীমাহীন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কাঁদে; কখনো কখনো মধ্য রাত্রিতেও তাকে কাঁদতে শোনা যায়। বহুদিন সে চরকা স্পর্শও করে না, অপরাহ্ণে সে এত

জোরে বিলাপ করে যে, দূরবর্তী কুটীরগুলিতেও সে ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। কাঁদার সময় সে ছেলের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার চরিত্রের প্রত্যেকটি দিক সবিস্তারেই বর্ণনা করে। গয়ারামের অকাল মৃত্যুর স্মৃতি তাকে সবচেয়ে ব্যথিত করে। অস্বাভাবিক মৃত্যু, সাপে কাটা, বজ্রপাতে মৃত্যু, আগুনে পুড়ে ও পতনের ফলে মৃত্যু যে দেবতার অভিশাপ। এই গাঁয়ের মধ্যে কেনই বা তাদের উপরই দেবতার অভিশাপ পড়লো তা অলঙ্গ বুঝে উঠতে পারে না। মনে মনে সে বলে: 'আমরা কি দেবতাদের পূজো করি না, ব্রাহ্মণদের মান্য করি না? সাধ্যমত ভিক্ষাও কি দিই না? ধর্মের উৎসবগুলোও কি পালন করি না? তবে দেবতারা কিসের জন্যই বা আমাদের উপর কুপিত হবে? আমরা কোন্ পাপ করেছি যে এতবড় বিপদ আমাদের উপর পড়লো? হায় ভগবান! তোমার মনে কি এই ছিল?'

অলঙ্গের মত একেবারে স্বার্থশূন্য না হ'লেও আহুরীর দুঃখ কিন্তু সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ হচ্ছে কালো নৈরাশ্যের অন্ধকার। তার বিবাহিত জীবনের যবনিকাপাত হয়েছে। তরুণ বয়স সত্ত্বেও সারা জীবন তাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। স্বামীর সাহচর্য নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই সুখ যখন অসম্ভব হ'য়ে পড়লো তখন জীবনের আর কি মূল্য থাক্‌তে পারে? ভয়াবহ বৈধব্যের সম্ভাবনা তাকে সবচেয়ে বেশি দুঃখিত করে। দ্বিপ্রহরেই তার জীবন-সূর্য অস্তমিত। আশার আলো সব মানুষের মনে উঁকি মারলেও তাকে একেবারে ছেড়ে গিয়েছে। তার অবশিষ্ট জীবন—একে কোনি-রকমে জীবন বলা সম্ভব হ'লেও - হ'বে একটানা মধ্যরাত্রি, ঊষার আলো কোনদিন তার আঁধার দূর করবে কিনা কে জানে। হিন্দু বিধবা বোধহয় সবচেয়ে কৃপার পাত্রী। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন যে সব সময় তাকে পীড়া দেয়, তা নয়। দুর্ভাগ্যটা তার বিশেষ ধরনের এই জন্যে যে, স্নেহ আকাঙ্ক্ষা সহ তার হৃদয় উৎসটা চিরদিনের জন্যই শুকিয়ে যায়। প্রাণহীন দেহই সে কোনরকমে বয়ে চলে,

জীবনটা বিরাট শূন্যে ভরে উঠে। আতুরী, অনঙ্গের মত, বিলাপ ধ্বনিতে বাড়ী ও বাড়ীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্রতিধ্বনিত করে না বা কাঁদবার সময় অমায়িক স্বামীর গুণাবলীও সবিস্তারে বর্ণনা করে না। বিধবা এরকম করলে শালীনতাতেই যে আঘাত পড়ে। দুঃখটা তার নীরব। দিন-রাত সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে; শাঁখা, গালার বা রূপার অলঙ্কার-পত্র ভেঙে ফেলে, পত্নীত্বের প্রতীক হাতের নোয়া, সীমন্তে সিঁদুর দেওয়া, পাড়যুক্ত শাড়ী কাপড় পরা—সবই বর্জন করে। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আহ্লাদ তার ফুরিয়ে গিয়েছে, জীবন রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে, সংসারে বাস করেও তাকে থাকতে হবে সংসারের সাথে নির্লিপ্ত।

হিন্দু পরিবারে, প্রায় সকলেই বিধবাকে সহানুভূতির চোখে দেখে থাকে। এমন অনেক বৃদ্ধা হিন্দু বিধবার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাঁরা, নিজের গৃহের কর্তৃত্ব করা ছাড়া, নিজ গ্রামের বড় বড় সামাজিক ব্যাপারেও পরামর্শ-দাত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। সৎস্বভাবা, বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা বিধবা অনেক সময় পুরুষের তুলনায় ঢের বেশি উপস্থিত বুদ্ধি ও কর্তব্যবোধের পরিচয় দেন। আতুরীর দুঃখ-কষ্টগুলোকে লঘু করে দেখানোর উদ্দেশ্যেই যে এই সমস্ত কথা বলা হচ্ছে তা নয়। তার অদৃষ্টটা বাস্তবিকই করুণার উদ্রেক করে। পরিবারের লোকজন তাকে পীড়া দেবে, এই দুর্ভাবনা ও আশঙ্কা তার মনে না এলেও সে মনে করে যে, সামাজিক জীবনে তার মৃত্যু ঘটেছে। সংসারে সে সত্য সত্যই একাকিনী।

মদনের ছোট্ট সংসারের এই শোচনীয় দুর্ঘটনা গোবিন্দর জীবন-স্রোতকে একেবারে বিপরীত খাতে প্রবাহিত করে। লেখাপড়া শিখলে, সে হয়তো, জমিদারের মুহুরী, গোমস্তা বা নায়েব হ'তে পারতো। কিন্তু গয়ারামের অকালমৃত্যু তার এই সমস্ত আশা একেবারেই বিলুপ্ত করে ফেলেছে। আর তাকে পড়তে দেওয়া যায় না। গয়ারামের হাতে ছিল গোরু ও বলদগুলোর দেখাশোনার

ভার। তার অবর্তমানে এগুলোর দেখাশুনা করবে কে? চাষের কাজের জন্য বদন ও কালোমানিকের প্রয়োজন। বদন যে শ্রেণীর কৃষক সেই শ্রেণীর কৃষক পরিবারের পক্ষে ছোট ছোট মেয়ে ছাড়া বড় মেয়েদের মাঠে বেরিয়ে গোরু চরানো একেবারে অচিন্ত্যনীয়। কাজেই অবিলম্বে প্রস্তাব গৃহীত হয়, গোবিন্দকে আর পাঠশালায় যেতে দেওয়া হবে না। এইভাবে পাঠশালায় মাত্র যোগবিয়োগ অঙ্ক ও নাম সই করার মত বিদ্যালাভের পর, আমাদের গল্প নায়ককে তার শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হয়। গোবিন্দ এবার সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালাভের জন্যই জীবন পথে অগ্রসর হয়।

এখানে প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল যে, গয়ারামের মৃত্যুর পর এই কৃষক পরিবারকে এক মাস অশৌচ পালন করতে হয়। একমাত্র আতুরীকে হবিষ্য করতে হয়। এর পর যথারীতি শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অশৌচ পালন হিন্দুদের শুচি বোধেরই একটা অংশ। এর কল্যাণে হিন্দু চাষীদের পরিধেয় বস্ত্রাদি ধোপ-দুরস্ত না হলেও তারা পরিধেয় বস্ত্র দিনের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একবার জলকাচা করে এবং স্নানের পর কাচা কাপড় পরে। /সারা পৃথিবীতে এরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কৃষক সম্প্রদায় আর দ্বিতীয় কোনো আছে বলে মনে হয় না।

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

## প্রকৃতির পাঠশালায়

আমাদের গল্পের নায়ক রামরূপের পাঠশালা থেকে বিদায় নিয়ে ভর্তি হয় প্রকৃতি দেবীর বিরাট পাঠশালায়। তালপাতা ও কলাপাতায় লিখা তার শেষ হয়েছে; নামতা পড়ার ঐকতানের পরিবর্তে এখন পাখীর সুমিষ্ট তান তার কানে সুধা ঢালে। প্রতিদিন পাঠশালায় সে কি করেছে তার পরিচয় আমরা পেয়েছি, এখন দেখা যাক, আপন বাড়ীর রাখালগিরির দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিটা দিন তার কি ভাবে কাটে।

প্রতিদিন কাক ডাকার আগেই গোবিন্দ ঘুম থেকে ওঠে, বিচালির পালা থেকে বিচালি পেড়ে কাকা কালোমানিকের সঙ্গে বঁটিতে বিচালি কাটে, তারপর গোরু ও বলদগুলোকে গোয়াল ঘর থেকে বের ক'রে এনে তাদের জাব দেয় ঐ সমস্ত বিচালি দিয়ে। অতঃপর সে গোয়াল সাফ করে। কিছু সময় পর কালোমানিক দুগ্ধ দোহন করে, বালক গোবিন্দর দ্বারা তা সম্ভব নয় বলে। দুধ দোহন শেষ হ'লে পর, গোবিন্দ যায় এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে উঠানোর আধ সের দুধ নিয়ে। তারপর বাড়ী ফিরে সে মাঠে যাওয়ার উদ্যোগ আয়োজন করে। মাটির ভাঁড়ে একটু মাখা তামাকও সে সঙ্গে নেয়। বয়স মাত্র বার বছর হ'লেও ইতিমধ্যেই পল্লীজীবনের এই শ্রেষ্ঠ মৌতাতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে। বাঁশের চোঙ্গে একটু সরষের তৈলও সে ঢেলে নেয় স্নান করবার জন্যে আর নেয় গামছায় বেঁধে কিছুটা মুড়ি। উদ্যোগ পর্ব শেষ হওয়ার পর গোবিন্দচন্দ্র গোরুগুলোকে বন্ধন মুক্ত

করে নিয়ে যায় একটা বড় পুকুরের ধারে, সেখানে একটা অশ্বথ গাছের তলায় আরো চার জন বালককে দেখা যায়, এরাও নিশ্চয় এসেছে গোবিন্দের মত গোরু চরাতে। গোবিন্দকে দেখে এক জন ছোকরা চেঁচিয়ে বলে, 'ওরে গোবে, তোর হয়েছে কি? আমরা ভাবলাম, তুই আজ আর আসবি নে।'

গোবিন্দ—'আজ একটু দেরিই হয়েছে। ভটচাষদের বাড়ীতে দেরি হয়ে গেল। ওখানে অনেক সময় দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। গিন্নী চান করতে গিয়েছিল।'

প্রথম বালক—'মুঙ্‌লী এখন কত দুধ দেয়? ভেবেছিলাম ওর দুধ দেওয়া শেষ হয়েছে।'

গোবিন্দ—'শীগ্‌গীর বন্ধ হয়ে যাবে। এখনো কিন্তু সাঁঝের বেলায় ও সকালে এক সের দুধ দেয়।'

দ্বিতীয় বালক—'লক্ষ্মী গোরু মাইরি! গোবে জানিস, তোর বাবা মুঙ্‌লীকে আমার বাবার কাছ থেকে কিনে এনেছে?

গোবিন্দ—'সত্যি? মজার কথাতো, আমি কক্‌খনো শুনি নি। ক'টাকায় আমার বাবা কিনেছিল?'

দ্বিতীয় বালক—'মাত্র দশ টাকায়!'

গোবিন্দ—'খুব সস্তা তো। এত ভাল গাই।'

দ্বিতীয় বালক—'নিশ্চয়ই খুব সস্তা। জমিদারের খাজনা বাকী পড়ায় বাবা গোরুটাকে একরকম বিলিয়ে দিয়েছে।'

তৃতীয় বালক—'আরে দ্যাখ! দ্যাখ! একটা হনুমান একটা চটের থলের মত কি একটা হাতে করে আসছে। ওটা আবার কি?'

গোবিন্দ—'বাড়ীর থলেরে ভাই। পাজীটা, নিশ্চয় কারুর বাড়ীর ছাদ থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছে।'

তৃতীয় বালক—'সম্ভব তাই। আরে দ্যাখ! হনুমানটা গাছে উঠছে। মাথায় কোন কিছু ছুঁড়ে মারবে না তো।'

গোবিন্দ—'যদি মারে, তাহ'লে ওকে ধন্যবাদ দিয়ো। কারণ হনুমান রামের অনুচর ও ভক্ত। তোমার মাথা পবিত্র হবে।'

তৃতীয় বালক—'সাবাস! সাবাস! দু-তিন বছর পাঠশালে গিয়ে গোবে পণ্ডিত হয়ে পড়েছে। চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক গোবে।'

গোবিন্দ—'আমি কি করেছি যে অমন করে ঠাট্টা করছো? তোমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখি তা ত আমি বলছি না।'

চতুর্থ বালক—'ঐ দ্যাখ্! আরেকটা হনুমান বাচ্চাকে বুকে নিয়ে আসছে।

দ্বিতীয় বালক—গোবে! দ্যাখ, তোর মুঙ্লী পদ্মপালের আখের ক্ষেতে ঢুকেছে। যদি দ্যাখে গাল দিয়ে ভূত ছাড়াবে।'

গোবিন্দ—( আখের ক্ষেতে ঢুকতে উদ্যত মুঙ্লীর দিকে মুখ ফিরিয়ে জোরে হাঁক দিয়ে "হেই! হেই! হেই! মুঙ্লী! শালা গোরু ওদিকে যাস্নে।"

দ্বিতীয় বালক—"মুঙ্লী তোর কথায় থোড়াই কেয়ার করে; দিব্বি ঢুকে পড়েছে।'

গোবিন্দ আখের ক্ষেতের দিকে দৌড়ে যায় এবং পদ্মপালের কিছু গাল খেয়ে গোরুটাকে ফিরিয়ে আনে।

বালক পাঁচটি অতঃপর গাছে চড়া হনুমানটাকে উত্যক্ত করে। হনুমানটা গোদা; আকারেও যেমন বড় তেমনি ভয়ঙ্কর। কিছুক্ষণ এ-ডাল ও-ডাল করে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ও খক্র্ খক্র্ শব্দ করে শেষ পর্যন্ত গোদা বীর রণে ভঙ্গ দেয়। গাছ থেকে নেমে সে দূরবর্তী একটা গাছের দিকে চম্পট দেয়। মাদী হনুমানটাও বাচ্চা নিয়ে তাকে অনুসরণ করে।

হনুমান বিতাড়ন পর্ব শেষ ক'রে বালকেরা আপন আপন গামছ থেকে মুড়ি বের ক'রে তার সদ্ব্যবহার করে। মুড়ি খাওয়ার পর

সকলে ঝোপে ঝাড়ে বিচরণ ক'রে বৈঁচি, করমচা, ইত্যাদি ফল সংগ্রহ ক'রে খায়। তারপর গোরুগুলোকে একজোট ক'রে তারা কেঁড়ে থেকে তেল ঢেলে তা গায়ে মেখে পুকুরে স্নান করে, সাঁতার কাটে, স্নান শেষে গামছা পরে কাপড় শুকিয়ে নেয়। গোবিন্দ এইবার প্রস্তাব করে যে, 'গল্প-বলিয়ে' বুড়ীর ছেলে শম্ভুকে নিয়ে সে বাড়ীতে ভাত খেতে যাবে, ফিরে আসতে তার একটু দেরিও হবে, কারণ গাঁয়ের পুব মাঠে তাকে বাবা ও কাকার জন্যে ভাত নিয়ে যেতে হ'বে; তবে সে ফিরে আসার অনেক আগে শম্ভু এসে তাদের তিন-জনকে ছুটি দেবে। গোবিন্দ বাড়ীতে ভাত খেয়ে ও মাঠে বাপ্-কাকাকে ভাত জল দিয়ে যখন গাছতলায় ফিরে আসে, তখন সে দেখে যে শম্ভু একলাটি বসে আছে। ক্রমে আর তিন জনেও এসে পড়ে। পাঁচ জনে মিলে কিছু সময় ছোটাছুটি এবং খেলাও করে। প্রত্যেকে আপন আপন ঝুড়িতে কিছু গোবরও সংগ্রহ করে। এই উপঢৌকন সহ বাড়ীতে না গেলে নিশ্চয়ই বকুনি শুন্‌তে হবে।

সূর্য ক্রমে অস্ত যায়, দূরবর্তী তালগাছের মাথায় যদিও তার বিদায় বেলার লাল আলো ঝক্‌মক্ করে। গোধূলির সময়। প্রত্যেক রাখাল বালক মাথায় গোবরের ঝুড়ি, হাতে বাঁশের পাঁচন নিয়ে জোরে হাঁক দিতে দিতে আপন আপন পালের পেছনে চলেছে। গোরুর খুর থেকে উত্থিত ধূলায় চারিদিক পরিপূর্ণ। গোরুর পাল সময় সময় রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ করে; কলসী কাঁকে মেয়েদের তখন রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তা দিতে হয়। গোবিন্দ এইভাবে গোরুর পাল বাড়ীতে নিয়ে যায় ও গোয়ালে আবদ্ধ করে। তারপর সাঁজাল দেওয়া ও দুধ দোয়ার পালা, সর্বশেষে গোয়াল বন্ধ করা হয়। গোবিন্দের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা এমনি ভাবেই চলে।

বালক গোবিন্দের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার পরিচয় দেওয়ার পর এখন তার বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক; কারণ, মানুষের জীবনে বন্ধুবান্ধবদের প্রভাব যে অত্যন্ত বেশি। গোবিন্দ জাতিতে

উগ্র ক্ষত্রিয়। বিভিন্ন জাতের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদানের পথ রুদ্ধ এবং বিভিন্ন জাতের মধ্যে রেষারেষির ভাব থাকা সত্ত্বেও বালক গোবিন্দের মধ্যে অন্য জাতের বালকদের সঙ্গে বন্ধু পাতাতে বেগ পেতে হয় নি মোটেই। মোটের উপর, তার বন্ধুরা ছিল সকলেই অন্য জাতীয়। বাংলার চাষীজাতীয়দের বন্ধুত্ব ধর্মভাবপূর্ণ ও স্বার্থের লেশহীনও বটে। এক চাষী বালক যখন আরেক চাষী বালক বা কারিগরশ্রেণীর বালকের সঙ্গে চিরন্তনী বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে, তখন তা কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। উভয়ের মাতাপিতা ও আত্মীয় স্বজনও তা জানতে পারে এবং উপহার দ্রব্যের বিনিময়ে বন্ধুত্বের ভিত্তিও পাকা করা হয়। তখন আর কেউ কারুর নাম ধরে ডাকে না, 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করে। এই বন্ধু সম্পর্ক আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত: সাঙাত, বন্ধু ও মিতা। তিন রকমের বন্ধুত্বের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, তবে সাধারণত নামে নামে মিলে গেলে মিতালি পাতানো হয়। গোবিন্দ ছিল অমায়িক ও মিশুক ধরনের মানুষ; সেই জন্য অতি অল্প বয়সেই তিন-জন সমবয়সীর সঙ্গে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। পরবর্তী জীবনে হামেশাই এদের সঙ্গে গোবিন্দকে কাজ কারবারে ব্রতী হ'তে হয়েছে বলে, এদের কিছুটা পরিচয় দেওয়ারও প্রয়োজন।

গোবিন্দর সাঙাতের নাম নন্দ। সে কুবের কর্মকারের ছেলে। কুবেরের মত কঠোর পরিশ্রমী মানুষ কাঞ্চনপুরে আর এক জনকেও দেখতে পাওয়া যায় না। ছেলে নন্দ কামারশালায় তাকে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করে। পিতার মতই সে পরিশ্রমী ও কৌশলী। সকলেই বলে ভবিষ্যতে সে জেলার শ্রেষ্ঠ কারিগরে পরিণত হ'বে। ছেলেটির বয়স বছর ষোল। মাঠের ও গোয়ালের কাজকর্ম ক'রে গোবিন্দ প্রতিদিন সন্ধ্যায় কামারশালায় সাঙাতের সঙ্গে দেখা করতে আসে।

সাগর মিস্ত্রী নামক সূত্রধরের তনয় কপিল, গোবিন্দের বন্ধু।

সাগর নানাপ্রকার কাঠের কাজ ছাড়া চমৎকার মাটির ঠাকুর গড়তে পারতো। এই সমস্ত কাজ ছাড়া চিড়া তৈরি করা এই সূত্রধর পরিবারের ছিল অন্যতম পেশা। পিতার অনেক গুণ কপিলেও বর্তেছিল। সে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়া তৈরি করা, দুর্গা প্রতিমায় রং দেওয়া ও চিড়া কুটায় বাপের মতই সিদ্ধহস্ত ছিল।

গোবিন্দর মিতার নাম মদন। সে গ্রাম্য মুদী কাশী দত্তের ছেলে। মদন দোকানের কেনাবেচায় আদায়-পত্রে পিতাকে যথেষ্ট সাহায্য করতো। মদনের কোষ্ঠীর নাম গোবিন্দ ব'লেই গোবিন্দের সঙ্গে মিতালি পাতানো সম্ভব হয়েছিল।

এই হচ্ছে আমাদের গল্পনায়কের তিন বন্ধু—তার সাঙাত, তার বন্ধু ও তার মিতার মোটামুটি পরিচয়। এই তিন জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আরো তিন জন সাধারণ বা আটপৌরে ধরনের বন্ধুও তার ছিল। প্রকৃতপক্ষে এদের "বন্ধু" আখ্যা দেওয়া যায় না; তবে এরাও ছিল তার প্রিয় সঙ্গী ও সহচর। এদের মধ্যে এক জন বদনের পারিবারিক নাপিত গঙ্গার পুত্র চতুর। ক্ষৌরকার্যের ব্যবসা এখন পর্যন্ত তেমন আয়ত্তের মধ্যে আন্‌তে না পারলেও অস্ত্রচিকিৎসায় সে ইতিমধ্যেই পিতার চেয়েও বেশি হাত দেখাতে আরম্ভ করেছে। চতুরও সে মোটামুটি ছিল, যদিও লেখাপড়া জানতো না মোটেই।

অনেক মোদক বা মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারকের ছেলে রসময় গোবিন্দর আর একজন সহচর। কাঞ্চনপুর খাজার জন্য বিখ্যাত। রসময়ের পিতা শ্রেষ্ঠ খাজা প্রস্তুতকারক। গরীব চাষীদের ভাগ্যে মিঠাই বলতে গুড় বা গুড়ের পাটালি ছাড়া বড় একটা কিছু জুটতো না। কিন্তু ছেলে গোবিন্দর সহচর রসময়ের কল্যাণে বদনের গৃহে খাজা ও অন্যান্য ভাল ভাল মিষ্টি প্রায়ই এসে পড়তো।

গোবিন্দর শেষ সাথীর নাম বোকারাম। অনঙ্গ যে তাঁতীর কাছ থেকে গোবিন্দর কাপড় তৈরি করিয়েছিল, এ হচ্ছে তার ছেলে। ছেলেটির যেমন নাম, বুদ্ধি আক্কেলও তার তেমনি ধরনের। অতি

আত্মার সারল্য ও পাপহীনতার জন্যই গোবিন্দ তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।

মোটের উপর গোবিন্দ যে ভাবে তার সঙ্গী ও সাথী নির্বাচন করেছিল, তাতে তাকে ধন্যবাদই জানাতে হয়। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এক একজন ছিল এক একটা গুণের মালিক :—নন্দর সুনাম দৈহিক শ্রমশীলতা ও কর্মবত্তার জন্য, কপিলের সৌন্দর্যজ্ঞান ও কলা-নৈপুণ্য ছিল অপরিসীম, মদনের বিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ, চতুর ছিল চতুরতার জন্য বিখ্যাত, রসময়ের মধ্যে ছিল স্ফূর্তির ভাব আর বোকারামের একমাত্র সম্বল—সারল্য।

## চতুর্দশ অধ্যায়

### সাংঘাতিক কাণ্ড

একদিন গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে কাঞ্চনপুরবাসীর মধ্যে ভীষণ হৈ চৈ পড়ে যায়। ব্যাপারটা পদ্মলোচন পালের ছয় বছরের দ্বিতীয় কন্যাকে নিয়ে। পাল মশায়ের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি, গোবিন্দের গোচারণ প্রসঙ্গে। এইদিন সকাল পাঁচ-ছয় দণ্ডের সময় মেয়েটি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে খেলা করার জন্যে। সকালে যেসব ছেলেমেয়ে খেলতে বেরোয় তারা প্রায়ই বেলা ন'টার সময় মুড়ি-মুড়কি বা ভাত খাওয়ার জন্যে বাড়ীতে ফিরে আসে। সময়মত মেয়েকে ফিরতে না দেখে মা বেশ একটু অস্থির হ'য়ে পড়ে। বড় মেয়েকে সে জিজ্ঞাসা করে—'যাদুমণি ( মেয়েটির নাম ) কোথায় রে? আজ তো সে খাবার খেতে এল না?' উত্তরে মেয়েটি বলে যে, ঘণ্টা দুয়েক আগে সে বোনকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে, নিশ্চয়ই সে রাস্তায় মেয়েদের সঙ্গে খেলছে। মা সদর দরজা পর্যন্ত গিয়ে জোরে ডাক দেয়—'যাদুমণি! ওলো যাদু! খাবার খেয়ে যা।' কিন্তু কোনই জবাব নেই। পথচারীদের জিজ্ঞাসা করেও মা মেয়ের কোন সন্ধান পায় না। চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট পদ্ম পাল স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বলে—'যাদুমণির জন্যে এত ব্যস্ত কেন? কামারদের দোকানে, না হয় বামুনদের বাড়ীতে আছে—এক্ষুণি এসে পড়বে। বাড়ীর ভেতর যাও।' স্বামীর কথা মেনে নিলেও, অমঙ্গলের আশঙ্কা তার মনটা ছেয়ে ফেলে। মনমরা হয়ে সে বাড়ীর ভেতর গিয়ে রান্নাঘরের কাজে মনোনিবেশ করে বটে,

কিন্তু রান্নায় তার মন বসে না মোটেই। দেহটা তার রান্নাঘরে থাক্‌লেও মনটা তার ফিরে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায় হারানো মেয়ের অন্বেষণে।

দ্বিপ্রহরের খাওয়ার সময়ও অতীত হয়ে যায়। উদ্বিগ্না জননী রান্নাঘর ছেড়ে, না হ'লেও দশ-বার বার বাড়ীর বের হয়ে যাকে দেখে তাকেই মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করে, তবুও হারানো মেয়ের কোন উদ্দেশই নেই। তখন পদ্মলোচনের মনেও আশঙ্কা উপস্থিত হয়। তার স্ত্রীর দশা যে তখন কি তা সহজেই অনুমেয়। আর স্থির থাকতে না পেরে সে ডুকরে কেঁদে ওঠে—'ও আমার যাদুমণি, সোনার যাদু! খেতে আসছিস না কেন রে? কোথায় গেলি রে?'

পাড়ার ছেলে বুড়ো পুরুষ-নারী সকলেই পদ্ম পালের বাড়ীতে ছুটে আসে। পদ্ম পালের দ্বিতীয়া কন্যার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ দাবানলের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দুপুরে খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে সকলেই বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশ বালিকার সন্ধানে। গাঁয়ের প্রতিটি ঝোপ-ঝাড়, প্রতিটি পুকুরের ঘাট তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়। পদ্ম পালের বাড়ীর নিকটবর্তী দু-তিনটে পুকুরে জাল পর্যন্ত ফেলা হয়। অনেক মাছও ওঠে কিন্তু যাদুমণির লাশ পাওয়া যায় না। পল্লীবাসী সকলেই শোকে মুহ্যমান। অনেকের সেইদিন দুপুরে খাওয়া পর্যন্ত হয় না। দলে দলে লোক চারিদিকে বেরিয়ে পড়ে। মৎস্যভুক বঙ্গ-পল্লীতে জেলের অভাব নেই। বড় বড় জাল নিয়ে তারা বড় বড় পুকুর ছেঁকতে আরম্ভ করে। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যায়। সকলেরই মুখে হাহাকার ধ্বনি। হতভাগিনী জননীর রোদন-ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত হয়। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে সে যন্ত্রণায় ছট ফট করে, ভীষণা কালীদেবীর সামনে আনাড়ীর হাতে অর্ধ-বলি দেওয়া পাঁঠার মত। সু-উচ্চ তেঁতুল-বৃক্ষ শ্রেণীর অন্তরালে ক্রমে সূর্য অস্তাচলে চলে যায়, তবুও হরিমালা মেয়ের কোন খোঁজ নেই। সারা গ্রাম আতঙ্কে দিশেহারা, খুন কিন্তু একদিন প্রকাশ হ'বেই যেহেতু ও বস্তুটা কোনদিনই চেপে রাখা যায় না।

আমাদের উপন্যাস-নায়ক গোবিন্দ দাসও সেদিন সব সময়েই গ্রামের প্রান্তবর্তী পতিত জমিতে গোচারণ-রত। মাত্র খাবার সময় বাড়ীতে আসে খাওয়ার জন্যে। সেই সময়েই পদ্ম পাল, ওরফে পোদো পালের ( স-বান্ধব গোবিন্দ ওকে ঐ নামেই ডাকতো ) দ্বিতীয় কন্যার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ তার কানে পৌঁছে। গোবিন্দ যেখানে গোচারণ-রত তার পাশেই তার বাবা ও কাকা জমিতে হাল-চালনা করছিল। সূর্যাস্তে গোবিন্দ গোরুর পাল নিয়ে বাড়ী ফিরবার তোড়জোড় করে। গোরুগুলো লাইনবন্দী হয়ে কৃষ্ণসাগরে উঁচুপাড়ের উপর উঠে জল খাওয়ার জন্যে জলের কিনারার দিকে এগিয়ে যায়। একটা গোরু জলের কিনারা পর্যন্ত গিয়ে জলে মুখ বাড়াতে গিয়ে আঁৎকে উঠে পেছনে দৌড় দেয়। আর একটা গোরুও ঠিক এমনি করে। গোরু ছুটোর ভাব দেখে গোবিন্দ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে, কিনারা থেকে গজ কয়েক দূরে শৈবালে জড়ানো একটি মৃতদেহ ভাসমান। পেছনে আগত বাবা ও কাকাকে সে চেঁচিয়ে খবর দেয়। তারা এসে, মৃত-দেহের সাইজ, মাথার একগোছা চুল দেখে, ওটা যে যাদুমণির মৃতদেহ তা বেশ বুঝতে পারে। খবরটা গাঁয়ের মধ্যে রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা গাঁ ঐ পুকুরের পাড়ে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু কি করে লাশ ওপরে তোলা যায়। কৃষ্ণসাগরকে সকলেই দেখে ভয়ের চোখে। স্নানের ঘাটগুলো ছাড়া, ঐ পুকুরের অন্য কোন স্থানে কেউ কখনো পা মাড়াতে সাহস করে না। পুকুরের পাড়ে সমবেত সাত শত লোকের মধ্যে এক জনেরও এমন ধারা বুকের পাটা নেই যে দুঃসাহসিক কাজে অগ্রসর হয়। অবশেষে গাঁয়ের সেরা দুঃসাহসী কালোমানিক জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও সাঁতার দিয়ে লাশটিকে টেনে এনে পুকুরের পাড়ে তোলে। আতঙ্কে সকলেই শিউরে ওঠে। দেহটা যে যাদুমণির তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে তা প্রাণহীন, বিবস্ত্র ও রৌপ্য-অলঙ্কার-সমূহ বর্জিত। গায়ের অলঙ্কারগুলো চুরি করার উদ্দেশ্যে কেউ, কারা এই অসহায়া বালিকাকে খুন করেছে।

এখন প্রশ্ন উপস্থিত হয়, কে বা কারা খুন করেছে, তা নির্ণয় করা নিয়ে নয়। অন্য কোন দেশে হয়তো, কেন, নিশ্চয়ই, এই প্রশ্নটার মীমাংসা করতে চেষ্টা করা হোত সকলের আগে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে, লাশটা সেই রাতেই পোড়ান হবে কিনা তাই নিয়ে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লাশ পোড়ানোই হিন্দুদের দস্তুর। আত্মা নিশ্চয়ই দেহ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই তা পুড়িয়ে ফেলা দরকার। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে পুলিসের মঞ্জুরি ছাড়া লাশ পোড়ান অসম্ভব তখন সকলের পল্লী-জমিদারের শরণাপন্ন গোঁড়া হিন্দু জমিদার মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হুকুম দেয়। কিন্তু পাছে কোন বিপদ ঘটে এই আশঙ্কায় গাঁয়ের ফাঁড়িদারকে কিছু বকশিশ দিয়ে, মন্তেশ্বর থানায় কোন কিছু না জানাতে হুঁশিয়ার করে দিল। মৃতদেহ তখন কৃষ্ণ সাগর থেকে আর একটি পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে সচরাচর গাঁয়ের সমস্ত মৃতদেহ পোড়ান হয়। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন করা হয়।

অতঃপর গাঁয়ে সোরগোল পড়ে যায়, খুনী কে তা আবিষ্কারের জন্যে। বৃদ্ধা এগিয়ে এসে বলে, আগের দিন সে বেজা বাগদী ও তার বোনকে বেলা এগারটার সময় যাদুমণিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে দেখেছে। আর যায় কোথায়! ডজন দুয়েক লোক ছুটে গিয়ে বেজা বাগদী আর তার বোনকে পিট্‌তে পিট্‌তে জমিদারের কাছারিতে নিয়ে আসে। একবারের জন্য জমিদার আসামীর বুকে বাঁশ দিয়ে ডলতে হুকুম দেয়। বংশ-পীড়নে অস্থির হয়ে বেজা বাগদী স্বীকারোক্তি করে— সে আর তার বোন কয়েকটি আম দিয়ে যাদুমণিকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে ওর গায়ের অলঙ্কারগুলোর লোভে। এই স্বীকারোক্তির পর যে পাইকারী মারপিট আরম্ভ হয় তা বর্ণনা করার মত ভাষা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অপরাধী ও অপরাধিনী কোনরকমে প্রাণে বেঁচে থাকে এই পর্যন্ত। অতঃপর উভয়কে মার-পিটের ভেতর দিয়ে গাঁ থেকে বিতাড়িত করা হয়, আর যেন ফিরে না আসে

কোনদিন—এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করে। বলাবাহুল্য, সে প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করেছে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত। ঘুষখোর পল্লী কনস্টেবলের কল্যাণে ঊর্ধ্বতন পুলিস কর্তৃপক্ষের নিকটেও এই হত্যারহস্য চিরদিন গুপ্ত রহস্যই থেকে যায়।

# পঞ্চদশ অধ্যায়

## পল্লী বাজার

হাট, সাপ্তাহিক অথবা অর্ধ-সাপ্তাহিক, যে ধরনেরই হোক না কেন, বাংলার পল্লীজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। যে-সমস্ত ছোট ছোট পল্লীতে দোকানপত্র নেই, সেই-সমস্ত গাঁয়ের অধিবাসীরা সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লাভ করে থাকে এই সমস্ত হাটের মারফতে। তা-ছাড়া বিভিন্ন পল্লীর অধিবাসীদের সামাজিক লেনদেন ও হৃদ্যতাও প্রসারিত হ'য়ে থাকে এই সমস্ত হাটেরই কল্যাণে। কাঞ্চনপুর গ্রামের হাট বসে প্রতি মঙ্গল ও শনিবারে গাঁয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এক বিরাট ফাঁকা জায়গায়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের বাছা বাছা হাটগুলোর মত না হ'লেও এই হাটটাকে মাঝারি রকমের বড় হাট বলা চলে। প্রত্যেক হাটবারে এখানে দু'শ' তিন শ' লোক সমবেত হয়ে থাকে। হাটে কোন চালা ঘর নেই, কাজেই ঝড় বৃষ্টি হ'লে হাট ভেঙে যাওয়া অনিবার্য। মাত্র কয়েকটা গাছ, বিশেষতঃ ইতিপূর্বে বর্ণিত প্রকাণ্ড বট গাছটার যা একটু আশ্রয় লাভ হ'তে পারে। হাটবারে প্রত্যেক বাড়ী থেকে অন্ততঃপক্ষে এক জন লোক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনবার জন্য এখানে শুভাগমন করতে বাধ্য হয়। কালোমানিক ও গোবিন্দ উভয়েই হাটের নিয়মিত যাত্রী কিন্তু একের উদ্দেশ্যের সাথে অপরের উদ্দেশ্যের মিল নাইকো মোটেই। কালোমানিক আসে উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্যের বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। তাছাড়া সে পার্শ্ববর্তী গাঁগুলো থেকে অপেক্ষাকৃত সস্তায় শস্য কিনে এনে এই হাটে বেশি দরে বিক্রয় করেও

থাকে। গোবিন্দ আসে কতকগুলো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সস্তা দরে কিনবার জন্যে। হাটবার দু'টোর নামেরও বিশেষত্ব আছে। মঙ্গলবারের হাটকে বলা হয় তিনের হাট, আর শনিবারের হাটটিকে বলা হয় দু'য়ের হাট। মধ্যে গোটা তিন দিন এবং গোটা দুই দিন পর হাট বসে বলে এই ধরনের নামকরণের উৎপত্তি হয়েছে। তিনের হাটটি যে একটু জাঁকাল ধরনের তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

এখন তিনের হাট পরিদর্শনের জন্য গোবিন্দর সঙ্গে বেরিয়ে পড়া যাক। গ্রামের শেষ সীমায় উপনীত হওয়ার আগেই মৌমাছির গুঞ্জন ধ্বনির মত আওয়াজ কানের কাছে ভেসে আসতে থাকবে। যতই এগিয়ে আসা যাবে, আওয়াজের প্রখরতা ততই বাড়তে থাকবে। আস্তে আস্তে হাটের কেন্দ্রস্থলে উপনীত হ'লে আর রক্ষা নেই; প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লাগবার উপক্রম হবে। লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে ও প্যারির বুলেভার্দেও এমনি ধারা প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা যায় না। আওয়াজের দিক থেকে বাংলার হাট সকলকেই হার মানিয়েছে।

হাটে পা বাড়াতে না বাড়াতেই চোখে পড়ে হাঁড়ির স্তূপ। ছোট-বড় নানা আকারের নতুন আনকোরা হাঁড়ি। কাঞ্চনপুরে একঘরও কুম্ভকার নেই, কাজেই পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে এই সমস্ত আমদানি করা হয়েছে। বিক্রেতারা সুদীর্ঘ পাঁচটা সারিতে বিভক্ত। অধিকাংশ বিক্রেতাই উন্মুক্ত ভূমিতলে উপবিষ্ট, কয়েকজন অবশ্য বস্তার আসন যোগাড় করেছে। দু'চার জনের অদৃষ্টে টুলও জুটেছে। পণ্যদ্রব্য সব, কতক মাটির উপর, কতক বা রাস্তায় অথবা ঝুড়ি-চুপড়িতে শোভা পাচ্ছে। একটা সারির উপর চোখ ফেললে দেখা যাবে অগণিত শাক-সবজি। বাঙালীর খাদ্য শাকের সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য বললেই চলে। বিষাক্ত ও জঘন্য ধরনের শাকগুলো বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত শাক-পাতাই বাঙালীর পেটে স্থান লাভ করে। সবজিরও আদি-অন্ত নেই। বাঙালীরা পুরাপুরি নিরামিষ-ভোজী বলে এই দুই

বস্তুর সংখ্যা ও প্রকার এত বেশি। জান্তব পদার্থ বলতে এরা দুধ, ঘি আর মাছ খেয়ে থাকে। মোটের উপর, কোন বিদেশী লোক বাংলার হাটে তরি-তরকারি বিক্রয়-স্থলে উপস্থিত হ'লে, হাটের এই অংশটা তাদের চোখে কৃষি-প্রদর্শনী বলেই প্রতিভাত হ'বে।

হাটের দ্বিতীয় সারি মুদী ও মিঠাই-ওয়ালাদের অধিকৃত। রান্নার উপযোগী, পানে খাওয়ার উপযোগী ও আরো নানা প্রকার কাজে ব্যবহৃত প্রায় শ' খানেক মসলা এখানে চোখে পড়বে। তারপর মিঠাই-ওয়ালাদের বসবার জায়গা। এখানে মুড়কি, পাটালি থেকে আরম্ভ করে সব-সে-সেরা গজা পর্যন্ত হরেক রকমের মিঠাই রসনায় জল উদ্রেক করে ছাড়বে। এখানকার প্রধান খদ্দের পল্লী বালকেরা। ট্যাঁকে এক-একটা পয়সা গুঁজে ওরা এখানে হাটবারে ভিড় জমায়। দর হাঁকাহাঁকিই কি কম হয়! সম্বল মাত্র এক পয়সা হ'লেও ওতে অনেকখানি মুড়কি বা ফুটকড়াই, অনেকগুলো কদমা, পাটালি গুড়ও বেশ খানিকটা মিলতে পারে।

তৃতীয় সারিতে কাপড়ের সমারোহে বিক্রেতার ভূমিকায় তাঁতীরা সমাসীন। কাপড় সাধারণতঃ মোটা ধরনের, কাজেই পুরা-পুরি চাষী ও মজুরদের উপযোগী। চতুর্থ সারিতে ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি দেশীয় লৌহজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী--লাঙ্গলের ফাল থেকে আরম্ভ করে কাস্তে, নিড়ানি, কুড়ুল, বঁটি, কাটারি, ছুরি, ইত্যাদি পাড়াগাঁয়ে চাষী, ছুতার, রাজমিস্ত্রী, প্রভৃতি সকলেরই হাল-হাতিয়ার এখানে চোখে পড়ে। পঞ্চম সারিতে দেশীয় মুচিদের তৈরি স্লিপার বা চটী বিক্রয়ের জন্য মজুত। এই সারিতে নানা রকমের খেলনাও বিক্রয় হয়। এই সমস্ত সারি থেকে একটু দূরে বড় বটগাছতলার একদিকে ধান ও চাল বিক্রেতাদের ভিড়, আর একদিকে জেলেদের আস্তানা বা মেছো হাট। এখানে চুনোপুঁটি থেকে আরম্ভ করে বড় বড় বোয়াল ও রুই মাছ পর্যন্ত নানান ধরনের মাছ ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

হাটে কেনা-বেচার মরসুমের মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়বে মাথায়

লাল পাগড়ি, হাতে প্রকাণ্ড ঝুড়ি, এক পশ্চিমা মহুরীর মত চেহারার একজন লোকের পিছু পিছু অগ্রসর। লোকটি জমিদারের চাকর; হাটের প্রত্যেক দোকানদারের কাছ থেকে তোলা নেবার জন্য উপস্থিত হয়েছে। হাটখোলার মালিক পল্লীর জমিদার। এই জায়গার জন্য কেহই জমিদারকে খাজনা দেয় না। কাজেই প্রতি হাটবারের তোলা তুলে জমিদার ক্ষতিপূরণ আদায় করে থাকেন। তোলা সাধারণতঃ আদায় করা হয় দ্রব্যের মাধ্যমে; তবে কাপড় ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যের জন্য কয়েকটা পয়সা দিলেই চলে। মোটের উপর, হাটখোলাটি কারুর কাছে বন্দোবস্ত করলে যে পয়সা পাওয়া যেত, হাটের কল্যাণে জমিদার মহাশয় তার তুলনায় শতগুণ লাভ করে থাকেন। জমিদারের টাকা ছাড়া মুসলমানী চেহারার একজন লোককে বেটন হাতে হাটের মধ্যে ঘোরাফিরা করতে দেখা যায়। এরও পেছনে ঝুড়ি মাথায় এক কুলি। লোকটি হচ্ছে গাঁয়ের ফাঁড়িদার ( কনস্টেবল )। এ লোকটাও তোলা তুলতে এসেছে; জমিদারকে দেয় তোলার চেয়ে অনেক কম হোলেও সমস্ত দোকানদারই অর্ঘ্য যোগায় ভয়ে-ভক্তিতে। আধ ডজন খানেক ছোকরাকেও হাটের দোকানগুলোর পাশে ঘুরতে দেখা যায়। এরা এসেছে ব্রাহ্মণ গুরু মহাশয়ের তোলা আদায়ের জন্য। গুরু মশায়ের পাওনা অবশ্য ফাঁড়িদারের তুলনায় অনেক কম। এ-ছাড়া আরো এক জন চতুর্থ তোলাওয়ালাকে ঝুড়ি হাতে দোকানে দোকানে শুভাগমন করতে দেখা যাবে। ইনি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। গ্রামের বারোয়ারি পূজোর জন্য এঁর মাথা ব্যথা। প্রতি বৎসর বিশেষ ধুমধামের সঙ্গে কাঞ্চনপুরে বারোয়ারি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর খরচ-খরচার জন্য প্রত্যেক দোকানদারই প্রতি হাটবারে কিছু কিছু দিয়ে থাকে।

হাট বসেছে বেলা একটার সময়। এখন চারটে বাজে, কেনা-বেচাও উপনীত হয়েছে সর্বোচ্চ সীমায়। ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করায় কান বধির হওয়ার উপক্রম। নরক

কাণ্ড আর কি! এরি ভেতরে হাটখোলায় পূর্বোক্ত বটগাছতলার ছায়ায় একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক হাজির। তার পাশে বাবু-চেহারার একজন লোক ও একজন কুলি, তার বগলে একটা ব্যাগ। সাহেবকে দেখেই দর কষাকষি ভুলে গিয়ে বহুলোক তার সম্মুখে হাজির। বাবুটি অমনি একখানা বই খুলে পড়তে শুরু করেন। গোবিন্দ এবং আরো অনেকে মন দিয়ে শুনে। কাহিনীটি ঈশ্বর, পাপ ও মুক্তি এবং মানব জাতির পরিত্রাতা সম্বন্ধে। গোবিন্দ কিন্তু খ্রীষ্টের নাম সুস্পষ্টভাবেই শুনতে পায়। ব্যাপারটি হচ্ছে এই, চার্চ মিশনারী সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট রেভারেণ্ড ফ্রিডরিখ ক্লীন্ নেখ্ট নামে এক জার্মান পাদ্রী বর্ধমান জেলায় ধর্ম প্রচার উপলক্ষে সেই দিনই অপরাহ্ণে কাঞ্চনপুরে পৌঁছেছেন। হাটবারের সুযোগ গ্রহণ করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্ট-ধর্মের সু-সমাচার পরিবেশনে মনোনিবেশ করেছেন।

লোকে যেভাবে তাকে সালাম করছে ও প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করছে, তাতে মনে হয়, লোকটি একেবারে অপরিচিত নয়। ক্লিন্ নেখটের আস্তানা বর্ধমান শহরের নিকটবর্তী এক মহল্লায়। কাঞ্চনপুর থেকে এ জায়গায়টার দূরত্ব মাত্র সাত মাইল। কাজেই ইনি প্রায়ই কাঞ্চনপুরে এসে গাঁয়ের মাঝখানে শিবতলায় অথবা হাট-বারে হাটখোলায় ধর্মপ্রচার করে থাকেন। সময়ে সময়ে তিনি গাঁয়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাড়ীতেও হাজির হন। লোকটির বেশভূষা ও আচার-আচরণ অধিকাংশ জার্মানের মত সাদাসিধে ধরনের। মেজাজটা তার এত মোলায়েম যে, নানা রকমের উদ্ভট প্রশ্নেও সে ভুলক্রমেও রাগের ভাব প্রকাশ করে না। গাঁয়ের গরীবদের সে ঔষধপত্রও বিতরণ করে। বাংলা ভাষাতেও সে কথা বলে বাঙালীর মত (ইংরেজদের তুলনায় জার্মানরা বাংলায় ভাল কথা বলতে পারে)—কেবলমাত্র 'ব'টি উচ্চারণ করে 'ম'-এর মত। মোটকথা কাঞ্চনপুরের অধিবাসীদের নিকট লোকটা প্রিয়পাত্র। ছেলেরা তার নিকটস্থ

হয়ে কোটের পেছন দিকটা ধরে প্রায়ই বলে থাকে—'পাদ্রীসাহেব, সালাম।'

এ-হেন মিশনারী মহাশয় কাঞ্চনপুর হাটতলায় প্রকাণ্ড বটগাছ তলায় দাঁড়িয়ে। তাঁর কেটিকিষ্ট মথিলিখিত সু-সমাচারের একাদশ অধ্যায় পড়ে। সকলের নিকট তা ব্যাখ্যা করার পর, জার্মান পাদ্রী সমবেত লোকজনকে সম্বোধন করে বলেন—'শ্রমভারাক্রান্ত সকলেই আমার নিকট এস, আমি তোমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করবো।' মানুষের দুঃখ কষ্ট তিনি এমন সার্থকতার সঙ্গে ও সহানুভূতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সমবেত গরীবদের হৃদয় সত্য সত্যই অভিভূত হয়। 'পাদ্রী সাহেব ঠিক কথাই বলেছেন'—অনেকের মুখে এমন কথাও শোনা যায়। বক্তৃতা শেষে বাংলা ভাষায় অনূদিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রন্থসমূহ বিলি করা আরম্ভ হয়। ইহা সংগ্রহের জন্য দর্শকদের মধ্যে সাংঘাতিক রকমের ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়। আমাদের গোবিন্দচন্দ্র কষ্টে-সৃষ্টে 'সত্য আশ্রয়' নামে এক কপি প্রচার পুস্তক সংগ্রহ করে। বইখানা তাকে প্রায়ই পড়তে শুনা যেত।

সূর্য ইতিপূর্বেই অস্তাচলগামী হওয়ায় হাটও ভেঙে যায়। ক্রেতা বিক্রেতারা তখন যে-যার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয় কাঞ্চনপুর আর পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামে।

## ষোড়শ অধ্যায়

### মেয়েদের পার্লামেণ্ট

পল্লী অঞ্চলে বাঙালী মেয়েরা প্রতিবেশীদের বাড়ীতে গিয়ে বন্ধুত্ব-পূর্ণ আলোচনা করলেও, স্নানের ঘাটের মত আর কোথাও এক সঙ্গে এত নারীর সমাবেশ, এবং গ্রাম্য রাজনীতি সহ নানা বিষয়ে তাদেরকে এত বেশি আলোচনা করতে দেখা যায় না। কাঞ্চনপুরে যে অনেকগুলো পুকুর আছে, তা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত পুকুরের মধ্যে দক্ষিণে হিমসাগর ও উত্তরে রায়দের পুকুর, এই দুটোতেই স্নানার্থীরা বেশি ভিড় করে থাকে। বদনের বাড়ী গাঁয়ের উত্তরাংশে বলে তার বাড়ীর মেয়েরা রায়দের পুকুরেই স্নান করতে আসে। রায়বংশীয় জমিদারদের পুকুর বলে পুকুরটার এই রকম নাম হয়েছে। পুকুরে দুটো বাঁধানো বড় বড় ঘাট, একটায় পুরুষ ও আর একটায় মেয়েরা স্নান করে। ঘাটদুটো এমনি কায়দায় তৈরি, পুরুষের ঘাট থেকে মেয়েদের আর মেয়েদের ঘাট থেকে পুরুষদের আদৌ দেখা যায় না।

বেলা এগারটা। রায়দের পুকুর ঘাটে মেয়েরা একে একে আসতে আরম্ভ করেছে। অধিকাংশ মেয়েই এসেছে কলসী কাঁকে, স্নান-শেষে পানীয় জল নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তারা সারা অঙ্গে তেল মেখেও এসেছে। সব জাতের ও সব শ্রেণীর মেয়েরাই সমবেত। সত্তর বছরের বৃদ্ধা থেকে ষোড়শী যুবতী—সব বয়সের মেয়েদেরই দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে কারুর গায়ের রং যেন দুধে আলতায় গোলা। অনেকের গায়ে বিস্তর সোনার অলঙ্কার দেখে

বুঝতে পারা যায় অভিজাত ঘরের মেয়ে। ঘাটে আসার পর প্রথমে দাঁত মাজা, তারপর গামছা দিয়ে অনেকক্ষণ পা রগ্‌ড়ানো, সর্বশেষে চিবুক পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে সমস্ত শরীর মর্দন। আর ডুবের কি আদি অন্ত আছে! সকলেই যে একসঙ্গে ডুব দেয় তা নয়। কারুর স্নান সারা হয়ে যাওয়ায় তারা চলে যাচ্ছে। কেউ বা সবে মাত্র জলে পা মাড়াচ্ছে। কেউ বা হাঁটু জলে, আবার কেউ বা চিবুক পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে গাত্র মার্জন করছে। বামুনের মেয়েরা আহ্নিকও করছে। স্নানের এই নানামুখী প্রক্রিয়ার মধ্যে জীবন্ত আলোচনাও চলছে। বেলা এগারটা থেকে একটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঘাটে যে কোন সময় নাম্‌লে অন্ততঃপক্ষে বিশটি মেয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

পদদ্বয় ঘর্ষণ-রত জনৈকা নারী, আরেকটি মেয়েকে চ'লে যেতে উদ্যত দেখে বলে,

'বোন, এত শীগ্‌গীর চল্‌লে যে? তোমাকে তো আর রাঁধতে হয় না, এত তাড়াতাড়ি কেন?'

'বোন্ আজ আমাকে রাঁধতে হবে। বড় বউ-এর শরীর ভাল নয়, কাল রাতে অসুখ করেছিল।'

'কিন্তু তোমাকে তো বেশি রাঁধতে হবে না। বাড়ীতে তো কোন ভোজের ব্যাপার নেই?'

'না, না, ভোজ অবশ্যই নেই। দেবগ্রাম থেকে বোন এসেছে ছেলে সঙ্গে ক'রে। জেলে একটা বড় রুই মাছ দিয়ে গিয়েছে। তা রাঁধতে হ'বে।'

'ও, তোমাদের বাড়ীতে মানুষ এসেছে। কি কি রাঁধবে?'

'মাস কলাইয়ের ডাল, একটা তরকারি, বড়ি ভাজা, ঝালের মাছ, মাছের টক আর আমড়া পোস্ত—এই রাঁধবো মনে করছি। আমার বোন পো আমড়া-পোস্ত ভালবাসে।'

'ঐ বড়ি আর পোস্ত। বেনে তোমরা এই দুটো জিনিস বড্ড ভালোবাসো। বামুন আমরা এ দুটোর একটাও পছন্দ করিনে।'

'তোমরা বামুন বড়ি রাঁধতে জান না বলেই ও-কথা বল্‌ছো। যদি একবার আমাদের বড়ি খাও সাত মাসে ভুলতে পারবে না। প্রত্যেক দিনই খেতে ইচ্ছে হবে।'

'যে ভাবে বড়ির প্রশংসা করছো, শুনে জিভেয় জল আসছে। বামুন না হলে একদিন চেখে দেখতাম।'

'তাতে কি? হলেই বা বামুন; একবার বড়ি চেখে দেখ না! বড়িতে আর তোমার জাত মারা যাবে না।'

এই ব'লে কলসী কাঁকে বেনের নারী চলে যায়।

জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা আরেক নারী ধাপের উপর বসা অপর এক নারীকে বলে, 'ঐ অলঙ্কারটা কবে পেলে সই?'

'কোনটার কথা বললে সই? এই ঝুমকো? মাত্র ছুদিন হ'লো পেয়েছি। নিধি স্যাকরা গড়েছে। পছন্দ হচ্ছে?'

'ও, খুব ভাল তৈরি করেছে। তোমার অলঙ্কারের অন্ত নেই। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তোমার জহরতে ভরা। তোমার জোর বরাত, এমন স্বামী পেয়েছো, যে শুধু তোমাকে খুশি করাই জীবনের একমাত্র কাজ বলে মনে করে।'

'আশা করি, সই, তুমিও ভাল স্বামী পেয়েছো। সবাই বলে সে তোমাকে বড় ভালবাসে।'

'আমার স্বামী আমাকে বড্ড ভালবাসে? হায়, বিধাতা! আমার দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে।'

'কেন? কি এমন কষ্ট পাচ্ছ? খাওয়া পরা বা জীবনের প্রয়োজনীয় কোন জিনিসেরই অভাব নেই। আর সে যে তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসে তা-ও শুনতে পাই।'

'সে কাপড় চোপড় দেয় সত্যি, কিন্তু তোমার কাপড় চোপড় যেমন সুন্দর তার অর্ধেকও নয়। খাওয়ারও সে দেয় কিন্তু কুকুরেও তো খায়। এখন ভালবাসার কথা বলছো, ও শুক্‌নো ভালবাসায় লাভ কি? কি আর বলবো? এই সমস্ত দুঃখ আমার কপালে

লেখা আছে। মরণ ছাড়া পরিত্রাণ নেই। মরলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম।'

'ও সই, সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত অসুখী কেন? অলঙ্কার তো স্বামীর ভালবাসার চিহ্ন নয়। স্বামী স্ত্রীর গা অলঙ্কারে ভর্তি করে দিলেও, ভাল না-ও বাসতে পারে। শুনেছি, কলকাতায় অনেক বড়-লোক এই ধরনের মানুষ। তাদের বৌয়ের গায়ে এমন জায়গা নেই যেখানে গয়না শোভা পায় না; এমন সব জহরতের অলঙ্কার তারা পরে যা কোনদিন কানেও শুনি নি, কিন্তু তাহলে হবে কি? ঐসব বাবু কালে-ভদ্রে বাড়ীতে রাত কাটায়। তারা ঘুম পাড়ে মেছোবাজারে। কিন্তু তোমার স্বামী খুব ভালমানুষ; সাঁঝবাতির পর আর বাড়ীর বের হয় না, স্বভাবও খুব নম্র; সে কখনও তোমার গায়ে হাত তোলে না বা তিরস্কারও করে না। আর কি চাও? সত্যি বটে, সে তোমাকে তত বেশি অলঙ্কার দেয় নি। কিন্তু তোমাকে না দেওয়া কি তার ইচ্ছে? পারলে নিশ্চয়ই তোমার ঘর অলঙ্কারে ভর্তি করে ফেলতো কিন্তু মা লক্ষ্মী তার দিকে মুখ তুলে চায় নি। অনুতাপ করো না সই; এমন যে প্রিয় প্রাণেশ্বর লাভ করেছ, সেজন্য তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

'ও বগলা! তুই দেখছি, আমার স্বামীর পীরিতে পড়েছিস! প্রজাপতি যদি তোর স্বামী আমাকে আর আমারটা তোকে দিতেন!'

'ও সই! কিযে সব বলিস্? এরকম কথা মুখে আন্‌তে নেই। অদৃষ্টে যে স্বামী জুটেছে, তাই নিয়েই সুখে থাক। এরকম ক্ষেত্রে অসন্তুষ্ট হওয়া মহাপাপ।'

'মস্ত বড় পণ্ডিত হয়েছিস্, বগলা! লেখাপড়া জানিস বলে ওরকম বকছিস। ক্ষমা কর সই যদি তোর মনে আঘাত দিয়ে থাকি। আর পাঁচটি মেয়ের মত মুখ্যু সুখ্যু মেয়েমানুষ বইতো নই।'

'আমি পণ্ডিত নই সই! সত্য বটে স্বামী আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। কিন্তু অনেক বিষয়ে আমি তোমারই মত অজ্ঞ, মাত্র দু-চার খানা বই পড়েছি, তা থেকে জান্‌তেও পেরেছি যে, দাম্পত্য

জীবনের সুখ অলঙ্কারের প্রাচুর্যে নয়, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলনেই তা নির্ভর করে।'

'ঠিক বলেছিস ভাই, বগলা! এই মাত্র আমাকে যে সব কথা বললি তাই দিয়ে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করবো।'

এই সময় বদনের স্ত্রী সুন্দরী মাটির কলসী কাঁকে নিয়ে ঘাটে আসে। তখন উচ্চ জাত ও বড় ঘরের মেয়েরা সব স্নান করছিল বলে, সে আপনা-আপনি পাশের সিঁড়ি বেয়ে জলে নামে। জনৈকা প্রবীণা তাকে দেখতে পেয়ে বলে—'মালতীর মা! শুনলাম, তোমার ছেলে গোবিন্দের সঙ্গে নাকি পদ্মপালের বড় মেয়ে ধনমণির বে' হচ্ছে? এ কথা সত্যি নাকি?'

'হাঁ, এ-সম্বন্ধে কথাবার্তা চলছে, তবে এখনো পাকাপাকি কোন কিছু স্থির হয় নি।'

'বেশ ভাল বিয়ে হবে। ধনমণি বড় সুন্দর মেয়ে। স্বয়ং লক্ষ্মীর মত তার স্বভাব।'

'বেশি প্রশংসা করবে না, দেবতারা তা হ'লে তাকে সংসার থেকে টেনে নিতেও পারে। প্রজাপতি যদি বাঁধন বেঁধে দেয়, তা হ'লে বিয়ে হ'বে, অন্যথায় নয়।'

'ও নিয়ে মন খারাপ করো না। পদ্মপাল তোমার ছেলেকে খুব পছন্দ করে। আমার ধারণা, বিয়ে নিশ্চয়ই হবে।'

'তোমাদের পাঁচজনার আশীর্বাদে তাই হোক।

সুন্দরী ঐ সমস্ত কথা বলার পর, স্নানার্থিনী মেয়েদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্যের ভাব দেখা যায়। কয়েকজন একবাক্যে বলে—ঐ যে, জমিদারের মেয়ে হেমাঙ্গিনী আসছে।' সকলেরই চোখ যায়, গাঁ থেকে পুকুরের দিকে আসবার পথের দিকে, দেখা যায় ষোল বছরের অতি সুন্দরী এক মেয়ে স্নানের ঘাটের দিকে আসছে। মাথাটা তার খোলা, শরীরের প্রত্যেকটি অংশ আভরণজড়িত; একটু মোটা গোছের মেয়ে, মত্ত করিবরের মত যখন সে আস্তে আস্তে পা ফেলে

আসে, তখন পায়ের মলগুলি মধুর স্বরে বেজে উঠ্ছিল। কয়েক বছর হ'ল জেলার আর এক অঞ্চলের এক তরুণ জমিদারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এখন সে বাপের বাড়ী বেড়াতে এসেছে। সকলেরই দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হয়। তার কাঁকে কোন কলসী নেই, সঙ্গে রয়েছে দু'জন দাসী, চোখে মুখে গর্বের ভাব সুপরিস্ফুট। এক বৃদ্ধা মহিলা—গলায় মোটা সোনার হার দেখে তাকে ধনী ও অভিজাত ঘরের মেয়ে বলেই বোধ হয়—নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বলে,—

'তোমাদের বাড়ীর চাঁদনিতে তোমার বাবার সঙ্গে বসেছিল লোকটা কে? পুকুরে আসবার সময় দু'জনাকেই দেখলাম।'

'লোকটা মহেশ্বরের দারোগা।'

'দারোগা! কেন, কিজন্য এসেছে? কই গাঁয়ে তো কোন ডাকাতি বা খুনের সংবাদ পাই নি?'

'খুন হয় নি! পদ্মপালের মেজো মেয়ে যাদুমণির কথা কি ভুলে গেলেন?'

'ও তো পুরোনো ব্যাপার। অনেক দিন আগে এর মীমাংসা হয়ে গিয়েছে।'

'মীমাংসা হয় নি—শুধু ধামা-চাপা দেয়া হয়েছিল। মনে হয় আবার রটে পড়েছে।'

'তোমার বাবা দারোগাকে কি বললেন?'

'কি বলেছেন, তা ঠিক জানিনে, আমার বিশ্বাস বাবা দারোগাকে ঘুষ দিয়েছেন।'

কয়েকটা মেয়ে এ-নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করে। কেউ কেউ ঘুষ দেওয়া সমর্থন করে, আবার কেউ বা ওর প্রতিবাদ করে। স্নানের ঘাটে এই রকম আলোচনাই চলে। আরো নানা বিষয়ে তারা মতামত প্রকাশ করে; যথা, স্বামীর অত্যাচার, দু'সতীনের বিবাদ, বিমাতার নৃশংস আচরণ, পল্লী নারীদের সৌন্দর্য, ইত্যাদি। এই রকম আলোচনাদি ক'রে তারা একে একে কলসী কাঁকে ভিজে কাপড়ে যে যার ঘরে চ'লে যায়। স্নানের ঘাট ক্রমশঃ নির্জন স্থানে পরিণত হয়।

# সপ্তদশ অধ্যায়

## 'মধুর-ভাষিণী' শাশুড়ী ঠাকুরাণী

মালতীর বিয়ে হওয়ার পর তার আর কোন খোঁজ খবর নেয়া হয় নি। বিবাহিত জীবনের কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র সে একবার বাপের বাড়ীতে এসেছিল, যে সময় আহুরীকে ভূতে ধরে।

বিয়ের রাতের দু'দিন পরেই মালতী স্বামীর সঙ্গে ঘটা ক'রে শ্বশুর বাড়ী দুর্গানগরে যাত্রা করে। শ্বশুর বাড়ীর সকলেই বিশেষ আদরের সঙ্গেই নতুন বৌকে গ্রহণ করে। দুর্গানগর কাঞ্চনপুর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে। গাঁ থেকে গঙ্গানদী খুব বেশি দূরে নয়। নিকটেই দক্ষিণপল্লী নামে মস্ত বড় গ্রাম। এখানে এক ধনী জমিদার পরিবারের বসবাস। নীলডাঙ্গা নামক গ্রামটিও দুর্গানগর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। নীলডাঙ্গায় একটা নীলকুঠি ছিল। দুর্গানগরের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী এবং সদ্‌গোপ ও আগুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। গাঁয়ে কয়েক ঘর বামুন এবং অন্যান্য জাতও আছে। দুর্গানগর দক্ষিণপল্লীর বাঁড়ুয্যে জমিদারদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। গ্রামখানা প্রায় কাঞ্চনপুরের মত, একমাত্র বিশেষত্ব, এখানে নীলের চাষ ছিল। নীল রং তৈরি হতো একজন ইউরোপীয়ান সাহেবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নীলডাঙ্গার কুঠিতে। এহেন গ্রামের সঙ্গে মালতীর ভাগ্য-সূত্র বিজড়িত হয়েছিল।

বিয়ে হওয়ার পর শ্বশুর বাড়ীতে মাত্র এক সপ্তাহ থেকে মালতী বাপের বাড়ীতে ফিরে আসে। সে এক বৎসর সেখানেই থাকে।

কারণ তখন সে মাত্র এগারো বছরের মেয়ে, কাজেই তার পক্ষে বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। অতঃপর তাকে যেতে হয় দুর্গানগরের শ্বশুর-ঘরে। বাপের বাড়ীতে এক বছর কাটানোর সময় অলঙ্গ মালতীকে নানাপ্রকার গৃহ-কর্মে শিক্ষা-দান করে। বাপের বাড়ী থেকে মালতীর বিদায় গ্রহণের দৃশ্য বাস্তবিকই করুণ রসে পরিপূর্ণ। অলঙ্গ, সুন্দরী ও আদুরী সকলেই ডুকরে কেঁদে ওঠে। মালতী সবচেয়ে বেশি উচ্চৈস্বরে কাঁদে। তাকে নিয়ে যখন ডুলির বেহারারা জোরে অগ্রসর হয়, তখন, মালতীর কান্নায় গগন-পবন মুখরিত হয়— 'ও বাবা! ও মা! ও বাবা! ও মা! ওরা আমাকে কোথায় নিয়ে যায় গো?'

শ্বশুরবাড়ীতে আসারপর মনকে প্রবোধ দিতে মালতীর বহু সময় লাগে। প্রায় দু'মাস ধরে শোয়ার ঘরে একা স্বামীর সঙ্গে অবস্থানের সময় সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো। মাধবের আদর-সোহাগে সে ক্রমশঃ শ্বশুর ঘরের নতুন পরিস্থিতি সহ্য করে নেয়। এখানে, এই কৃষক পরিবারের সামান্য কিছু পরিচয় দিলে বোধহয় ভালই হয়। মাধবের পিতা কেশব মদনের চেয়ে অধিকতর সঙ্গতি-সম্পন্ন ও সম্মানীয় কৃষকও বটে, কারণ নিজের বিশ বিঘে খাজনা-করা জমি ছাড়া তার দশ বিঘে লাখেরাজও আছে। তবে তার শরীর ভাল নয়, একে বৃদ্ধ তার উপর পুরানো জ্বর--তাকে অনেক সময় শয্যাশায়ী রাখে। কাজেই তাকে চাষবাস চালাতে হয় ভাড়াটে কিষাণদের সাহায্যে। সংসারে কেশবের স্ত্রী, একমাত্র পুত্র মাধব ও একমাত্র কন্যা কাদম্বিনী; মেয়েটি বাল-বিধবা, বাপের বাড়ীতেই থাকে। রঙ তার মেঘের মতই কাল; তবে মনটা বড়ই মধুর কিন্তু বাড়ীর গিন্নী, কেশবপত্নী এই কৃষক পরিবারের সু-সঙ্গত ঐকতান সুরে একেবারে বেসুরের সৃষ্টি করেছে। কঙ্কাল-সার এই নারীর মাথাটায় চুলের একান্ত অভাব, পুরাপুরি ন্যাড়া বল্‌লেই চলে। তার উপর চোখ দুটো ট্যারা ও নাকটা খাঁদা। তার মনটাও ছিল দেহেরই মত। তাই বলে সে

আল্‌সে-কুঁড়ে নয়, সারাদিন ছুটাছুটি ও সোরগোল করে রাশি রাশি কাজ করে। কিন্তু তার মেজাজটা একেবারেই অসহনীয়। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে সে প্রায়ই ঝগড়া বাধায়, অকারণে ও সামান্য কারণেই মাধবকে তিরস্কার করে, লোকের সামনেই স্বামীর সঙ্গে কথা কাটা-কাটি করে। আর রাতেই কি স্বামীকে সে সুখে থাক্‌তে দেয়? মাসের আধা-আধি তাকে অন্ততঃপক্ষে দিনের বেলায় উপবাস করতে দেখা যায়, রাতে লোকচক্ষুর অগোচরে সে কিছু খায় কিনা তা সঠিক বলা যায় না। গ্রামের কোন কোন লোক তাকে 'রায়-বাঘিনী' অর্থাৎ উগ্রচণ্ডা ব'লে ডাকে। আর সে সত্য সত্য বাঘিনীই বটে। গাঁয়ের ছেলেরা কিন্তু তাকে খেঁকী বলেই ডাকে যেহেতু সে সব-সময়েই খেঁক্‌, খেঁক্‌ ক'রে কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে। অন্নপ্রাশনের সময় কেন যে তার 'সুধামুখী' নাম দেওয়া হয়েছিল তা রহস্যপূর্ণই বটে। যে সময় ও লগ্নে অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রাদির যে সমাবেশের সময় তার জন্ম হয়েছিল সে-সময়টা নিদারুণ নিকৃষ্ট সময় বলেই হয়তো জ্যোতিষী মহাশয় ঠাট্টাচ্ছলে এই নামের ব্যবস্থা করে থাকবেন।

এই মধুর-ভাষিণী শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে নিয়ে মালতীকে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম প্রথম মালতীর সঙ্গে তার ব্যবহারটা মধুর ও মোলায়েম হ'লেও, শীঘ্রই তার বদ্‌মেজাজটা আত্ম-প্রকাশ ক'রে মালতীর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। যা কিছুই সে করুক না কেন শাশুড়ী রেগে অগ্নিশর্মা। সে ভাল ঝাঁট দিতে জানে না; ঘুঁটে দিতে জানে না, তরকারি যা রাঁধে, তাতে ঘেন্না ধরে; ছোট লোকের মেয়ে, চাল-চলন মরদের মত, সাপের ফোঁস-ফোঁসানির মত কণ্ঠস্বর বুঝে কার সাধ্য, কোন কথা বল্‌লে অবজ্ঞা ও ঠাট্টার হাসিই হাসে। সুধামুখী মালতীর সম্বন্ধে এই রকম সমা-লোচনাই করে। মোটের উপর ননদিনী কাদম্বিনীর কাছ থেকে মিষ্ট ব্যবহার না পেলে এই নবোঢ়ার জীবন যারপর নাই শোচনীয় হ'য়েই পড়তো। কাদম্বিনীর মধ্যে মালতী সত্য সত্যই বিজ্ঞ পরামর্শদাত্রী,

প্রকৃত শান্তিদাত্রী ও সহানুভূতি-সম্পন্না বান্ধবীরই সাক্ষাৎ লাভ করেছিল। সময়ে সবই সেরে যাবে, এই ছিল আশ্বাস; কিন্তু এক-চুলও ব্যতিক্রম ঘটে না। কেশবের পুরাতন জ্বর ফিরে আসে, তাতেই তার জীবনাবসান হয়। এতে সুধামুখী আগের চেয়েও বেশি বিগ্‌ড়ে যায়। একেই তো বদ্‌প্রকৃতির মেয়েমানুষ; তার উপর স্বামীর মৃত্যু ও তজ্জন্য তার নারীজীবনের সমস্ত আশা আনন্দ বিলুপ্ত হওয়ায় তার প্রকৃতি বেশি খারাপ হয়ে পড়ে। সে প্রকৃতি ধারণ করে বৃহত্তর খেঁকীর, সে হয়ে পড়ে নিখুঁত বাঘিনী। মধুর-স্বভাবা ননদিনীর সুমিষ্ট প্রবোধবাক্য সম্বল নিয়ে মালতী শহীদের মতই সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করে চলে। হিন্দু-ঘরের সু-সন্তান মাধব বেচারী কি-ই বা করতে পারে? মায়ের অতি মাত্রায় বদ্‌-মেজাজ সত্ত্বেও সে তাকে দেবতার মত ভক্তি করে, যদিও মালতীকে সে প্রাণভরেই ভালবাসে, আর তার উপর তার সহানুভূতিও ছিল প্রচুর। কিন্তু কোন উপায় তো ছিল না। যে রোগ সারবে না তা সহ্য করা ছাড়া আর গত্যন্তর কোথায়? মার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া যে তার চোখে আত্মহত্যারই সমতুল্য। তা যে একেবারেই অসম্ভব। গাঁয়ের লোক কি বলবে? গোটা বর্ধমান জেলার উগ্র ক্ষত্রিয়রাই বা কি বলবে? তারা কি বল্‌বে না,—'অযোগ্য সন্তান, মাধবের কাণ্ডটা দেখলে? সত্যি সত্যি সে কুপুত্র। বউ-এর কথা শুনে, দেবতার চেয়েও গরিয়সী মায়ের কাছ থেকে পৃথক হয়েছে। গর্ভধারিণী মাতার চেয়ে বৌ-ই তার কাছে বড় হয়েছে। নিদারুণ ও বীভৎস কাণ্ড!' হিন্দু-সুলভ এই সমস্ত চিন্তা-ধারা বশতঃ মায়ের কাছ থেকে পৃথক হওয়ার আশা একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে যথাসাধ্য সে বৌকে সহ্য করে চলতে উপদেশ দেয়।

## অষ্টাদশ অধ্যায়

### তুর্গানগরে

'প্রিয়তমে! কি হয়েছে? কাঁদছো কেন?' একদিন রাত্রিতে শোয়ার ঘরে প্রবেশ করে, তুয়োরে খিল লাগিয়ে মাধব পত্নীকে ঐ প্রশ্ন করে। সে দেখে, বৌ বিছানার পাশে বসে মনের তুঃখে কাঁদছে। মালতীকে নিরুত্তর ও অনবরত কাঁদতে দেখে মাধব আবার জিজ্ঞাসা করে—'প্রিয়তমে, বল, বল কি হয়েছে? প্রাণ আমার সব কথা খুলেই বল? আমি কি তোমার জীবনস্বামী নই? বর্তমান অবস্থায় তোমার কাঁদাও ঠিক নয়; কোন অমঙ্গল ঘটতে পারে। কি হয়েছে, তা আমাকে সত্য সত্যই বল।'

'প্রাণেশ্বর!'—হাঁপাতে হাঁপাতে মাধবী বলে, কণ্ঠ তখন তার বাষ্পরুদ্ধ ব'লে। 'আর বেঁচে থাক্‌তে চাইনে। জীবন আমার দায় হয়ে পড়েছে। মলেই সুখী হ'তাম, হাড়ে বাতাস লাগতো, শান্তি পেতাম। ঠাকুর দেবতারা আমাকে শীগ্‌গীর নাও, আমাকে নাও!' এই বলে মালতী আরো জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মাধব তার পাশে বসে পড়ে মাথায় ও ঘাড়ে মৃত্থ চপেটাঘাত করে, নিজের জানুর উপর রক্ষিত পত্নীর মুখখানা তুলে চুম্বন করে বলে— 'প্রিয়ে সব কথা আমাকে খুলে বল; যত খারাপ সংবাদ হোক, নির্ভয়ে বল। এ-অবস্থায় কেঁদো না, লোকে বলে ইহা খারাপ লক্ষণ।'

'দেবতারা আমাকে এ অবস্থায় না ফেল্‌লেই ভাল করতেন। নিজের জীবন যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে, তখন আবার ছেলে। ঠাকুর দেবতাগণ! আমাকে নিয়ে নাও!'

'কিন্তু কেন তোমার দুঃখ তা বলছ না কেন? গলার মালা! আমাকে খুলে বল!'

'তোমাকে আর কি মাথামুণ্ডু বল্‌বো? হাড়গুলো সব মাছভাজা হচ্ছে! বিকেল বেলায়, তুমি যখন মাঠে ছিলে, তখন শাশুড়ী আমার গালে চড় মেরেছে।'

'মা তোমার গালে চড় মেরেছে! এ-ও কি সম্ভব? হায় বিধাতা! তুমি আমার কপালে কি লিখেছ? অদৃষ্টে কি এত কষ্টও ছিল! কি জন্য সে তোমাকে মারলে?'

'কি জন্য? তুমি জানতো আজ একাদশী, শাশুড়ী ভাত খায় না। তার জন্য দুধ জ্বাল দিচ্ছিলাম। এই সময় আমাকে কোন জিনিস আনতে ভাঁড়ার ঘরে যেতে হয়, ফিরে আসার আগেই দুধ উত্‌লে কড়া বেয়ে পড়ে যায়। শাশুড়ী ছিল উঠানে। সে তা দেখতে পেয়ে আমাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে ও মুখে যা আসে তাই বলে গালাগালি দেয়। দোষের মধ্যে আমি শুধু বলি, 'শাশুড়ী ঠাকুরাণী! গাল দিচ্ছেন কেন? আমি তো ইচ্ছে করে করি নি!' এতে সে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে রান্নাঘরে তেড়ে এসে আমাকে এই বলে গালে চড় মারে—'দুষ্টু মেয়ে! মুখে মুখে উত্তর দিতে শিখেছ? শাশুড়ী যে দেবতা তা বুঝি জান না?'

'ও, কি দুঃখ! আমার কপালে না জানি আর কত দুঃখই লিখা আছে? মা যে তোমাকে মেরেছে তা বড়ই লজ্জার কথা! নিশ্চয়ই তাকে বল্‌বো।'

'কিন্তু বলে আর কি হবে? তুমি মনে ভাবছো শুধরাবে? কয়লা ধুলে কি সাফ হয়? ও আর শুধরাবার নয়, একেবারে হাড়ে-মাংসে মিশে রয়েছে।'

'তা হলে কি করতে চাও।'

'কি করতে চাই? যা তোমাকে বল্‌বো তুমি তা কখনই করবে

না। আমি যদি তুমি হতাম তা হ'লে, তাকে বাড়ী থেকে দূর করে অন্য বাড়ীতে রাখবার ব্যবস্থা করতাম।'

ছি! ছি! অমন কথা মুখে এনো না। যার জন্যে সংসারে এলাম, দেবতার চেয়েও বড় সে মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবো? মায়ের চেয়ে বৌকে বড় ব'লে মানবো? কী ঘেন্নার কথা! মানুষ বিনা দোষে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে; কিন্তু মাকে ত্যাগ করা মহাপাপ।'

'কিন্তু সাহেব লোক কি করে বিয়ের পর বাপ-মার কাছ থেকে আলাদা হয়? সেদিন পুকুরে চান্ করার সময় কোন কোন বামুন মেয়ের মুখে শুনেছি, তারা শুনেছে নীলকুঠির কোন কর্ম্মচারীর মুখ থেকে। আমার মনে হয়, খুব ভাল প্রথা। এতে নতুন বৌয়ের সঙ্গে শাশুড়ীদের ঝগড়া-বিবাদের পথ বন্ধ করে।'

'হায় অদৃষ্ট! কি দুঃখের কথা! সাহেবদের প্রথা! তাদের রীতি ব্যবহার নিয়ে আমাদের দরকার? আমি হয়েছি সাহেব, আর তুমি হয়েছ বিবি! পাগল হ'লে নাকি? এ চিন্তা তোমার মাথায় কে ঢোকালে?'

'কিন্তু আমাদের জাতের মধ্যেই এমন সব লোক আছে, যারা মার সঙ্গে পৃথক হয়েছে। দক্ষিণপাড়ার ছিদাম পাল কি করেছে? সে মাকে না খাইয়ে রাখে না। তাকে পৃথক করে রাখবার বন্দোবস্ত করেছে, বৌকে সে আলাদা করে রেখেছে। তুমিও তা কর না কেন?'

'এতে হারামজাদা ছিদাম পালের গৌরব বেড়েছে? গাঁয়ের প্রত্যেকেই কি তার নিন্দে করে না? কুপুত্র বলে না? এ অসম্ভব। মার সঙ্গে পৃথক হওয়ার কথা বলো না, একথা মুখে আনাও মহাপাপ। যে ছেলে মার সঙ্গে পৃথক হয়, তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই; যখন সে মরে তখন তার হাড়ে দুর্বা ঘাস গজায় আর তার আত্মা নরকে যায়। না না, পৃথক হওয়া অসম্ভব। আমি

মাকে বল্‌বো আর তুমিও তার সঙ্গে বনিয়ে-সনিয়ে চল্‌তে চেষ্টা কর। এতে তোমারও দোষ নেই, মায়েরও দোষ নেই, কপালের লেখা। বিধিলিপি আমরা এড়াতে পারি না।'

মাধবের শেষ যুক্তি খণ্ডন করা যায় না। কপালের লিখা মান্‌তেই হ'বে। মালতী হতাশ হ'য়ে পড়ে। পরদিন মাধব সুযোগ সুবিধা মত কথাটা মায়ের কাছে উত্থাপন করে। সে বলে যে, গর্ভবতী অবস্থায় বৌর গায়ে হাত তোলা ঠিক হয় নি। এতে কিন্তু বিপরীত ফলই ফলে। মধুর-ভাষিণী নারী অমৃতের প্লাবন উপস্থিত ক'রে বলে ঃ—'তা হ'লে দেখছি, দুষ্টু ছুঁড়ীটা তোকে সব বলেছে? তোকে কি বলিনি, ঐ বজ্জাত গাঁয়ে ও বজ্জাত সামন্তদের ঘরে বিয়ে করে কাজ নেই? তোর বাবা মূর্খটা আমার অমতেই বিয়ে দেয়। বৌ কি আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে তোকে বলেছে? আর তুই, মাগের ভেড়ুয়া, মাগের লাথি খাওয়া কুপুত্র, এসেছিস মাকে শাসন করতে? পোড়ারমুখো মেয়ে। সর্বনেশেব ঝি। উপরে মেয়ে মানুষের চামড়া ভেতরে ভেতরে রাক্ষসী! অমন মেয়ের মুখে খ্যাংরা! আর, মুখপোড়া, কুপুত্র! মাগেব কথা শুনে, যে মা দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছে, কত গু-মুত খেয়ে মানুষ করেছে, তাকে শাসন করতে এসেছিস? ও সর্বনেশের ঝি তার বাপের বাড়ী চলে যাক। ঢের ভাল ও শান্তশিষ্ট মেয়ের সঙ্গে তোর বে দেবো। খ্যাংরা মেরে ওকে বিদায় করে দে।'

এই অমৃত-প্লাবন ও সুধার ঘূর্ণি রায়ুতে অতিষ্ঠ্য হয়ে মাধব শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচে। কাদম্বিনী মালতীকে মিষ্টবাক্যে প্রবোধ দেয়। সুধামুখীর রাগ কিন্তু আর মাটি হ'তে চায় না। সারাদিন সে রাগে গর গর করে। পরদিন অবশ্য সে অনেকটা শান্তভাব ধারণ করে।

কিছুদিন পর মালতী এক পুত্র সন্তান প্রসব করে। মাধব বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল বলে সন্তান-প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে হরির লুট বিলি করে প্রসূতিকে শুদ্ধ করে নেয়। মাধব সন্তানের নাম রাখে যাদব।

# ঊনবিংশ অধ্যায়

## 'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন'

ধান বা ধান্য শব্দটি বাঙালীর অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় এর প্রতিশব্দটা একটু অদ্ভুত ধরনের। ইংরেজীতে ধানকে বলা হয় 'প্যাডি'। এই শব্দটার উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের যথেষ্ট মাথা ঘামাতে হয়েছে। শব্দটা বাংলা তো নয়-ই, এমন কি হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, তামিল, ইত্যাদি কোন ভাষাতেই এই শব্দের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। শব্দটি নাকি মালয়ান ভাষা থেকে গৃহীত।

ধান্য বা 'প্যাডি' যে ভারত ভূমিতে উৎপন্ন হয়—এই সত্যটি যুগ-যুগান্ত ধরে ভিন দেশের লোকজনদের জানা ছিল। প্রাচীন গ্রীক বা রোম দেশের লোকেরাও তা জানতো। কাজেই আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকেই ভারতে ধানের চাষ-আবাদ প্রচলিত ছিল ব'লে অনুমান করা যায়। কিন্তু আদার ব্যাপারী হ'য়ে জাহাজের খোঁজে কি দরকার? তাই ধান্য, 'প্যাডি', চাউল, 'রাইস' ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণার ভার ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের হাতে ছেড়ে দিয়ে এখন বাংলার সমতল ভূমিতে উৎপন্ন ধান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

আমাদের ঋতু অনুসারে ধানকে তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—আউশ, আমন ও বোরো। আউশ অর্থাৎ আশু-ধান্য ( সংস্কৃত আশু ব্রিহি—অর্থাৎ তাড়াতাড়ি উৎপন্ন ) চৈত্র-বৈশাখ মাসে বোনা হয়, পাকে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে। ধানটা মোটা ধরনের ব'লে, বড়লোক বা মধ্যবিত্তদের পাতে দেওয়ার উপযুক্ত নয়, চাষীরা এর অন্ন

উদরস্থ করে। কিন্তু আউশে আব তাদের ক'দিন চলে? উঁচু ডাঙ্গা জমি, যেখানে বন্যার জল পৌঁছে না, সেখানেই এই ধানের আবাদ চলে। আমন হচ্ছে শীতকালের ফসল ( সংস্কৃত 'হেমন্ত' থেকে এর উৎপত্তি )। তিন শ্রেণীর ধানের মধ্যে এর স্থান সকলের উপরে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে এই ধান বপন করা হয়। পাকে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে। এই ধান সারা বছর ধরে সকল শ্রেণীর বাঙালীর পাতে অন্ন পরিবেশন করে। বোরো ধান জন্মায় নিচু জলাভূমিতে। পৌষ-মাঘ মাসে এই ধান বোনা হয়, পাকে বৈশাখের শেষাশেষি বা জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিকে। অধিকাংশ জমি শুক্‌নো ও উঁচু বলে কাঞ্চনপুরে ও বর্ধমান জেলায় এই ধানের আবাদ একরকম হয় না বললেই চলে।

আমাদের ঋতু অনুসারে ধানকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হ'লেও এক আমন ধানেরই অসংখ্য রকমের প্রকারভেদ দেখতে পাওয়া যায়। ২৪ পরগনা জেলায় নাকি একশ' উনিশ রকমের ধান উৎপন্ন হয়। সিংহল দ্বীপে উৎপন্ন হয় একশ' ষাট রকমের। বাংলার সমস্ত জেলায় একই রকমের ধান উৎপন্ন হয় না। এক-এক জেলায় এক-এক রকম ধানের প্রচলন দেখা যায়। এই যেমন 'বালাম চা'ল' উৎপন্ন হয় বাখরগঞ্জ জেলায়। মিহি চালের জন্য রংপুর ও দিনাজপুর জেলা বিখ্যাত। কাঞ্চনপুরের আশে-পাশে এবং বর্ধমান জেলায় মোটামুটি নিম্নলিখিত ধানগুলোর আবাদ হয়ঃ (১) লোনা, (২) বাঙ্গোটা,, (৩) কালিয়া, (৪) বেনাফুলি, (৫) রামশালি, (৬) চিনি-শর্করা, (৭) সূর্যমুখী, (৮) দাদখানি, (৯) আলম-বাদশাহী ও (১০) রাঁধুনি পাগল। শেষোক্ত শ্রেণীর চা'ল এত সুন্দর ও সুগন্ধ যে রাঁধবার সময় রাঁধুনি আনন্দে উন্মত্ত হয়ে পড়ে।

ধানের চাষ-আবাদ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে চা'ল সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা দরকার। সিদ্ধ ও আতপ দুই ধরনের চা'ল দেখতে পাওয়া যায়। ধান সিদ্ধ করে শুকিয়ে নিয়ে তা ভাঙলে পাওয়া যায় সিদ্ধ চা'ল আর রোদে শুকিয়ে ভাঙলে

বেরিয়ে আসে আতপ চা'ল। সাধারণ বাঙালী সিদ্ধ চা'লেরই ভক্ত। দেবতাদের ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের ভোগে লাগে আতপ চা'ল। এদেশের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরাও আতপ চা'লের ভক্ত, ঐ চা'লের ভাত দেখতে সুন্দর ও অধিকতর পুষ্টিকর বলে। ধানের গুপ্ত রহস্য এই ভাবে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গেল।

সূর্যকরোজ্জ্বল অগ্রহায়ণের এক সুপ্রভাতে নবান্ন উৎসবের সাড়া পড়ে যায়। এই উৎসবকে ধান কাটার মরসুম বলে মনে করলে ভুল করা হ'বে। প্রকৃত ধান কাটা আরম্ভ হয় আরো এক মাস পরে। নবান্ন'র জন্য যে ধান কাটা হয়, তা সকলের আগে বোনা হয় বিশেষ ভাবে এই উৎসব উপলক্ষেই। ধানের মাঠ সোনালী ফসলে পরিপূর্ণ হ'লেও ধান তখনও কাটার উপযুক্ত হয় নি। মাত্র উৎসবের উপযোগী নবান্ন ধান কাটা আর তার চা'ল পর্যন্ত ছাঁটাই করা হয়েছে। নবান্ন দিবস বাংলার কৃষকদের জীবনে স্মরণীয় দিনই বল্‌তে হয়। গোবিন্দ আজ আর গোরু নিয়ে মাঠে যাবে না; তার বাপ-খুড়োও আজ কাজ করবে না। সারা দেশে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য কার্য বিরতি প্রতি-পালিত হয়। ভোর বেলা থেকে কৃষকপল্লী আনন্দে মুখরিত। রাস্তায় রাস্তায় হাসিঠাট্টার ধূম, তামাকু-সেবনের ধূমই সবচেয়ে বেশি। সকলেই একটু সকাল সকাল স্নান করে লয়, কারণ আচার্য ম'শায় গণনা করে ঘোষণা করেছেন যে নবান্ন'র শুভলগ্ন উপস্থিত হবে দেড় প্রহরের সময় ( প্রায় সাড়ে দশটা )। এই সময় অস্নাত অবস্থায় নবান্ন গ্রহণ কখনই সমীচীন নয়। অলঙ্গ, সুন্দরী, আতুরী, তিন জনেই উদ্যোগ পর্ব সম্পন্ন করেছে। বড় ঘরের কোণে এক ঝুড়ি নতুন চা'ল, মানুষে বা জীব-জানোয়ারে তখন পর্যন্ত উহার স্বাদ গ্রহণ করে নি। দুধে পরিপূর্ণ মস্ত বড় একটা হাঁড়ি; আর একটি ঝুড়িতে কুচি কুচি করে কাটা এই ঋতু-জাত নানা প্রকার ফলমূল। কুল পুরোহিত রামধন চক্রবর্তী মহাশয়ও হাজির হয়েছেন। প্রকাণ্ড একটি পাত্রে তিনি দুধ, চা'ল ও ফল মূল একত্রে মিশাতে থাকেন সংস্কৃত মন্ত্র

আওড়াতে আওড়াতে ; শাঁখও তিনি বাজাতে আরম্ভ করেন উদ্দাত্ত স্বরে দেবতাদের উদ্দেশে। দেবতারা নিশ্চয়ই নবান্ন গ্রহণের জন্য সদলবলে উপস্থিত হয়ে থাকেন লোক-চক্ষুর অগোচরে। পঞ্চভূত, মুনি-ঋষি এবং বদনের পূর্ব পুরুষদেরও একে একে আহ্বান করা হয়। গাভী ও বলদ গুলিকেও নবান্ন উপহার দেওয়া হয়। মহাদেবের প্রিয় জানোয়ার শিয়াল এবং পাখীগুলোকেও নবান্নর অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয় না। পুরোহিতের নির্দেশ অনুসারে গোবিন্দকে এজন্য এক প্লেট নবান্ন রেখে আসতে হয় ঝোপের ধারে, আর এক প্লেট নবান্ন সংরক্ষিত হয় উঁচু দেওয়ালের উপর পাখীদের উদ্দেশে। বাড়ীর নিকটবর্তী এক পুকুরেও কিছু নবান্ন নিক্ষিপ্ত হয় মৎস্য-কুলের উদ্দেশে, আবার কিছুটা নবান্ন সংরক্ষিত হয় গর্তের ধারে, ইঁদুর, পোকা-মাকড়রা ওর অংশ গ্রহণ করবে বলে। পঞ্চভূত ও দেবতাদের কাছে নবান্ন উৎসর্গ করার পর বদন, কালোমানিক, গোবিন্দ—ভূমিতলে আসন গ্রহণ করে নবান্ন'র অংশ গ্রহণ করে। সৃষ্টির সেরা হলেও মেয়েরা তাদের অংশ গ্রহণ করে সকলের শেষে। এইভাবে এই মহোৎসবের যবনিকা পড়ে যায়।

অতঃপর আরম্ভ হয় ডিনার বা মধ্যাহ্ন ভোজন-পর্ব। অলঙ্গ এজন্য বহু রকমেরই উদ্যোগ আয়োজন করে। বাঙালী চাষীরা মদও স্পর্শ করে না, মাংসও খায় না। কাজেই মদ্য-মাংস বিবর্জিত ডিনারটি আবার কিরকম হবে, এ নিয়ে বিদেশীদের মনে যথেষ্ট কৌতূহল উপস্থিত হ'তে পারে। বাঙালী চাষীর ডিনারে প্রথমতঃ ভাতের থালা। তারপর ডাল, তৃতীয় পর্যায়ে দু-তিন রকমের শাক ভাজা (সরষের তেলে)। চতুর্থ দফায় আলু, পটোল, বেগুন, উচ্ছে, ইত্যাদি ৫।৬ রকমের ভাজা ; পঞ্চম দফায় ৩।৪ রকমের আনাজের তরকারি, ষষ্ঠ দফায় সর্ষপ তেলে মাছ ভাজা : সপ্তম দফায় মাছের টক এবং অষ্টম ও শেষ দফায় পরমান্ন—চাল, দুধ ও চিনি অথবা ঝোলা গুড়ের পুডিং। বাঙালী রায়তদের ডিনার এইরকম সাদাসিধে ধরনের বস্তু। এইবার রান্নাঘরের

রাঁধুনীদের নিকট বিদায় নিয়ে পল্লী সড়কে ও গ্রামের প্রান্তে সমবেত ভদ্র মহোদয়দের দরবারে উপস্থিত হওয়া যাক।

দুই আমবাগানের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ফাঁকা জায়গায় প্রায় শত খানেক পল্লী বালক আমোদ-আহ্লাদে মশগুল। আমাদের উপন্যাস নায়ক, তার পিতা ও খুল্লতাত এখানে সমবেত। বিভিন্ন জাতীয় চাষীরাও জমায়েত হয়েছে। গোবিন্দ'র বন্ধু-বান্ধব—নন্দ কর্মকার, কপিল সূত্রধর, রসময় মোদক, মদন মুদী, চতুর নাপিত ও বোকারাম তাঁতী—সকলেই এসেছে। এরা সকলে ডাণ্ডা-গুলি খেলায় মেতে উঠেছে। গোবিন্দ সকলকেই হারিয়ে দেয়। তার গুলি বোঁ-বোঁ শব্দে সবচেয়ে বেশি দূর যায়। বদন ও অন্যান্য প্রবীণ কৃষকরা ত' আর খেলায় যোগ দিতে পারে না। গাছতলায় বসে তামাক সেবন করতে করতে তারা খেলা-ধূলার দৃশ্য দেখে। পুত্রের সাফল্যে সে বেশ একটু আত্মপ্রসাদও উপভোগ করে। কিন্তু এই সময় গুলিখেলার হর্ষ বিষাদে পরিণত হয়। গোবিন্দর গুলি একটা ছেলের কপালে গিয়ে লাগতেই কপাল ফেটে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে আরম্ভ করে। ছেলেটার আত্মীয়রা তাকে ধরাধরি করে বাড়ীতে নিয়ে যায়। খেলার ধূম কিন্তু সমান তালেই চলতে থাকে।

ডাণ্ডা-গুলি খেলার দৃশ্যপট থেকে একটু দূরে কতকগুলো কৃষক তরুণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে হাডু-ডুডু খেলায় উন্মত্ত। ঐদিকে গাছ তলায় কুস্তি প্রতিযোগিতা চলে। কালোমানিক ও আর একজন বীরের মধ্যে লড়াই। কেহ কারে নাহি পারে, সমানে সমান। তবুও শেষ পর্যন্ত অমিতবল কালোমানিকই জয়লাভ করে।

সারা দ্বিপ্রহরে এবং অপরাহ্ণ পর্যন্ত শক্তি চর্চায় মাতামাতির পর কৃষকরা যে-যার ঘরে চলে যায় আপন আপন ডিনার উপভোগের জন্য।

নবান্ন উৎসবের প্রায় মাসখানেক পর ধান কাটার মরসুম আরম্ভ হয়। তখন বাংলার চাষীদের আনন্দ কোলাহল কে দেখে? সমস্ত ধান

একই সময়ে কাটার দরকার। বদন এ-সম্বন্ধে বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য লাভ করে। সহযোগীদের পুরোভাগ দখল করে বসে পদ্মলোচন পাল। পদ্মপালের দ্বিতীয় কন্যা যাদুমণি খুন হওয়ার পর দুই পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতার বন্ধন ক্রমশঃ সু-সংবদ্ধ হয়ে অচ্ছেদ্য আকার ধারণ করে। ধান কাটার দিনে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বদন মাঠে যায়। বদন, কালোমানিক ও পদ্ম ধান কাটতে আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য এই কাজে শ্রেষ্ঠ নটের ভূমিকায় সমাসীন হয় কালোমানিক। অবলীলা-ক্রমে সে কাস্তে চালায়। ম্যাশ্ ম্যাশ শব্দে ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে তার নাসারন্ধ্র দুটো দিয়ে জোরে উঁ! উঁ! শব্দ নির্গত হয়। আটি-বাঁধা কাটা ধান বলদের পিঠে বোঝাই দিয়ে বাড়ীতে আনা হয়। এর ভার পড়ে গোবিন্দর উপর। বাড়ীতে অন্যান্য সহযোগী কৃষকরা এই সমস্ত ধান পালা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তবে এই কাজ শুরু হয় অনেক পরে।. বাবা-কাকা যে-সময় ধান কাটে, সেই সময় মাঠে ধান কুড়ানোর জন্য সমবেত ছেলে মেয়েদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় তার সময় কাটে। পদ্মলোচন পালের মেয়ে ধনমণির উপর সে বেশ একটু পক্ষপাতিত্ব দেখায়। নিজের গামছা থেকে মুড়ি মুড়কির অংশ ধনমণিকে ত' দেয়ই তাছাড়া অনেক শীষ ছিঁড়ে সে ধনমণির ঝুড়িতে রাখে।

এই ধান কুড়ানোর ব্যাপারে চাষী সমাজে একটা সংস্কারও আছে। যে ধানের শীষ কাস্তের আঘাত এড়িয়ে যায়, সেগুলো বাংলার চাষী আর সংগ্রহ করে না। ছেলে-মেয়েরা এই সমস্ত বর্জিত শীষ সংগ্রহ করে থাকে। ধনমণিও ঝুড়ি নিয়ে মাঠে এসেছে বর্জিত শীষ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এতে মান-অপমানের কিছুই নেই। ছোট, বড় সমস্ত চাষী ও নিঃস্ব ঘরের ছেলে-মেয়েরা এইভাবে ধান্য সংগ্রহ করে থাকে। দ্বিপ্রহরে ধান্য-কর্তনে সমবেত চাষীদের জন্য আহার্য দ্রব্য নিয়ে গোবিন্দ মাঠে আসে। ধনমণিও পিতার পাশে বসে তার আহারের অংশ গ্রহণ করে। অতঃপর গোবিন্দ যখন গোরুর

পিঠে কাটা ধান বোঝাই দিয়ে বাড়ীতে ফিরে যায় তখন ধনমণিও তার সঙ্গে ঘরে চলে যায়।

আপন ধানকাটা শেষ করে, বদন এসে অন্যান্য সহযোগী চাষীদের ধান্য আহরণে সাহায্য করে। ধান কাটা ও ধান পালা দেওয়া শেষ হওয়ার পর ধান ঝাড়া আরম্ভ হয়। ধান্য আহরণের পালা শেষ হওয়ার পর আরো একটি উৎসব বাংলার চাষীরা উপভোগ করে থাকে। উৎসবটা পৌষ সংক্রান্তি নামে পরিচিত। এই উৎসবকে বলা হয় পিঠা সংক্রান্তি। পৌষমাসের শেষ তারিখ থেকে এই উৎসব আরম্ভ হয়। পরবর্তী তিন দিন ধরে চলে। উৎসবের প্রথম দিন অলঙ্গ, সুন্দরী ও আতুরী ভোর বেলায় উঠে—কলাই, বরবটি ও মুগ সিদ্ধ করে পিণ্ড তৈরি করে। নারিকেলের শীষের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে তা জ্বাল দিয়ে নিয়েও একপ্রকার মণ্ড তৈরি করা হয়। অতঃপর চাউল গুঁড়া সিদ্ধ করে নিয়ে পিণ্ড তৈরি করে এবং ছোট ছোট পিঠে তৈরি করা হয়। ঐ পিঠের মধ্যে নারিকেলের মণ্ড বা ডালের মণ্ড দিয়ে সিদ্ধ করে লওয়া হয়। আস্‌কে, সরু চাক্‌লী, ইত্যাদি নামে পরিচিত এই সমস্ত পিঠে বাঙালী হিন্দু চাষীদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। ভদ্রলোকদের পাতে দেওয়ার যোগ্য হয়ত' এই সমস্ত জিনিস নয়; কিন্তু চাষীদের এতে আপত্তি ত' নাই-ই, আর এতে তাদের কোনরকম অসুখ হতেও দেখা যায় না। এই পিষ্টক উৎসবের সময়ে কাঞ্চনপুরবাসীদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। কৃষক-বালকরা এই সময় রাস্তায় রাস্তায় নানা প্রকার ছড়া গেয়ে আনন্দ উপভোগ করে।

# বিংশ অধ্যায়

## প্রজাপতির নির্বন্ধ

কাঞ্চনপুরের স্নানের ঘাটে পদ্মপালের মেয়ের সঙ্গে গোবিন্দের বিয়ের কথা অনেক আগেই শোনা গিয়েছে। এ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনাও অনেক দূর এগিয়েছে। বালক ও বালিকার কানে কিন্তু একথা আদৌ পৌঁছেনি। মাত্র কিছু সময় পূর্বে ধান কাটার সময় মাঠে ভাবী বধূ যাদুমণির সঙ্গে ভাবী বর গোবিন্দর মধ্যে দেখাশোনা ও কিছু কথাবার্তাও হয়েছে; কিন্তু যদি তারা জান্‌তো যে দু'জনের মধ্যে বিয়ের কথা চলেছে, তাহলে কেউ কারুর ছায়াও মাড়াতো না। ধানের মাঠে গোবিন্দ গিয়েছিল ধান কাট্‌তে আর যাদুমণি গিয়েছিল ধান কুড়ুতে, কুড়ানো ধানের বিনিময়ে মুড়ি-মুড়কি সংগ্রহ করা পল্লীবালাদের কাছে বড় রকমের আমোদ রূপেই গণ্য। ধানকাটার সময় গোবিন্দ একাদশবর্ষীয়া যাদুমণির উপর কিছুটা পক্ষপাতিত্ব দেখায়; মাঝে মাঝে তার ঝুড়িতে কিছু ধানের শীষ সে দেয়, এবং গামছায় বাঁধা মুড়ি-মুড়কির অংশও দান করে। এই ব্যাপারে, গোবিন্দর মনে কিছুটা অনুরাগের ভাব থাকলেও যাদু-মণির মনে গোবিন্দ সম্পর্কে কোনরূপ অনুভূতিই সৃষ্টি হয় নি।

অলঙ্গ এখন বৃদ্ধা হয়ে পড়েছে, নাত্‌বৌকে দেখে যাবে, তার বড়ই ইচ্ছা। সুন্দরীও ব্যাটার বৌ নিয়ে ঘর কবতে চায় ও কোলের উপর নাতিকে নাচাবারও অভিলাষী। পদ্মপালও গররাজী নয়। ধান কাটা শেষ হ'লে পরে ফাল্গুন মাসে বিয়ের দিন স্থির করা হয়। এই বিয়ের রকম ও ধরন ধারণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলার নেই।

ইতিপূর্বে মালতীর বিয়ের বেলায় আমরা যা দেখেছি সেই সমস্তই এই বিয়েতে সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় বদনের বাড়ী কুটুম্বে ভরে যায়। মেয়ে মালতী, তার ছেলে যাদব ও ননদিনী কাদম্বিনীও বিয়েতে এসেছে। বিয়ের উৎসবে গঙ্গা নাপিত, রামধন মিশ্র পুরোহিত, ইত্যাদি সকলেই যোগদান করে। গুরুমহাশয় তখন বার্ষিক আহরণের সফরে, কাজেই তিনি আস্তে পারেন না, পরিবর্তে প্রতিনিধি প্রেমভক্ত বৈরাগীকে প্রেরণ করেন। ইনি বিয়ের অংশ গ্রহণের পরিবর্তে স্বকার্য সাধনের দিকেই যে বেশি মন দিয়েছিলেন, তা পরে বেশ বোঝা যাবে। আর গোবিন্দর বন্ধু-বান্ধব—, তার সাঙাত, বন্ধু ও মিতা যে বিয়েতে এসে সারাদিন পরিশ্রম ও আনন্দ আহ্লাদ করে তা বলাই বাহুল্য। রামরূপ পণ্ডিতও ক্রাচে ভর দিয়ে ছাত্রের বিয়েতে শুভাশিস জানাতে আসে এবং এজন্য ন্যায্য এক টাকা প্রণামীও লাভ করে। আর বিয়েতে রূপার মার আনন্দ দেখে কে? দশ দিন ধরে সে বদনের বাড়ীতেই আছে। একটিবারও নিজের কুঁড়ে ঘরে যায় নাই। সকলের মতই সে কর্মব্যস্ত, কিন্তু বেচারী নীচ-জাতীয়া ব'লে ইচ্ছামত সব কাজের অংশ গ্রহণ করতে পারে না বর ও কনের উপর সে হাজারো আশীর্বাদ বর্ষণ করে ও প্রায়ই অলঙ্গের পরম সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করে।

'সব চেয়ে তুমিই ভাগ্যবতী নারী,'—রূপার মা অলঙ্গকে বলে। 'ছেলে হ'লেই নারীকে সৌভাগ্যবতী বলে; আর নাতির বে হচ্ছে, তুমি নাতনীর ছেলেও দেখলে। তোমার ভাগ্য কত বড়! পূর্বজন্মে তুমি কত পুণ্যিই করেছিলে? নইলে এমন সৌভাগ্য হ'বে কেন?

কথায় বলে,—

নাতির নাতি.
স্বর্গে বাতি।

'তোমার বেলায় তা দেখছি—সত্যি হ'তে চলেছে।'

অলঙ্গ—'মাত্র নাতনীর ছেলে দেখলাম,—কাজেই তোমার কথাটা

ঠিক হ'লো না। তবে এতদিন যে বেঁচে আছি, তা দেবতাদের দয়াতেই।'

'তুমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত পুণ্যাত্মা ; তুমি স্বয়ং মা লক্ষ্মী।'

'পুণ্যাত্মা হ'লাম কি করে? তা হ'লে কি আজ এত দুর্ভোগ সইতে হয়?'

'কিসের কষ্ট? তুমি তো রাজরানী! হ্যাঁ, রানীর চেয়েও সৌভাগ্য-বতী। ক'জন নারীর ভাগ্যে নাতির ছেলে দেখার সৌভাগ্য হয়?'

'ও রূপার মা! অমন সোনার চাঁদ ছেলে গয়ারাম যখন সাপের কামড়ে মরলো, তখন আর ভাগ্যবতী বল কেন? মস্ত বড় পাপী আমি তাই কপালে এত বড় বিপদ এল। দেবতারা রাগ করেই আমাকে এই শাপ দিয়েছে। ও বাবা গয়া! সোনার চাঁদ! হারানো মানিক আমার কোথায় আছিস রে? তোর মাকে ছেড়ে কোথায় গেলি রে?'

'গিন্নি, গোবিন্দের বিয়ের সময় ওসব চিন্তা মনের মধ্যে ঠাঁই দিয়ো না, গোবিন্দ যেখানে কোলে রয়েছে, সেখানে কিসের শোক? ভগবান তাকে বাঁচিয়ে রাখুক, ছেলে মেয়ে হোক, তখন তোমার মন আনন্দে ভরে যাবে।'

'ঠিক বলেছ। রূপার মা! কিন্তু আমার গয়াকে যে সাপে দংশালো তা ভুলি কি করে? বুক যে, ফেটে যাচ্ছে! জীবনে আর সাধ নাই, গোবিন্দ ও তার বৌকে দেখলাম এতেই আমি সুখী, এখন কোন তীর্থ জায়গায় গিয়ে বাকী কটাদিন কাটাতে পারলে বাঁচি।

দু'জনের মধ্যে যখন এই সমস্ত আলোচনা হচ্ছিল, তখন বদন সেখানে উপস্থিত হয়। মায়ের চোখে জল দেখে সে সমস্তই বুঝতে পারে। মাকে সে গয়ারামের জন্য শোক করতে বারণ ক'রে গোবিন্দের বিয়ের আনন্দ উপভোগ করতে বলে। অদৃষ্টলিপির কথা বলে সে মাকে সান্ত্বনা দেয় এবং মার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় উৎসব-রতা মেয়েদের মধ্যে।

# একবিংশ অধ্যায়

## আখের চাষ

বর্ধমান জেলায় আর পাঁচ জন বড় বড় চাষীর মত বদনেরও আখের ক্ষেত ছিল। ধান মাড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আখও কাটবার উপযুক্ত হয়। তা সত্ত্বেও আখ মাড়াই আরম্ভ হয় আরো এক মাস পরে। আখের রস যাতে পরিমাণে বাড়ে ও রসের মিষ্টতাও বর্ধিত হয়, চাষী এই জন্যই আখকে আরো এক মাস ফেলে রাখে। কাজেই আখমাড়াই আরম্ভ হয় মাঘ মাসে; অন্ততঃপক্ষে কাঞ্চনপুরের রেওয়াজ হচ্ছে এই। আখ মূল্যবান ফসল ব'লে বাংলার রায়তরা ধানের আবাদের পরেই আখের চাষে বেশি কষ্ট স্বীকার করে থাকে। ভারতই বাকী দুনিয়াকে আখের বীজ বা চারা সরবরাহ করেছে। কাজেই এই চাষ সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলাপ-আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না নিশ্চয়ই।

বদন পূর্ববর্তী সনে আখ কাটবার সময় আখের উপরের অংশ (পাব) গুলো কেটে রেখেছিল। বাড়ীর সংলগ্ন পুকুরের পাড়ের নার্সারীতে সে ঐগুলো পুঁতে রাখে। পরে এ-গুলো অবশ্য বড় জমিতে রোপণ করা হয়। ধানের আবাদ করতে কৃষককে খুব বেশি শ্রম স্বীকার করতে হয় না, সামান্য একটু আঁচড় দিলেই জমি ধানচাষের উপযোগী হয়। কিন্তু আখের ক্ষেতে লাঙ্গল চালাতে হয় গভীরভাবে আর চাষের সংখ্যাও ধানের তুলনায় কমপক্ষে দুই গুণ। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে জমিতে প্রথমে লাঙ্গল চালাতে হয়। প্রায় তিন-চার বার চাষ দেওয়ার পর গোবর, খইল, ইত্যাদি সার দিতে হয়।

তারপর আবার জমি চষতে হয়। অতঃপর জমিতে মই দিয়ে সমান করতে হয়। তারপর আলি বেঁধে সারি সারিভাবে আখের চারা লাগাতে হয়। আবার খইল ইত্যাদির সার দিতে হয় এবং বর্ষার অনেক আগে আখের চারা পুঁততে হয় বলে মধ্যে মধ্যে জলসেচেরও ব্যবস্থা করতে হয়। মধ্যে মধ্যে সার প্রয়োগ চলতে থাকে। জলসেচের পর খালগুলো ভেঙে দিয়ে খাদ ভর্তি করা। এই হ'ল আখ চাষের প্রথম পর্যায়। আখের চারাগুলো যদি মাটিতে শিকড় না গাড়ে আর নতুন পাতা না বের হয়, তাহ'লে আবার নতুন করে চেষ্টা চরিত্র করতে হয়। চারাগুলো মাটিতে দু'ফুট লম্বা হলে পর অনাবশ্যক শুক্‌নো পাতাগুলো ফেলে দিয়ে বাকি পাতাগুলো জড়িয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দিয়ে ঘাস, আগাছা, ইত্যাদি তুলে ফেলতে হয়, জমিতে রস না থাক্‌লে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হয়। মোটের উপর আখের উপর কৃষককে জাগ্রত দৃষ্টি সব সময়েই নিবদ্ধ রাখতে হয়, কারণ, প্রায়ই এক প্রকার কীট আখের দফা ঠাণ্ডা করে বসে। শিয়াল প্রভৃতি নিশা-চোরের উপদ্রব থেকেও কিন্তু আখ গাছকে রক্ষা করতে হয়। মোটের উপর, কাঞ্চনপুর গ্রামে এইভাবে আখের চাষ চালানো হয়।

গ্রামে তিন রকমের আখ উৎপন্ন হয়—পুর, কাজুলি ও বোম্বাই। শেষোক্ত কৃষ্ণাভ আখটি দীর্ঘ ও সবচেয়ে শক্তও বটে। কিন্তু রসাল জমিতে সেই জাতীয় আখ উৎপন্ন হয় বলে কাঞ্চনপুরে এই আখের ততটা চলন নাই, কারণ এই গ্রামের জমি শুক্‌নো ও উঁচুও বটে, তাছাড়া, এই আখের রস বেশি হলেও, শর্করার ভাগ কম বলেও কাঞ্চনপুরের চাষীরা এর আবাদে ততটা মন দেয় না। কাজুলি আখ লম্বা লালচে ধরনের আর রসও খুব বেশি ও সবচেয়ে মিষ্টি। কিন্তু রসের আধিক্যে ইহা আপনা আপনি ফেটে পড়ে, কাজেই এতে কীটের উপদ্রবও বেশি ; সেইজন্য বেশি পরিমাণে এই আখের আবাদ অর্থনীতি—সঙ্গত নয়। কাজে-কাজেই, হরিদ্রা ও শাদা রংয়ের

সাত-আট ফুট লম্বা পুরী আখই কাঞ্চনপুরে সবচেয়ে বেশি ফলান হয়ে থাকে।

মাঘ মাসের এক সুপ্রভাতে বদন, কালোমানিক, গোবিন্দ ও তার শ্বশুর পদ্ম পাল এবং আরো দশ-বার জন চাষীকে আখের ক্ষেতে ভীষণ কর্মব্যস্ত দেখা যায়। কেহ কেহ কাস্তে দিয়ে আখগাছ কাটছে, কেহ বা পাতা ছাড়াচ্ছে ও অগ্রভাগ ছেঁটে ফেলছে। কয়েকজনকে পরিষ্কৃত আখগুলোকে আখশালায় বয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। আখের ক্ষেতের কাছেই নির্মিত এই কুটীরে আখ থেকে রস বের করে ও তা জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হয়। এই ঘু'টিকে বলা হয় 'পইল'। এখানে প্রকাণ্ড এক উনুনের উপর বড় বড় মাটির পাত্রে রস জ্বাল দেওয়া হয়। পইলের বাহিরে আখ মাড়াইয়ের কাষ্ঠ নির্মিত কল। কলের নিচে প্রকাণ্ড একটা মাটির পাত্রে রস সংগৃহীত হয়। দু'জন লোক মুখো-মুখি বসে দু'দিক থেকে কলে আখ প্রবিষ্ট করাতে থাকে। চারজন লোক কলটা অনবরত ঘুরাতে থাকে। এই কল ঘোরান খুব শ্রম-সাধ্য ব্যাপার। কালোমানিক এ-সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি বাহাদুরির অধিকারী। আমাদের নায়ক গোবিন্দ এখন শক্ত-সমর্থ উগ্র ক্ষত্রিয় যুবকে পরিণত। সে-ও তার খুড়োর সঙ্গে কল ঘোরানোর কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছে। কলে আখের গুঁজি দিচ্ছে বদন ও পদ্ম পাল। উনুনের দু'দিক দু'জন চাষী শুক্‌নো আখ পাতার ইন্ধন যোগাচ্ছে। প্রত্যেকটি জ্বাল দেওয়ার পাত্রের কাজে এক একজন চাষী দাঁড়িয়ে কাঠের হাতার সাহায্যে রসে নাড়া দিচ্ছে ও গাছ কেটে ফেলছে।

এই আখশালা ও আখ-মাড়াই কল বদনের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। কাঞ্চনপুরের উত্তর ও পূর্ব পাড়ার কৃষিজীবীরা সমবেত হ'য়ে যৌথ কারবার হিসাবে এই আখশালা ও আখ মাড়াই কল পরিচালন করছে। পর পর প্রত্যেক চাষীর আখ এইভাবে মাড়াই করে গুড় উৎপন্ন করা হবে। বাংলার চাষীরা চিনি তৈরী করে না। এই শিল্পের

ভার মোদকশ্রেণীর হাতে অর্পিত। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে আরো একটি আখের কল চোখে পড়ে। এখানে আখ মাড়াই হয় গ্রামের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশের কৃষকদের। আখ মাড়াই করার সময় হিন্দু চাষীরা ধর্মীয় উৎসবও পালন করে থাকে বদনের কুল পুরোহিত রামধন মিশ্র এই উৎসব সম্পন্ন করেছে। এতদুপলক্ষে লক্ষ্মী ও অগ্নিদেবের অর্চনা করা হয়। প্রথম দেবতার অর্চনা করা হয় ভাবী মঙ্গলের জন্য ; কিন্তু শেষোক্ত দেবতার নিকট করুণ প্রার্থনা নিবেদন করা হয় আখশালাকে বহাল তবিয়তে রাখার জন্য, কারণ কখনো কখনো বিশ্বম্ভরের কৃপায় আখশালা ভস্মে পরিণতও হয়ে থাকে।

আখ-মাড়াই কলের দোষ রয়েছে। কারণ এমন বিকট আওয়াজের সৃষ্টি হয় যে দুই-তিন মাইল দূর থেকেও তা বেশ শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা হ'লে হবে কি সুযোগ সুবিধাও যথেষ্ট রয়েছে। ধান কাটা উপলক্ষে পল্লীর আনন্দ-পূর্ণ দৃশ্য আমাদের চোখে পড়েছে ; আখ-শালার দৃশ্য আরো আনন্দদায়ক। প্রত্যেক দিন গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আখ উপহার লাভের জন্য এখানে ভিড় করে থাকে। চাষীরা সানন্দেই ছেলেমেয়ে ও ব্রাহ্মণদের আটি আটি আখ বিলিয়ে থাকে। লক্ষ্মীদেবী পর বৎসর আরো বেশি আখ দেবেন এই আশাতেই তারা খয়রাৎ করে থাকে। যদি কোন কৃষক এ সম্বন্ধে কার্পণ্য প্রকাশ করে, তা হলে তাকে রীতিমত নিন্দার ভাগী হ'তে হয়। আর শুধু আখ নয়, ছেলেমেয়ে ও বামুনদের জ্বাল দেওয়া রসও বিলি করা হয়। টিনের গরম রসে বেগুন ছুড়ে ফেলে, সিদ্ধ অবস্থায় পুনরায় তুলে নিয়ে পরম পরিতোষের সঙ্গে তা ভোজন করে থাকে। আখশালার আশে পাশে দিন-রাত ছেলেমেয়ের ভিড়। এতে পল্লী পাঠশালার কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কারণ এই সময় পাঠশালায় খুব কম ছাত্রই উপস্থিত হয়ে থাকে।

## দ্বাবিংশ অধ্যায়

### আতুরীর বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা

বদন পরিবারের ধর্মের কিছুটা আভাস আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা দরকার ; কারণ ধর্ম বাঙ্গালী চাষীর, আর শুধু চাষী কেন, মেহনতি মানুষের জীবনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার ক'রে রয়েছে। বাংলার একটা চল্‌তি কথাও এর জীবন্ত সাক্ষ্য দান করছে :—

মাগুর মাছের ঝোল,
নব যুবতীর কোল,
হরি হরি বোল।

ধর্ম বাস্তবিকই বাংলার চাষীর যে অত্যন্ত প্রিয় জিনিস, সব চেয়ে লোভনীয় পদার্থ এর ভেতরে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়কে মোটামুটি দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; যথা :—শাক্ত ও বৈষ্ণব। শক্তির উপাসনা শাক্তদের মূল লক্ষ্য, আর বিষ্ণু বা পরম ব্রহ্মের উপাসনা বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান অঙ্গ। পরম ব্রহ্মকে অবতাররূপে কল্পনা করা হিন্দুদের আর একটা বিশেষত্ব। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক, চৈতন্য ও গৌরাঙ্গকে হিন্দুরা অবতার রূপেই বিবেচনা করে। তবে কৃষ্ণ ঠাকুরই বৈষ্ণবদের প্রধান উপাস্য দেবতা। তিনি হচ্ছেন প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অবতার। কৃষ্ণের প্রণয়িণী রাধাও হিন্দুদের উপাস্য দেবতা। অবতার হিসাবে কৃষ্ণ ঠাকুরের পূজার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যদেবের মূর্তি পূজা এমন কি তাঁর প্রধান সঙ্গী নিতানন্দ ও অদ্বৈতানন্দের মূর্তি পূজাও হিন্দুরা অবলম্বন করেছে। কাঞ্চনপুরে

চৈতন্যদেবের মূর্তির কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। শত শত হিন্দু শ্যামসুন্দর নামে এই মূর্তির পূজা করে। রাধাকৃষ্ণের খেলাধূলা ও প্রেমাভিনয় ভক্তিভাবে স্মরণ করা বৈষ্ণবধর্মের প্রধান অঙ্গ, আর বেলকাঠ বা তুলসী কাঠে তৈরি একশ' আটটা গুটিসহ হরি নামের মালা যে না জপে তাকে বৈষ্ণবই বলা চলে না! এই মালাজপার ফরমূলা বা সূত্রটা হচ্ছে :—

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হরে, হরে!
হরে রাম, হরে রাম, রাম, রাম, হরে, হরে!

অলঙ্গ দ্বিপ্রহরে আহারের পূর্বে ও সন্ধ্যায় অবশ্যম্ভাবী রূপেই মালা জপে থাকে। বিধবা আহুরীও মালা জপে তবে শাশুড়ীর মত নিয়মিতভাবে নয়।

পবিত্র তীর্থক্ষেত্রগুলো পরিদর্শন বৈষ্ণব ধর্মের আর একটা অঙ্গ। বৃন্দাবন ও মথুরা, জগন্নাথদেবের আশ্রয়স্থল পুরী ও গুজরাটের দ্বারকা বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। এই সমস্ত তীর্থের পরেই চৈতন্যদেবের লীলা ক্ষেত্র, বর্ধমান জেলার কাল্না ও অগ্রদ্বীপ এবং চৈতন্যদেবের জন্মস্থল নবদ্বীপ বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্র রূপে গণ্য।

গোবিন্দের বিয়ের পর অলঙ্গর জীবনের সমস্ত সাধ আহ্লাদই সাঙ্গ হয়ে যায়। কাজেই সে ধর্মে মনোনিবেশ করে। বাকী জীবন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েই কাটিয়ে দিবে-- এই সঙ্কল্প সে করে। প্রথমে বাংলার তীর্থক্ষেত্রগুলো পরিদর্শন করবে, পরে জগন্নাথে যাবে এইরকম পরিকল্পনা সে স্থির করে। আহুরীও শাশুড়ীর সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বদন ও কালোমানিক তার মনোভাবের উপর বিশেষ আস্থা রাখ্তে না পারলেও, তার ধর্মানুসরণে বাধা দেওয়া সঙ্গত ব'লে মনে করে না। এতে মায়ের সেবা-যত্ন হ'বে মনে করে তারা কোন রকম ইতস্ততঃ না করেই সম্মতি দেয়। গাঁয়ের আরো দু'জন নারী সহযাত্রীর সঙ্গে তারা রওনা হয়। প্রথমে কালনায় গিয়ে, তারপর দুর্গানগরে মালতীর সঙ্গে দেখা করে তারা নবদ্বীপে

যাবে, এবং সর্বশেষে অগ্রদ্বীপ দর্শন করে বাড়ী ফিরে আস্‌বে—এই রকম তারা স্থির করে এবং তদনুসারে প্রত্যেকে প্রয়োজনীয় আহার্য-দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ এক একটি পুঁটুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে তারা যায় কাল্‌নায়, অতঃপর কাল্‌না থেকে দুর্গানগরে মালতীর বাড়ীতে; বলা বাহুল্য মালতী বিশেষ আদর যত্নের সঙ্গেই তাদের অভ্যর্থনা করে। মালতীর বাড়িতে দিন দুই থেকে, তারা যায় বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের জন্মভূমি নবদ্বীপে।

নবদ্বীপ থেকে তারা যায় অগ্রদ্বীপে। অগ্রদ্বীপে তখন মহোৎসবের ধূম। বাংলার প্রায় সমস্ত অঞ্চল থেকে নানা রং-এর, নানা ঢং-এর আলখেল্লা পরে এসেছে বৈরাগী, বাউল, নাগা সন্ন্যাসী ও ন্যাড়ানেড়ীর দল। খোল করতাতের মধুর ধ্বনিতে দিনরাত গগন পবন মুখরিত। দলে দলে বিচিত্র ভঙ্গিতে তারা স্থানে স্থানে নৃত্যরত। প্রায় পঞ্চাশ হাজার বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর একত্রে সমাবেশ। বলা-বাহুল্য, অলঙ্গ ও আদুরী প্রাণে পরম পুলক অনুভব করে।

এখন এখানে কথা উঠ্‌তে পারে, এ-রকম সোরগোল করে কি করে ভগবানের অর্চনা করা সম্ভব। নির্জন স্থানে, অন্ততঃপক্ষে নীরবতার মধ্যে ধ্যানধারণা করা সম্ভব। কিন্তু বহু মানুষের একত্রে গীত বাদ্যের মধ্যে ভাবের তন্ময়তা অতি সহজেই এসে পড়ে। মনের তন্ময়তা ও একাগ্রতা যদি উপাসনার প্রধান অঙ্গ, তাহ'লে নাম সংকীর্তনের দ্বারা তা যে সম্ভব হতে পারে না, তাই বা বলা যায় কি করে? বৈষ্ণব দর্শনও একেবারে ফেলে দেওয়ার বস্তু নয়। তবে শেষ পর্যন্ত এই ধর্মের যে যথেষ্ট অবনতি ঘটে, এবং ধর্মের নামে নানা-প্রকার কুসংস্কার ও স্বার্থসিদ্ধির ফিকির ও বুজরুকি ধর্মের স্থান দখল করে বসে, তা নিয়ে আলোচ্য ব্যাপারটিতে বেশ বোঝা যাবে। অলঙ্গ, আদুরী ও তার দু'জন নারী-সঙ্গিনী কয়েকদিন ধরে অগ্রদ্বীপে অবস্থান করে। একদিন এক জায়গায় সাংঘাতিক লোকের ভিড় তাদেরকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। কৌপিনপরা, মাথায় ছোট্ট একটা টুপি পরা

এক বৈষ্ণবের তাণ্ডব-নৃত্য বহু লোককে জড় করছে। মধ্যে মধ্যে সে লাফ মারছে, হাত-পা'র নানা রকম ভঙ্গি করছে, আবার কখনো বা উদাত্ত স্বরে গানও করছে। গান করতে করতে হঠাৎ লোকটার দৃষ্টি ভিড়ের মধ্যে আহুরীর চোখ দুটোর সঙ্গে মিলিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে ভূমিতলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। অলঙ্গ ও আহুরী তাকে চিন্‌তে পারে। লোকটি আর কেউ নয়, প্রেমভক্ত বৈরাগী। বদনের বাড়ীতে সে বহুবার ভিক্ষে নিতে গিয়েছে, গোবিন্দর বিয়েতে গুরুদেবের প্রতিনিধিরূপেও এসেছে। তার দশা হয়েছে বলে সঙ্গীরা চিৎকার করে ওঠে। চোখে মুখে জলের ছিটা দেওয়া ও বাতাস করার পর, সে কি দেখেছে, তা জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে সে বলে যে, সে গোপীনাথজীর দর্শন লাভ করেছে; গোপীনাথজী তাকে বলেছেন যে, ভিড়ের মধ্যে এক নারী রয়েছে, সে উচ্চদরের বৈষ্ণবী হবে। মেয়েটি যুবতী বিধবা; দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গাছতলায় তিনটে মেয়ের সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের দৃষ্টি তখন গাছের উপর নিবদ্ধ হয়। সত্যি সত্যি চারটে মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে বিধবা যুবতী আহুরীও আছে। বৈষ্ণব দলের নেতা তখন আহুরীর কাছে গিয়ে প্রেমভক্তের কাছে যে ভগবৎ নির্দেশ এসেছে তা জানায় ও সে যে পরম সৌভাগ্যবতী তা বলে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও বলে যে, উপস্থিত অবস্থায় তার ভেক নিয়ে বৈরাগীর দলে মিশে যাওয়া কর্তব্য। অলঙ্গ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। একটা যে মস্ত বড় প্রতারণার জাল বিস্তার করা হয়েছে, এই সবল-প্রাণা নারী তা বুঝতেও পারে না। তাহ'লেও আহুরীকে ছেড়ে দিতেও তার প্রাণ চায় না। অন্যান্য বৈষ্ণবরা এসে আহুরীব কানে সুধাবর্ষণ করতে আরম্ভ করে, আহুরীর তা যে শুন্‌তে একেবারে খারাপ লাগ্‌ছিল না তা সহজেই অনুমেয়। দু-চার মিনিট ইতস্ততঃ করার পর সে ভেক গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করে।

ধর্মীয় গোঁড়ামি নতুন শিকার হজম করে নিতে আদৌ বিলম্ব করে

না। সঙ্গে সঙ্গে আহুরীর ভেক গ্রহণ উৎসব সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য, প্রেম-ভক্ত বৈরাগীই তাকে দীক্ষা দেয় এবং প্রিয় সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণও করে। বেচারী অলজ পূর্বোক্ত দু'জন নারী সঙ্গিনীর সাথে পরদিনই কাঞ্চনপুর যাত্রা করে। আহুরীকে হারিয়ে সে কাঁদতে কাঁদতেই বাড়ীতে প্রবেশ করে। সুন্দরী ও যাদুমণিও ক্রন্দনে যোগদান করে।

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

### অলঙ্গর তীর্থযাত্রা

"এইত' সেখুয়া এসেছিল" বদন মাঠ থেকে ফিরবার পর অলঙ্গ তাকে বলে ; 'সে বলে গেল, আগামী পরশু যাওয়ার জন্য আমাকে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। অত্যন্ত শুভদিন ; এ-গাঁয়ের ও পার্শ্ববর্তী সমস্ত গাঁয়ের যাত্রীরা এই দিনই যাত্রা করবে।'

বদন উত্তরে বলে,- 'মা, তাহ'লে তুমিও যাবে বলে ঠিক করেছ ? এতে আমি একটুও সুখী নই ; শ্রীক্ষেত্র বড় দূর। যেতে আসতে প্রায় চারমাস লাগবে। পথের কষ্টের আদি অন্ত নেই। শুনে আমার বুক ফেটে যায়। ভাগ্যে-আমাদের কি আছে ?

কথা কয়টি বলেই বৃদ্ধ চাষী ছোট শিশুর মত ডুকরে কেঁদে ওঠে। আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে অলঙ্গ বলে --

'বাবা বদন, কেঁদ না। ধর্মের জন্য যাত্রা করছি, সুখের জন্য নয় ! পথে দেবতারা আমায় রক্ষা করবে, জগন্নাথ আমায় দেখবে। দুঃখ করো না। তাছাড়া কপালে যা লেখা আছে, তা ঘটবেই। বিধাতার লেখা কে খণ্ডাতে পারে ?'

এই সময় কালোমানিক ও গোবিন্দ এসে পড়ে। বদনকে কাঁদতে দেখে তারা চমকে ওঠে। কারণটা শোনার পর কালোমানিক বলে--

'মা, তুমি যদি যাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। রাস্তায় অসুখ করলে, তোমার মুখে জল দেবে কে ? কি করে তুমি একলাটি যাবে ?'

'বাবা, আমি একলা যাচ্ছি না' অলঙ্গ বলে ; 'শুনেছ তো কাঞ্চন-

পুরের আরো ছয় জন মেয়ে যাচ্ছে; ওরাই আমায় দেখাশুনা করবে; সেখুয়াও যত্ন করবে।'

'সেখুয়াকে শত শত যাত্রীর দেখা শুনা করতে হ'বে। আর গাঁয়ের যে ছয় জন মেয়ের কথা বলছ' তারাতে' নিজের নিজের দেখাশুনা করতেই অক্ষম। কাজেই আমাকে তোমার সাথে যেতে দাও মা।'

'তুমি কি করে আমার সাথে যাবে? তুমি গেলে জমি চষবে কে? বদন বুড়ো হতে চলেছে, শরীরও দুর্বল হয়ে পড়ছে, গোবিন্দ এখনো ছেলে মানুষ। সাত রাজার ধন মানিক, তুমিই এ-বাড়ীর একমাত্র সম্বল। তুমি আমার সাথে গেলে ওরা পারবে কি করে? না বাছা, তোমার আমার সাথে এসে কাজ নেই, মহাপ্রভু আমাকে রক্ষা করবেন।'

কথাবার্তায় গোবিন্দ যোগ দিয়ে বলে, 'ঠাক্‌মা! তীর্থে গিয়ে কি দরকার? তুমিত' ঘরে বসেই জগন্নাথের আরাধনা করতে পার। দূরে গিয়ে ভগবানের আরাধনা করার কোন সার্থকতাই দেখতে পাই না। মনে মনে ভগবানের বেশ আরাধনা করা যায়।'

'তুমি পণ্ডিত হয়ে পড়েছ' উত্তরে অনঙ্গ বলে; 'খোঁড়া মহাশয়ের সাথে আলোচনা করে আর বর্ধমানের পাদ্রী সাহেবের বই পড়ে জ্ঞানলাভ করেছ। আমি কিন্তু মূর্খ মেয়ে মানুষ। শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার যথেষ্ট সার্থকতা আছে বলেই আমার ধারণা।

গোবিন্দ সাথে সাথে জবাব দেয়, 'ধরে লওয়া গেল তুমি সত্য কথাই বলছ, তাহ'লেও যাদের সামর্থে কুলায় তাদেরই তীর্থ যাত্রা সাজে। যার উপর সংসারের ভার দিয়ে তুমি কি করে যাবে; আর বৌ-এর কথা বলছ, সে এখনও নিতান্ত শিশু।'

"তা জানি গোবিন্দ; কিন্তু বাড়ীতে আমি কি ই বা করি? তোমার মা আর বৌ সমস্ত কাজ করে? আমি শুধু খাই আর ঘুমাই। আমি গেলে কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। সোনার বৌ পেয়েছ গোবিন্দ। ও দিনরাত কাজ করে। মেয়েটী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ও

কাজের মেয়ে বলেই তীর্থযাত্রা করবার সাহস হচ্ছে। আমার জন্য তোমরা ভেবো না। জগন্নাথ আমাকে রক্ষা করবে। আমাকে বাধা দিয়ো না। যাওয়ার নেশা আমাকে এমন পেয়ে বসেছে যে আমি পাগল হয়ে পড়েছি।"

বাস্তবিক পক্ষে, এক প্রকার ধর্মীয় উন্মাদনাই বৃদ্ধা হিন্দু নারীদের পেয়ে বসে, যার ফলে তারা যত রকমের দুঃখকষ্ট হোক না কেন হাসিমুখে বরণ করে নিতে প্রলুব্ধ হয়। সেথুয়া বা তীর্থযাত্রার গাইড কয়েক দিন ক্রমাগত অলঙ্গ'র সাথে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মহিমা এত বেশী কীর্তন করছে এবং ঐ সমস্ত মন্দির দর্শনের অশেষ পুণ্য কাহিনী এমন সবিস্তারে বর্ণনা করেছে যে, অলঙ্গ'র মনে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। যাত্রার জন্য সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। প্রতিদিন রাতে সে স্বপন দেখে অতুলনীয় মহিমা-মণ্ডিত ঠুঁটো জগন্নাথের রূপ-মাধুরী। কিছুতেই তার তীর্থযাত্রায় বাধা দিতে পারে না। যাত্রার দিন আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ সূর্যোদয়ের অনেক আগে সেথুয়া বদনের বাড়ীতে এসে হাঁকে, 'জগন্নাথজী কি জয়'। উত্তেজনায় সেদিন সারারাত অলঙ্গ'র চোখে ঘুম আসে নাই। পুঁটুলীতে চা'ল, কয়েকখানা কাপড়, ও দু'খানা কাসার পাত্র বেঁধে, কাপড়ের একপ্রান্তে কয়েকটি টাকা বেঁধে তা কোমরে লুক্কায়িত করে প্রিয়জনদের নিকট বিদায় নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সঙ্গে অলঙ্গ পায়ে হেঁটে চলে। প্রতিদিন বিশ-ত্রিশ, এমন কি তার চেয়েও বেশী পথ অতিক্রম করে রাত্রিতে সকলে আড্ডা নেয় চটিতে। সেখানে রান্না করে খেয়ে অধিকাংশ তীর্থযাত্রীকেই রাত কাটাতে হয় উন্মুক্ত আকাশ তলে। সারাদিন পথ হাঁটার পর রাত্রিতে উন্মুক্ত আকাশ তলে নিদ্রা যাওয়ার ফলে অনেক তীর্থযাত্রীকে পথেই ভবের পটোল তুলতে হয়। অলঙ্গ প্রথমে যায় বর্ধমানে, বর্ধমান থেকে চন্দ্রকোনা ও ক্ষিরপাই হ'য়ে যায় মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরে বাংলা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম হ'তে

আগত হাজার হাজার যাত্রী সমবেত হয়ে সকলে একত্রে যাত্রা করে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে। মেদিনীপুর থেকে এরা যায় নারায়ণ গড়ে, সেখান থেকে ছত্রপালে, অতঃপর পাটনা জলেশ্বরে। তারপর রাজঘাটে সকলে সুবর্ণরেখা নদী পার হ'য়ে যায় বালেশ্বরে, অতঃপর পাঁচগড়ে পৌঁছার পর ভদ্রকের নিকট বৈতরিণী পার হ'তে হয়। সেখান থেকে ব্রাহ্মণী ও মহানদী অতিক্রম করে, কটক, গোপীনাথ প্রসাদ, বলবন্ত, শ্রীরামচন্দ্র শাকন এবং হরিকৃষ্ণপুর হ'য়ে সকলে উপনীত হয় মহিমা-মণ্ডিত পুরীধামে।

শ্রীক্ষেত্র বা পুরী সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা দরকার। পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একজন রাজা কঠোর তপস্যা করে। বিষ্ণু-দেবতা তাকে একটি বাক্সে রক্ষিত কৃষ্ণদেবের অস্থিরাশির উপর জগন্নাথের মূর্তি স্থাপনের আদেশ দেন। মূর্তি নির্মাণের ভার পড়ে বিশ্বকর্মার উপর। বিশ্বকর্মা এই সর্তে মূর্তি নির্মাণের ভার গ্রহণ করে যে, তার কাজে বাধা পড়লেই মূর্তি অসমাপ্ত অবস্থায় থেকে যাবে। বিশ্বকর্মা একদিন রাতে নীলাচলের বিশাল মন্দিরটি নির্মাণ করে আস্তে আস্তে জগন্নাতের মূর্তি তৈরী করতে থাকে। পনরদিন যায় তবুও নির্মাণ শেষ হয় না। ধার্মিক রাজা অতিষ্ঠ্য হ'য়ে বিশ্বকর্মা কি করছে তা দেখতে যায়। বিশ্বকর্মা পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত মূর্তি অসমাপ্ত অবস্থাতে রেখেই নিবৃত্ত হয়। কাজেই মূর্তিটীর হাত ও পা নেই। রাজা খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বর্গ থেকে নির্দেশ আসে যে, অসম্পূর্ণ বিগ্রহ বিশ্বখ্যাত হ'য়ে পড়বে। অতঃপর বিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য রাজা দেবতাদের আহ্বান করে। স্বয়ং ব্রহ্মা এসে বিগ্রহকে দৃষ্টি-শক্তি ও প্রাণ-শক্তি দান করে। শ্রীকৃষ্ণের হাতগুলোও বিগ্রহে সংযোজিত হয়। এই অপূর্ব দেবতাকে দর্শনের জন্য দুইলক্ষ যাত্রীর সঙ্গে অনঙ্গ পুরীধামে উপস্থিত হয়।

## চতুর্বিংশ অধ্যায়

### রথযাত্রা

পুরীর মত এমন ছোট্ট জায়গায় এত বেশী জনসমাগম আর কখনো অলঙ্গ'র চোখে পড়েনি। সে অগ্রদ্বীপের "গোপীনাথের' অঙ্গনে হাজার হাজার ভক্তকে আনাগনা বত দেখেছে, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের জনসমাবেশের কাছে তা সমুদ্রের নিকট এক বিন্দু জলের মতই নগণ্য। ভারতের সমস্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন মতাবলম্বী অসংখ্য মানুষ এখানে সমবেত। তবে বৈষ্ণবদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। মূল জগন্নাথ মন্দিরের পাষাণ প্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যে শতাধিক অন্যান্য মন্দির। অধিকাংশ তীর্থ-যাত্রী এই সমস্ত মন্দিরের আশে পাশেই বিচরণ করে। পাপের বেসাতিও এখানে কম নয়। বেশ্যা ও কুলটা নারীর সংখ্যা অত্যধিক। খোদ জগন্নাথ মন্দিরেই বহু নির্লজ্জা কুলটা বসবাস করে।

জগন্নাথের সঙ্গে ভ্রাতা বলরাম ও ভগিনী সুভদ্রাও পূজিত হয়। কাষ্ঠ-নির্মিত প্রত্যেকের বিগ্রহ প্রায় ছয় ফুট উচ্চ। জগন্নাথের রং শাদা, বলরামের কাল আর সুভদ্রা হরিদ্রা বর্ণের। জগন্নাথের হাতটা ঠুঁটো, কিন্তু সুভদ্রার হাত দুটো একেবারে নিশ্চিহ্ন। মোটের উপর হিন্দু দেব-দেবীদের মধ্যে এই তিনটি কাষ্ঠ-মূর্তি সবচেয়ে কুৎসিৎ অর্থাৎ জঘন্যতম। কিন্তু সবচেয়ে কুৎসিৎ হ'লে হবে কি, ভোগ-বিলাস এত-বেশী অন্য কোন ভারতীয় দেবীর ভাগ্যেই ঘটেনি। জগন্নাথের মত নফর-চাকরের সংখ্যা কোন ভারতীয় রাজ-রাজড়াদের ঘরে দেখতে পাওয়া যায় না। অন্ততঃপক্ষে অলঙ্গ যখন পুরীতে যায় তখন জগন্নাথ দেবের অবস্থা এই রকমই ছিল। চাকর-নফরদের পরিবারের

সংখ্যা প্রায় ৫০০০ ; তন্মধ্যে পাচক-পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৪০০। জগন্নাথের দৈনিক ভোগের বরাদ্দ ছিল নিম্নরূপ ; ২২০ পাউণ্ড চাল, ৯৭ পাউণ্ড কলাই ডাল, ২৪ পাউণ্ড মুগ ডাল, ১৮৮ পাউণ্ড মহিষা ঘি, ৮০ পাউণ্ড গুড়, ৩২ পাউণ্ড শাকসব্জী, ১০ পাউণ্ড দই, ২॥ পাউণ্ড মশলা, ২ পাউণ্ড চন্দন কাঠ, কিছু কর্পূর ও ২০ পাউণ্ড লবণ। বড় বড় উৎসবের সময় পূর্বোক্ত ৪০০টি পাচক পরিবারই তীর্থ যাত্রীদের জন্য রান্নায় মনোনিবেশ করে। কারণ এরা প্রায়ই আহার্য দ্রব্য ক্রয় করে থাকে। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় এক লক্ষ তীর্থযাত্রীকে রান্না করা আহার্য সরবরাহ করা হয়। অনেক "মহাপ্রসাদ" নামক শুষ্ক প্রসাদও ঘরে নিয়ে যায়।

অলঙ্গ প্রথমে দর্শন করে স্নান যাত্রা উৎসব। জগন্নাথ মূর্তিকে পাণ্ডারা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত বাইরে নিয়ে এসে এক প্রকাণ্ড বেদীর উপর রাখে। তারপর মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে জগন্নাথের মাথায় জল ঢালা হয়। স্নান ও গা মোছার পর বিগ্রহকে বিস্তর দ্রব্য উপঢৌকন দেওয়া হয় ও শেষে আবার মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়।

অলঙ্গ জগন্নাথ দেবের সবচেয়ে বড় উৎসব রথ-যাত্রাও দর্শন করে। আষাঢ় মাসের নির্দিষ্ট দিনে, জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাকে বাহিরে এনে স্নান করান হয় এবং বিগ্রহ তিনটাকে সিংহাদ্বারে আনয়ন করা হয়। তখন চারিদিকে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি উত্থিত হয়। অতঃপর বিগ্রহ তিনটিকে যত্ন সহকারের রথের উপর তোলা হয়। পাঁচ তলার সমান উচ্চ এই বিচিত্র যানে অনেকগুলি চাকা, গম্বুজও পতাকা দৃষ্ট হয়। জগন্নাথের রথ ৪৩½ ফুট উচ্চ, ৬½ ফুট ব্যাসের ১৬টি চাকা এবং ৩৪½ ফুট বর্গের প্ল্যাটফর্ম এর সহিত সংলগ্ন। বলরামের রথ ৪১ ফুট উচ্চ, চাকার সংখ্যা ১৪টি ; সুভদ্রার রথ উচ্চতার ৪০ ফুট, চক্র সংখ্যা ১৪টি। বিগ্রহ তিনটি রথে স্থাপনের পর সোনার তৈরী হাত, পা ও কান ঐগুলিতে সংযোজিত হয়। অতঃপর রথ টানবার আদেশ

দেওয়ার পর যখন রথ প্রথম চলতে শুরু করে তখনকার দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। লক্ষ কণ্ঠে উত্থিত হয় 'জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ' "হরি বল! হরি বল!" ধ্বনি ও সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত শত শত বাদ্য যন্ত্রও কর্কশস্বরে নিনাদিত হয়। রথ টানার পবিত্র দড়ি স্পর্শের পুণ্যফল নাকি অপরিসীম। তাই রথগুলোর দিকে সব সময়েই জনতার ঠেলাঠেলি। পূর্বে অনেকে স্বেচ্ছায় রথের চাকাতলে পড়ে আত্ম-বিসর্জন করতো নিষ্পিষ্ট হ'য়ে। বৃটিশ সরকার এই জঘন্য আত্মহত্যা প্রথার বিলোপ সাধন করে বড় রকমের কাজই করেছে। রথের উপরেই অষ্টাহ সময় অবস্থান করে বিগ্রহগণ ভক্তদের পূজা ও অর্ঘ্য গ্রহণ করে। নবম দিবসে আবার তারা মন্দিরে ফিরে আসে। মন্দিরে প্রত্যাবর্তনের পর দেবতাদ্বয় ও তাহাদের ভগিনীর ঘুম-পাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই নিদ্রা চলে আষাঢ় মাস থেকে কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত। বিগ্রহদের নিদ্রা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীর্থযাত্রীরাও আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে আরম্ভ করে।

শ্রীক্ষেত্র থেকে ফিরবার পথে তীর্থযাত্রার স্বরূপ আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে। অনবরত অনাবৃত দেহে রোদ-বৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করা, তীর্থক্ষেত্রে অবস্থানের শেষের দিকে অর্থাভাব বশতঃ কদর্য আহার্য গ্রহণ, ঘঁ্যাসাঘেঁসি ভাবে বহুলোকের একত্রে অবস্থানের ফলে জ্বর, আমাশয় ও কলেরায় আক্রান্ত হয়ে বহু তীর্থযাত্রীকে পথিমধ্যেই ভবলীলা সম্পন্ন করতে হয়। পুরীর আশে পাশে অগণিত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুরী থেকে কটক পর্যন্ত রাজপথের দুই পার্শ্বে চিতা ও নরকঙ্কাল চোখে পড়ে। পথিপার্শ্বের চটিগুলো মুমূর্ষু লোকের আর্তনাদে মুখরিত হয়ে পড়ে।

পুরী ত্যাগের সময় হতভাগিনী অলঙ্গ দেহে কলেরার বীজ নিয়েই যাত্রা করে। যাত্রার দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যায় এক চটিতে অবস্থানের সময় তার শরীরে সাংঘাতিক ধরণের কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। চটি-ওয়ালা তাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় না, কাজেই

তাকে পড়ে থাকতে হয় গাছতলায়। সেথুয়া ও সহযাত্রীরা তাকে এই অবস্থায় রেখে প্রস্থান করে। পরদিন ভোর বেলায়, প্রেমভক্ত বৈরাগী ও আত্মরী যে গাছতলায় অলঙ্গ শুয়েছিল, সেখানে আসে। বৈরাগী চিকিৎসা জান্‌তো বলে প্রচার করে বেড়াত। সে অলঙ্গকে কিছু ঔষধপত্র দেয়। কিন্তু কোন ফলই ফলে না। সেইদিন অপরাহ্নেই অলঙ্গ শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। বুদ্ধিমতী ও সচ্চরিত্রা এক বাঙালী কৃষক-নারীর এইরূপ শোচনীয় পরিণতি ঘটে। ধর্মীয় সংস্কার এইরকম কত নর-নারীকে যে জীবনান্ত করেছে বা এখনো করছে, কে তার হিসাব রাখে!

## গেঁয়ে কবিরাজ

'সাঙাত, তোমার বাবার নাকি অসুখ ?' একদিন সকাল বেলায় সদর দরজায় বসে গোবিন্দ হুঁকো টান্‌ছে, এমনি সময় নন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করে।

'হাঁ, কাল সন্ধ্যাবেলায় মাঠ থেকে সাংঘাতিক জ্বর নিয়েই বাড়িতে ফিরেছে। সারারাত জ্বর ভোগ করেছে, এখন পর্যন্ত জ্বর ছাড়ে নি।

'তোমার একটু যত্ন নেয়ার দরকার; কারণ এবার সমস্ত জ্বরই বেয়াড়া ধরনের দেখা যাচ্ছে। বৈদ্য ডাকবে নাকি ?'

'এখনই কি দরকার ? আমার মনে হয়, জ্বর এমন সাংঘাতিক নয়; দু-একদিন লঙ্ঘনা দিলেই সেরে যাবে।'

সত্যি কথা বলতে কি, পাড়াগাঁয়ে এই হচ্ছে সনাতনী দস্তুর। প্রথমতঃ জ্বর রোগে আদৌ ঔষধ সেবন করা হয় না; তবে রোগীকে কিছুই খেতে দেওয়া হয় না। মাঝে সাজে দু-এক ফোঁটা জল, তা-ও দেওয়া হয় রোগী যখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে। দু'দিন হয়ে গেছে জ্বর ছাড়বার নাম গন্ধ নাই। প্রতিদিনই জ্বরের প্রকোপ বেড়ে চলেছে, রোগীও ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবস্থা যে শোচনীয় আকার ধারণ করেছে, তা কালোমানিক ও গোবিন্দ দু'জনেই বুঝতে পারে। কাজেই এক্ষুণি কবরেজ ডাকার প্রয়োজন। কিন্তু পাড়া-পড়শীর কথায় আরো একদিন অপেক্ষা করতে হয়। পল্লীবাসীর বিশ্বাস, জ্বরের প্রথম তিন দিন কবরেজ ডাকৃতে নেই। কাজেই চতুর্থ দিন সকালে কালোমানিক গাঁয়ের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মৃত্যুঞ্জয় কবরেজকে

ডেকে আনে। বাংলার কবরেজদের 'শতমারা', 'হাজার মারা', ইত্যাদি বলে যে খ্যাতি আছে, মৃত্যুঞ্জয় সেই ধরনেরই একজন নামজাদা কবিরাজ।

অনেক রোগীই এর হাতে অক্কা পেয়েছে। কিন্তু এই অকিঞ্চিতকর ব্যাপারে, প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসক হিসেবে তার নাম-যশের একটুও লাঘব ঘটে নি। তর্কচ্ছলে বলা হয়, প্রকৃত দাওয়াই বাৎলানোই হচ্ছে চিকিৎসকের একমাত্র দায়িত্ব; সে ত' আর ভাগ্যলিপি রদ করতে পারে না। কোন রোগীর কপালে যদি লেখা থাকে, নির্দিষ্ট কোন এক রোগে তার মরণ হ'বে, তাহ'লে, পৃথিবীতে এমন কোন ডাক্তার নাই যে সে—এমন কি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরিও সে রোগ সারাতে পারে। মৃত্যুঞ্জয়ের স্টকে যে সেরা ও দুষ্প্রাপ্য ঔষধ পত্র মজুদ আছে, তা সকলেই স্বীকার করে থাকে। পঞ্চমূল, দশমূল, অষ্টাদশমূল পাচন, ধাতুঘটিত রসসিন্ধু, নানাপ্রকার গোক্ষুর সাপের বিজ, এবং নানারকমের তেল তার কাছে পাওয়া যায়। কিন্তু লেবরেটরির সমৃদ্ধিই তার একমাত্র খ্যাতি-প্রতিপত্তির উপকরণ নয়। কবরেজী শাস্ত্রের দুরূহতম বিষয়, ধাতুজ্ঞান বা নাড়ীজ্ঞানও তার এত বেশি যে কাঞ্চনপুর থেকে বহু মাইলের মধ্যে এমন কবরেজ পাওয়া যাবে না। রোগ-বিশ্লেষণেও ইনি সিদ্ধহস্ত। রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে তাঁর নাকি মোটেই ভুল হয় না, তবে দুঃখের বিষয় রোগ সারাতে তিনি খুব কমই পারেন। সংস্কৃত চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়ে তাঁর নাকি এই অসাধারণ জ্ঞান জন্মেছে। এই সমস্ত গ্রন্থে রোগ আরোগ্য লাভের যে-সমস্ত উপায় বাৎলান হয়েছে, তা অভ্রান্ত বলেই কবরেজ মশায়দের বিশ্বাস। ঐশী অনুপ্রেরণা বলে স্বয়ং মহাদেব নাকি ঐ সমস্ত পুঁথি লিখে গিয়েছেন। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান, বিশেষতঃ ইউরোপীয় চিকিৎসা-প্রথা তিনি ঘৃণার চোখেই দেখেন। ইউরোপীয় ডাক্তাররা যে ভারতীয় জ্বর আদৌ বুঝতে পারে না, সে-কথা তিনি প্রায়ই বলে থাকেন। তবে অস্ত্র-চিকিৎসায় ইংরেজ ডাক্তারদের

শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও সেটা চিকিৎসকদের কাজ নয়, নাপিতদের জাত ব্যবসা—এ কথা বলে তিনি প্রচুর আত্ম-প্রসাদ উপভোগ করে থাকেন।

এই সর্বগুণ-যুত চিকিৎসক প্রবরের একটা মাত্র ত্রুটি—তিনি প্রথম শ্রেণীর আফিমখোর বা অহিফেনসেবী। প্রথম প্রথম মটর-প্রমাণ ডোজ নিয়ে অহিফেন-সেবনে হাতে খড়ি দিলেও মাত্রা বাড়তে বাড়তে এখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, যে-পরিমাণে তিনি আফিম গিলে থাকেন, তাতে একটি ঘোড়া অনায়াসে মৃত্যু লাভ করতে পারে। পাঁড় আফিম-খোর বলে তিনি প্রায়ই জাগ্রত অবস্থায় থাকেন না ; পাঁচ মিনিট উঠে-বস্‌লেই চোখ অর্ধ-নিমীলিত হয়ে পড়ে। পাড়াগাঁয়ে ডাক্তার কবরেজের ফি খুব বেশি নয়—ঊর্ধ্ব পক্ষে এক টাকা,কিন্তু তাতেই রোগ সারাতে হবে ঔষধ-পত্র দিয়ে, সময় যতদিনই লাগুক না কেন। কাজেই কবরেজ মহাশয়ের অর্থ কষ্ট লেগেই আছে। কিন্তু ডাল-ভাত জুটুক আর না-ই জুটুক, প্রতি-দিন আফিমের নির্দিষ্ট ডোজটি কিন্তু চাই-ই। কারণ মৌতাতের সময় আফিমের ডোজটি পেটে না পড়লে চিকিৎসক-মহাশয়ের প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। এ-হেন খ্যাতনামা কবিরাজ বদনের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করে।

বদনের নাড়ী পরীক্ষা করে কবিরাজ মহাশয় প্রথমে ব্যবস্থা করেন দশমূল পাঁচনের, পাঁচনে ফল না হওয়ায় তিনি আরো নানা প্রকারের মিক্‌শ্চার ও বড়ি প্রয়োগ করেন। তাতেও জ্বরের উপশম হয় না। কবিরাজ মহাশয় এবার প্রয়োগ করেন রসসিন্ধু। রসসিন্ধুও ব্যর্থতার সমুদ্রে হাবুডুবু যায়। আতঙ্ক-গ্রস্ত পরিবার শান্তি স্বস্ত্যয়নের জন্য কুল-পুরোহিত রামধন মিশ্রের শরণাপন্ন হয়, পুরোহিত-প্রবর যথারীতি মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন, তবুও সর্বনাশা জ্বর বেড়েই চলে। কবিরাজ মহাশয় রাগে অগ্নিশর্মা হ'য়ে নানা প্রকার বিষ এবং শেষ পর্যন্ত পাশুপাত অস্ত্র, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ হুঁকাওয়ালার গুঁড়ো'ও

প্রয়োগ করেন। বর্ধমানবাসী জনৈক হুঁকা-বিক্রেতা এই ঔষধ আবিষ্কার করে বলে ওর ওরকম নাম হয়েছে। শেষোক্ত বিষটি প্রয়োগের পর বদনের অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ হ'য়ে পড়ে। সে প্রলাপ বকতে আরম্ভ করে। আরোগ্য লাভের আর কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। একদিন সন্ধ্যায়, ঘরের মধ্যে যাতে প্রাণ বিয়োগ না হয়, সেই উদ্দেশ্যে, বদনকে উঠানে তুলসী তলায় বের করা হয়। সেখানেই বাড়ির লোকের উচ্চ ক্রন্দন-ধ্বনির মধ্যে বদন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সেদিন রাতেই 'নারায়ণশীল' নামক পুকুরের পাড়ে বদনের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়। কারণ, হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে, বাসিমরা করা নাকি মহাদোষ।

# ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

## সংসারের পথে

শিশুকাল ও বাল্যবয়স সত্য সত্যই মানব-জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়। নাই চিন্তা, নাই ভাবনা, শুধু খাওয়া-দাওয়া ও স্ফুর্তি—জীবন প্রবাহ একটানা সুখের স্রোতেই ভেসে চলে। সংসারের ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রকোপ একটুও সইতে হয় না।

গোবিন্দ'র জীবনও এই রকম সুখে শান্তিতে এতদিন কেটে এসেছে। ভদ্র ও বিলাসী জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সম্ভোগ অদৃষ্টে তার না জুটলেও, মাত্র ডাল-ভাত ও শাক্‌সব্‌জী, দু'এক টুক্‌রো ছোট মাছ ও হাঁটু-কাপড় প'রেও কি সে কম আনন্দ উপভোগ করেছে? প্রকৃতির খোলা ময়দানে ও ধানের মাঠের বিশুদ্ধ বাতাসে স্বচ্ছন্দ বিচরণের ফলে তার দেহ ও মন দুই-ই তাজা ও শক্তিশালী হওয়ার অবসর পেয়েছে। লেখা-পড়া শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'লেও মনটা তার দূষিত ও পশুভাবাপন্ন হ'তে পারে নি। আদিম-যুগ-সুলভ এই রকম জীবনের ওকালতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বাল্য ও শৈশব আরো উন্নততরভাবে পরিচালন অবশ্যই সম্ভব। সে-রকম পরিবেশ, শুধু আমাদের দেশে কেন, দুনিয়ার বহু দেশে এখনো সম্ভব হয় নি। বাংলার অধিকাংশ চাষীর বাল্য জীবন যে এই ভাবে এখনো কাটছে, তা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

শুধু বাল্য ও শৈশব নয়। বিবাহিত জীবনেও বহুদিন ধ'রে গোবিন্দ একটানা সুখ-সম্ভোগ করতে পেরেছে। দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে বিয়ের সঙ্গে নানা ধরনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা এসে পড়লেও

বাংলার অবস্থা সে রকম নয়। গোবিন্দর বিয়ে হয়েছে, ছেলে-পিলের বাপও হয়েছে, তবুও স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের লালন-পালনের কোন দায়িত্বই তাকে পালন করতে হয় নি। পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছিল বদনের ঘাড়ে। পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির সেই ছিল মালিক। জমির ফসল, শাক্‌-সবজী, ইত্যাদিতে যা কিছু আয় হ'ত, সবই থাকৃতো তার হাতে। সময় মত খাজনা দেওয়া, অভাব অনাটন পড়লে মহাজনের কাছে কর্জ করা, ইত্যাদি সমস্তই তাকে করতে হ'ত। সংসার চালানোর কোন ভাব্‌নাই ভাব্‌তে হ'ত না গোবিন্দচন্দ্রকে।

অলঙ্গকেও সংসারের কম ঝক্কি পোহাতে হ'ত না। এ নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হ'ত প্রায় বদনেরই মত। বদন সব সময়েই মায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করতো। অলঙ্গর অভিজ্ঞতা ও সাধারণ বুদ্ধিও ছিল যথেষ্ট। এক কথায় সে-ই ছিল গৃহের কর্ত্রী। এজন্য সুন্দরী কোনরকম মানসিক অশান্তি যে ভোগ করতো না তা আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু সবদিকেই এখন পরিবর্তন ঘটেছে। বদন ও অলঙ্গ দু'জনেই এখন এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে। হিন্দু রীতি-নীতি অনুসারে সংসারে মোড়লী করার ভার অবশ্যই কালোমানিকের গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু তার বুদ্ধি অল্প ব'লে সে এই দায়িত্ব নিতে পারে না। কাজে কাজেই গোবিন্দকেই সংসারের ভার গ্রহণ করতে হয় এবং সুন্দরীকে নাম্‌তে হয় গৃহিণীর ভূমিকায়।

গোবিন্দ এখন এই চাষী পরিবারের কর্তা, বাড়ি ঘরের অবস্থা পূর্বেকার মতই রয়েছে। বড় ঘরে গোবিন্দ থাকে তার স্ত্রী ছেলে-পিলে নিয়ে; রান্নাঘরের ভেতরে কালোমানিক রাত্রি যাপন করে। গোয়ালঘরের অবস্থা পূর্বেকার মত। বদন ও অলঙ্গ সংসারের মায়া কাটিয়েছে, আহ্লরী তার পুণ্যাত্মা প্রেমিক প্রেমভক্তের সঙ্গে সুখে কালাতিপাত করছে, মালতী রয়েছে শ্বশুরালয়ে। সংসারে এখন

রয়েছে, গোবিন্দ, তার মা সুন্দরী, পত্নী যাদুমণি ও কাকা, আইবুড়ো জীবনের সুখ-সম্ভোগকারী কালোমানিক।

জমিজমারও কোন পার্থক্য ঘটে নি ; পিতা যে সব জমিতে চাষ আবাদ করতো, পুত্রও সেই সমস্ত জমিই কর্ষণ করে। পিতা উত্তরাধিকার স্বরূপ কিছু ঋণও রেখে গিয়েছে, তার পরিমাণ সে যথেষ্ট বাড়িয়েছে পিতা পিতামহীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। এই ঋণ সত্য সত্যই ভয়াবহ ; সুদের হার টাকা প্রতি মাসিক ছ'পয়সা, অর্থাৎ বছরে শতকরা সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা। পল্লীর মহাজনদের চোখে অবশ্য এই সুদের হার মোটেই বেশি নয়।

# সপ্তবিংশ অধ্যায়

## কাঞ্চনপুরের জমিদার

একদিন সকালবেলায় গোবিন্দ বাড়ির দুয়োরের সাম্‌নে ব'সে চিন্তান্বিতভাবে তামাক টানছে, এমন সময়, এক হাতে একটা মোটা বাঁশের লাঠি ও আরেক হাতে এক টুক্‌রো কাগজ নিয়ে একজন লোক এসে তাকে ডাক দেয়। লোকটা অত্যন্ত ঢ্যাঙা, পুরা ছয় ফুট উঁচো, তা-দেওয়া সুন্দর এক জোড়া মুচ্‌, ঘন দাড়ি চিরুণী দিয়ে আঁচড়িয়ে উপর দিকে তোলা হয়েছে। তার বেশভূষা ও আকার দেখে স্পষ্ট মনে হয়, লোকটা বাঙালী নয়, পশ্চিমা। লোকটার নাম হনুমান সিং, কাঞ্চনপুরের জমিদারের পাইক; খাজনাপত্র আদায় করা ও প্রজাদের গোমস্তার কাছে হাজির করা এর একমাত্র কাজ।

'হনুমান সিং তোমার হাতে কি?"—গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করে।

'এই কাগজে তোমার মাথটের বরাদ্দ লিখা আছে। আসছে ফাল্গুন মাসে জমিদারের ছেলের বিয়ের জন্য প্রত্যেক রায়তের কাছে এই মাথট আদায় করা হ'চ্ছে?'

'মাথট! রক্ষা কর! জমিদারের খাজনা বাকী পড়েছে, বাবা ঠাকুরমার শ্রাদ্ধের জন্যে অনেক দেনা করে ফেলেছি। মাথট দি-ই কি ক'রে?'

'খুব বেশি টাকা তোমাকে দিতে হবে না; আর এ একবার বৈ-তো নয়? জমিদারের ছেলের তো আর হরদম বিয়ে হচ্ছে না? তোমাকে ও আর সমস্ত রায়তকে, তালুকদারের কাছে যে খাজনা দাও, তার প্রত্যেক টাকায় দু'আনা হিসেবে মাথট দিতে হবে। তুমি বছরে

খাজনা দাও চল্লিশ টাকা; কাজেই পাঁচ টাকা এমন কিছু হাতী ঘোড়া নয়।'

'বল্‌বো কি মশায়! এখন মাথট বা আবওয়াব দেওয়ার মত অবস্থা আমার নয়। যাদের অবস্থা ভাল তারা স্বচ্ছন্দে এই রকম কর যোগাতে পারে। বড় কষ্টে পড়েছি; কাজেই জমিদার এখন আমার কাছ থেকে এ সমস্ত প্রত্যাশা করতে পারেন না। পাঁচ টাকা খুব বেশি নয় বলছো? পাঁচটা কড়িও দিতে পারি না।'

'কিন্তু দিতেই হবে। তোমার জমিদারের হুকুম। ভিক্ষে করে হোক, বৌ-এর গায়ের অলঙ্কার বাঁধা দিয়ে হোক বা থালা বাসন বিক্রি করে হোক, এই পাঁচ টাকা তোমাকে যোগাড় করতেই হবে।'

'যাও, গোমস্তাকে গিয়ে বল, আমি দিতে পারবো না।'

'বেশ মজার লোক তো! বাপের চেয়ে বেশি চালাক হয়ে পড়েছ। তোমার বাবা জমিদারের সমস্ত মাথট নিয়মিতভাবে শোধ করতো। এস, পাঁচ টাকা দিয়ে দাও।'

'তোমার সঙ্গে কি ঠাট্টা করছি হনুমান সিং? ঘরে পয়সা নাই। সমস্ত বাড়ি তল্লাস করলে পাঁচটা পয়সাও পাবে না। জমিদারকে গিয়ে বল, যখন জুটবে তখন দিব; এখন দিতে পারি না।'

'বেশ, ভাল কথা; তা হ'লে নিজেই জমিদারের কাছে বলে এস। যদি ইচ্ছে করে না যাও, তবে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম আছে।'

প্রতিরোধ করে কোনই ফল হ'বে না বুঝতে পেরে গোবিন্দ যেতে রাজী হয়। হুঁকোটা রেখে দিয়ে কাঁধে গামছা ফেলে হনুমান সিংয়ের সঙ্গে সে যায়।

গাঁয়ের মধ্যে জমিদার বাড়ি সব চেয়ে ভাল ও সব চেয়ে বড়। সদর দরজা দক্ষিণ দিকে। প্রকাণ্ড শাল কাঠের দুয়োর, দুয়োরের উপর চুন-বালি ও সিমেণ্টের তৈরি প্রকাণ্ড সিংহ মূর্তি। গেট্ পার হয়ে পড়তে হয় ষাট বর্গফুট প্রকাণ্ড চত্বরে। চত্বরের উত্তরে প্রকাণ্ড

হল, আর পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে ছোট ছোট কামরা। এই অংশটাকে বলা হয় কাছারি বাড়ি। হলটা জমিদারের কাছারি; মেঝেয় সতরঞ্চ পাতা, মাঝখানে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে জমিদার স্বয়ং বসে থাকেন, কিছু দূরে দূরে দেওয়ান, গোমস্তা, প্রভৃতি নিজের নিজের আসনে হাজির থাকে। কাছারি বাড়ির পর দালান বাড়ি বা বাহির বাড়ি। এখানে ঠাকুর পূজা এবং নাচগান ইত্যাদি হয়। বাহির বাড়ির পর জমিদারের অন্দর মহল অবস্থিত।

গোবিন্দ সিংহদ্বার অতিক্রম ক'রে, হল ঘরের দুয়োরের সামনে যায় ও গলায় কাপড় দিয়ে জমিদারকে প্রণাম করে। জমিদার লোকটা বিরাট বপুর অধিকারী, সাধারণ বাঙ্গালীর তুলনায় ঢের লম্বা ও সেই অনুপাতে মাংসল। সিংহের মত মাথা তুলেই সে শুয়ে আছে। উজ্জ্বল বড় বড় ঘূর্ণায়মান চোখদুটো দিয়ে যেন বিদ্যুতের রশ্মি ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। কাঞ্চনপুরের সবচেয়ে শক্তিশালী চাষীও স্বীকার করেছে যে, ঐ দুই ভীষণ চোখের সামনে দাঁড়াবার উপায় নেই। গলার আওয়াজও গুরু-গম্ভীর। রেগে গেলে তো কথাই নেই। একেবারে বাজপড়ার মত প্রচণ্ড নাদ উত্থিত হয়। মাথার চুল মধ্যে মধ্যে রূপালী আভা ধারণ করায়, বেশ বোঝা যায়, বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। জয়চাঁদ রায় চৌধুরী ( এই হচ্ছে কাঞ্চনপুরের জমিদার বাবুর নাম ) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জমিদার নয়। বর্ধমানের মহারাজার অধীনে সে পত্তনি তালুক ভোগ করে। কিন্তু পত্তনীদার হলেও সে কাঞ্চন-পুর ও পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামে জমিদার নামেই পরিচিত। কাঞ্চনপুর গ্রামের জন্য সে মহারাজকে মাত্র ২০০০্ টাকা দেয়। কিন্তু প্রায় সে এর তিন গুণ আদায় করে। তার সমস্ত জমিদারী বা পত্তনীর জন্য মহা-রাজাকে ৮০ হাজার টাকা দেয়, কিন্তু নিজে সে যে বৎসরে লাখ দুই টাকা মুনাফা ভোগ করে তা সে নিজের মুখেই স্বীকার করেছে। জুলুম ও জোর-জবরদস্তি ক'রেই এই বিরাট মুনাফার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট কথা, জয়চাঁদ এমন এক শ্রেণীর জমিদারদের অন্তর্ভুক্ত

যাদেরকে দেশের সব চেয়ে বড় অভিশাপ বলা যেতে পারে। লোকটা ইংরেজী শিক্ষার ধার ধারে না, সংস্কৃতেও একেবারে অনভিজ্ঞ; কেবল-মাত্র নিজের মাতৃভাষাতেই কথা বলতে পারে; কাজেই সে মূর্খ লোক। এই মূর্খতার সঙ্গে তার প্রকৃতিগত স্বার্থপরতা সম্মিলিত হওয়ায় লোকটা প্রজাদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূতেই পরিণত হয়েছে। এমন কোন অপকর্ম নেই যা করতে সে পশ্চাদ্‌পদ। ছলেবলে কৌশলে ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে সে সাধ্যমত রায়তদের শোষণ করে। তার অত্যাচারে অনেক প্রজা সর্বস্বান্ত হয়েছে। জাল জুয়াচুরি ক'রে বহু গরীব লোকের সে লাখেরাজ কেড়ে নিয়েছে, নিজে হিন্দু হ'লেও ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মোত্তরে পর্যন্ত হাত দিয়েছে। সকলেই তাকে ভয় করে চলে। তার নাম নেয়ার সময় প্রজারা অভিসম্পাত না করেই পারে না। সকলেই তার ভয়ে এত দূর প্রকম্পিত যে, লোকে বলে, সে বাঘে গোরুকে এক ঘাটে জল খাইয়ে থাকে। এ হেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার বাবুর সামনে গোবিন্দকে আজ করযোড়ে ও গললগ্নকৃতবাসে দাঁড়াতে হয়েছে।

'ওটা কে হে?' জয়চাঁদ চৌধুরী তার দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করে।

'বদনের ছেলে গোবিন্দ সামন্ত,'—দেওয়ান উত্তর দেয়।

'যোগ্য সন্তান বটে। ও কি চায়?'

সামনে এগিয়ে হনুমান সিং বলে, 'মহারাজ! হুজুরের ছেলের বিয়ের জন্য মাথট দিতে সে অস্বীকার করেছে। কাজেই ওকে খোদা-বন্দের সাম্‌নে হাজির করেছি।'

'মাথট দিতে অস্বীকার করেছে! আমার এমন রায়ত কি কেও আছে, যার এতবড় বুকের পাটা যে আমি যে মাথট বসাব তা দিতে সে অস্বীকার করবে? তুমি না বল্‌লে সে বদন সামন্তের ছেলে? বদন ছিল একজন সেরা ও আজ্ঞাবহ রায়ত। ও কি তার নিজের ছেলে? তার মাথায় এই সমস্ত বদ্‌বুদ্ধি কে যোগালে?'

দেওয়ান তখন ফিস্ ফিস্ করে প্রভুর কানে কানে বলে যে, সে শুনেছে, ছেলেবেলায় গোবিন্দ খোঁড়া পণ্ডিতের পাঠশালায় কিছুদিন পড়েছে। গোবিন্দর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জমিদার বলে, 'ও তুমি পণ্ডিত হয়েছ, তোমার চোখ ফুটে গিয়েছে, সেইজন্য মাথট দিতে চাও না। আমি রামরূপকে বারণ করে দেব সে যেন চাষীদের ছেলেকে না পড়ায়, যদি না শোনে, তাহ'লে ঐ মূর্খটার আর এক-খানা ঠ্যাং ন্যাংড়া করে দেব।'

গোবিন্দ আস্তে আস্তে বলে, ''ধর্মাবতার! আমি দিতে অস্বীকার করি নি। অস্বীকার করার সাধ্যও আমার নাই। মাত্র বলেছি এখন দিতে অক্ষম। বাবা ও ঠাকুরমার শ্রাদ্ধ-শান্তির জন্য অনেক টাকা দেনা করে ফেলেছি; হুজুরের খাজনাও শিগ্‌গীর দিতে হ'বে। যখন পারবো, তখন মাথট দেব।'

'চোপরাও! মুখ সাম্‌লে কথা বল! এই আমার হুকুম। তিন দিনের মধ্যে তোমাকে মাথট শোধ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে দিতে না পারলে, তোমাকে হাতাসাই ক'রে এখানে নিয়ে আসা হবে। একথা মনে রেখো। দেওয়ান, লোকটাকে আমার সাম্‌নে থেকে নিয়ে যাও।'

বাংলার রায়তকে জমিদাদের এই রকম অত্যাচারের মধ্যেই কাল কাটাতে হ'য়েছে। এ-অবস্থার এখন অবসান হয়েছে। দুর্গত বাংলার রায়তরা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পেয়েছে।

# অষ্টবিংশ অধ্যায়

## কামারশালায় রাজনৈতিক বৈঠক

সন্ধ্যাকাল। সূর্যমামা অনেক আগেই আগুনের রথে চড়ে সুমেরু পাহাড়ের পেছনে চলে গিয়েছেন। গোরুগুলো মাঠ থেকে ফিরে আসার পর তাদের গোয়ালঘরে আট্‌কে রাখা হয়েছে; পাখীরাও আত্মগোপন করেছে আপন আপন বাসায়। কাঞ্চনপুরের মেয়েরা ঘরে সাঁজবাতি দেখিয়ে ভূত প্রেতদের বিতাড়িত করছে; চাষীরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর আপন আপন দাওয়ায় বসে তামাক টানছে, আর না হয় নৈশ ভোজনের উদ্যোগ করছে। কুবের ও তার ছেলে নন্দ কিন্তু তখনো দিনের বেলার মতই কার্যরত; নিশীথ রাত ছাড়া তাদের কাজ থেকে ফুরসৎ নেই। দিনের বেলায় ছোট খাটো কাজের ফরমায়েশ নিয়ে যে সমস্ত লোক এসেছিল, তাদের মধ্যে কেহই এখন না থাক্‌লেও, বন্ধুরা এসে তাদের স্থান দখল করেছে সন্ধ্যাবেলায় গল্প-গুজবের জন্যে। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব আসুক আর নাই-ই আসুক, পিতা ও পুত্র কোন সময়েই তাদের কাজে অবহেলা করে না। সিনিয়র ও জুনিয়র কর্মকার উভয়েই ব'সে লৌহখণ্ড পিট্‌তে ব্যাপৃত। ঘরের মধ্যে মাদুরের উপর চার পাঁচ জন লোক বসে। পিটুনী শেষে লৌহ-খণ্ডকে আবার হাপরে দেওয়ার পর কপিল নন্দকে বলে—'আজ সকালে গোবিন্দকে জমিদারের কাছারিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; শুনেছ কি? জমিদার তাকে এই বলে শাসিয়েছে যে, তিন দিনের মধ্যে মাথট না দিলে তাকে হাতকড়া দিয়ে জমিদারের কাছে হাজির করা হবে।'

'হাঁ, সাঙাত জমিদার বাড়ি থেকে ফিরবার পর আমাকে তা বলেছে। গরীবের উপর এইভাবে অত্যাচার করা বড়ই লজ্জার কথা। আমার তো মনে হয় না, সাঙাত এতে মাথা নোয়াবে। জমিদারের ছেলের বিয়ে হ'লো তো আমাদের কি? ও তার নিজের ব্যাপার। আমরা খরচ যোগাবো কেন?'

'কিন্তু মাথট না দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হ'বে? জমিদার বড়লোক; তার হাতে একদল লেঠেল আছে। বন্ধুর মত গরীব মানুষের পক্ষে ওর সঙ্গে টোক্কর দেওয়া পোষাবে কি করে?'

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে হাতুড়ীটা হাতে নিয়ে নন্দ বলে, 'ইচ্ছে হচ্ছে, জমিদারের মোটা ভুঁড়ির উপর এই হাতুড়ীর এক ঘা বসিয়ে দিয়ে তাকে একেবারে যমের বাড়িতে পাঠিয়ে দিই। তার ছেলের বিয়েতো আমাদের কি? কোম্পানি বাহাদুর যে খাজনা বেঁধে দিয়েছে, আমরা তাই মেনে চল্‌বো।'

বিদ্রূপের হাসি হেসে চতুর নাপিত বলে, "সাবাস্ নন্দ! তুমি মস্ত বড় বীর পুরুষ দেখছি! ঘরের কোণায় বীরত্ব দেখাচ্ছ? তুমি দেখছি আস্ত 'তালপাতার সিপাই'—অমন বীর সবাই হ'তে পারে। এই যে গোবিন্দ আসছে।'

গোবিন্দ—'সাঙাত! তুমি বড়ই অসাবধান। জান না, চারিদিকে জমিদারের চর ঘুরে বেড়াচ্ছে? এক্ষুণি যা বল্‌লে, তা যদি কোন শত্রু লাগিয়ে দেয়, তাহলে তোমার অবস্থা কঠিন হ'য়ে পড়বে। অত জোরে কথা বলো না; মনে হচ্ছে, পেছন দিক থেকে কেও আড়ি পেতে শুন্‌তেও তো পারে।'

নন্দ—'জমিদারের কাছে লাগায় লাগাক, আমি তা গ্রাহ্যও করিনে। এরকম অত্যাচার সহ্য করা অসম্ভব। জমিদারের অত্যাচারের সীমা নাই। মাথার উপরে কি ভগবান নাই? তার অত্যাচারে রায়তদের হাড়মাস ভাজা হয়েছে। পৈতে হাতে নিয়ে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্মণেরা জোরগলায় তাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

এখন আমাদের ধর্মঘট করে অন্যায় মাথট দেওয়া বন্ধ করা উচিত। কি বল সাঙাত ?'

গোবিন্দ—'সাঙাত, যা বল্‌ছো তা সবি সত্য। ইহা সাংঘাতিক অত্যাচার নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরা কি করতে পারি ? জমিদার ধনী ও শক্তিশালী, আমরা গরীব। আমরা তার সঙ্গে কি করে লড়বো ?'

নন্দ—'তাহলে, বোঝা যাচ্ছে, তুমি মাথট দিতে চাও।'

গোবিন্দ—'এতে আমার কোনই হাত নাই। যদি মাথট না দিই, সে অত্যাচার করবে, বোধ হয় জেল দেবে, ঘরে আগুন লাগাতেও পারে। সুবিচার পাওয়া অসম্ভব হবে।'

নন্দ—'আমি বলি, উপরে কি কেউ নাই ? সে কি শয়তান জমিদারকে শাস্তি দিবে না ?'

গোবিন্দ—'বিশ্বাস করি, দেবতারা দুষ্ট লোকদের শাস্তি দেয়। কিন্তু এ জীবনে আমরা তা দেখতে পাই না। খুব সম্ভব; জমিদার পরজন্মে শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু এ-জীবনে যে সে শাস্তিভোগ করবে তার কোন উপায়ই দেখ্‌ছি না।'

কপিল—'ঠিক বলেছ বন্ধু ! জমিদারকে বাধা দিয়ে কাজ নাই। যেমন করে হোক মাথটটা দিয়ে দাও। বলবানের সঙ্গে এটে উঠ্‌তে পারবে না।'

মদন—'এই অন্যায় মাথটের আমার মত বিরোধী আর কেহই নয়। আমাদের উপর এই কর বসানোর কোন অধিকারই জমিদারের নাই। কিন্তু আমরা তার বিরুদ্ধে লড়বো কি ক'রে ? কাজেই আমার মতে, শান্তভাবে মাথট দিয়ে দেওয়াই ভাল।'

নন্দ—'ধর্মঘট করলে হয় না ?'

গোবিন্দ—'মুখে বলা সোজা ; কিন্তু কাকে নিয়ে ধর্মঘট করবে ? গাঁয়ের সব লোক কি আমাদের মতে সায় দিবে ? যদি আমরা মাথট দিতে অস্বীকার করি তাহ'লে গাঁয়ের পনর আনা লোক

জমিদারের ভয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিবে না। তা কি জান না? পাঁচ ছ'জন লোকের ধর্মঘটে কি যায় আসে? সাঙাত, তুমি খুব সাহসী, তবে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি অত্যন্ত অল্প।'

বোকারাম—'ধর্মঘট ফর্মঘট বুঝি না। এইটুকু মাত্র জানি মাথট না দিলে আমাদের সর্বনাশ হ'বে। তাছাড়া, অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করাও নিষ্ফল। অদৃষ্টের বলে, সে হয়েছে জমিদার আর আমরা হয়েছি রায়ত। কাজেই ন্যায্য, অন্যায্য যা-ই হোক তার জুলুম আমাদেরে মেনে চল্‌তেই হ'বে।'

নন্দ—'বেশ বলেছ বোকারাম! তুমিই প্রকৃত বীর পুরুষ। সাবাস! সাবাস!'

বোকারাম—'ঠাট্টা করে লাভ নাই। তোমার ও আমার মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখি না। কথার বেলায় তুমি পাহাড়-পর্বৎ, কাজের বেলায় সরষে প্রমাণ। জানি, তোমার বাবা নিশ্চয়ই মাথট দিবে। কাজেই বড়াই করে লাভ কি?'

নন্দ—'আমার বাবা হয় তো মাথট দিতে পারে, কিন্তু তাতে আমার মত নাই। সে পরিবারের কর্তা, যা খুশি তাই করতে পারে। কিন্তু সে মাথট দিক, তাতে আমার মত বদলাবে না। এই যে মানিক খুড়ো আস্‌ছে। গোবিন্দর মাথট দেওয়ায় তার যদি সম্মতি থাকে, তবে ভুল বুঝেছি বলতে হয়। কি বল, মানিক খুড়ো?'

মানিক—'কোন ব্যাপারে নন্দ? এখন আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রে বিরক্ত করো না। একটু দম মেরে নিই।'

কালোমানিক যখন ঘরের ভেতর প্রবেশ করে, গোবিন্দ তখন তামাক খাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে খুড়ার হাতে হুঁকোটা দেয়। কালো-মানিক হুঁকোয় মুখ লাগিয়ে এমন জোরে তিন-চার টান মারে যে কল্‌কেটা ফেটে পড়বার উপক্রম হয়। তারপর নন্দ'র দিকে মুখ ফিরিয়ে কোন বিষয়ে সে প্রশ্ন করছিল, তা জান্‌তে চায়।

নন্দ—'সর্বনেশে মাথট ছাড়া আর কি হ'তে পারে, মানিক খুড়ো। তুমি মাথট দিচ্ছ কি না তা জানতে চাই।'

কালোমানিক—'এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করাই ভুল। মাথট হচ্ছে সবচেয়ে অন্যায় জুলুম। আমি মোটেই এতে মাথা নোয়াতে রাজী নই। মজার কথা! তার ছেলে বিয়ে করবে, আর খরচ যোগাতে হ'বে গরীব আমাদের? গরীব রায়তদের ছেলের বিয়ের সময় কে খরচ যোগায়? জমিদার এককড়ি দেয় কি? উপরন্তু সে বিয়ের সময় সেলামী নেয় না কি? জগতের নিয়মই এমনি! তেলা মাথায় ঢাল তেল, গরীবের মাথা অতেলাই থেকে যাক।'

নন্দ—'বেশ বলেছ, মানিক খুড়ো। তোমার সঙ্গে আমি একমত। অবিচারের কাছে আমাদের মাথা নোয়ানো উচিত নয়।'

কালোমানিক—'আমিও বলি তাই। গোবিন্দ কিন্তু বাপের মত শান্তিপ্রিয় লোক, ইতিপূর্বেই মাথট দিবে বলে সে স্থির করেছে। জমিদারের হুমকিতে সে ভয় পেয়েছে। আমি যদি হ'তাম তো কক্‌খনো জমিদারের কাছারিতে পা মাড়াতাম না, আর যে-ই ধরতে আসুক, তার মাথাটা ফাটিয়ে দিতাম।'

গোবিন্দ—'কিন্তু কাকা, তা কি বোকামির একশেষ হ'তো না? মাথট আদায় যে অন্যায় ও অত্যাচারমূলক, সে সম্বন্ধে আমিও তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি? তুমিই বা কি করতে পার? যদি জমিদারের কোন চাকরকে মারি, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমাকে জেল খাটতে হবে। জলে বাস করে কি কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে? জমিদারের সঙ্গে বনিয়ে চলাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। যদি বাধা দিই, সর্বস্বান্ত হব।'

চতুর—'বিজ্ঞ মানুষের মতই কথা। দুর্বল ও গরীব আমরা জমিদারের বিরুদ্ধে কি ক'রে লড়তে পারি? বামন হ'য়ে কি ক'রে চাঁদে

হাত দিই। মাথট দেওয়ার সিদ্ধান্ত ক'রে গোবিন্দ জ্ঞানবানের কাজই করেছে।'

কালোমানিক—'তোমরা সবাই আমাকে বল, গোঙার, বুদ্ধিশুদ্ধি নাই। বেশি চালাক যারা তারা রজ্জুকে সাপ বলে ভুল করে—এই প্রবাদ বাক্যটা তোমরা নিশ্চয়ই জান। আমি তোমাদের মত জ্ঞানের ধার ধারি না। আমি শুধু দেখতে চাই কোন লোকটা আমার কাছে মাথট নিতে আসে। তাকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিব না? খুব সম্ভব তাকে একেবারে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিব।'

গোবিন্দ—'একটু বুঝে-সুঝে কাজ ক'রো কাকা। সাহস দেখাতে গিয়ে আমাদের সর্বনাশ করতে পার। গাঁয়ের মধ্যে তুমি সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে বলবান; কিন্তু তুমি তো আর একলা একশ' জনের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না। জমিদার আমাদের বিরুদ্ধে পাঁচ শ' লোক জড় করতে পারে।'

কালোমানিক—'আমার সম্বন্ধে ভয় করো না, ভাই-পো। আমি বোকা নই, তোমাদের সর্বনাশ হয়, এমন কাজ কখনই করবো না।'

গোবিন্দর বন্ধু কপিল এতক্ষণ চুপ করে বসে এই সমস্ত কথাবার্তা শুনছিল। সে বলে, 'কোম্পানি বাহাদুর আমাদের উপর যে এই সমস্ত অত্যাচার হ'তে দিচ্ছে, তা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? কোম্পানি বাহাদুরের শাসন মুসলমান শাসনের চেয়ে অনেকাংশে ভাল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা মুসলমান শাসনের তুলনায় খারাপ দেখা যাচ্ছে কেন? প্রজাদের উপর শয়তান জমিদারদের এই সমস্ত অত্যাচার তারা চোখ বুজে সহ্য করছে কেন?'

চতুর—'কপিল! তুমি আস্ত ছাগল দেখছি! তুমি মনে করছো, কোম্পানি বাহাদুর আমাদের ভাল মন্দ সম্বন্ধে চিন্তা করে? একটুও নয়। নিয়মিতভাবে জমার তঙ্কা আদায়ই তাদের এক-

মাত্র ধাপ্পা। জমিদার যতদিন নিয়মিতভাবে সদর জমা শোধ করে ততদিন কোম্পানি বাহাদুর ভুলেও জিজ্ঞাসা করে না, কি ভাবে এবং কি পরিমাণে সে খাজনা আদায় করেছে। রায়তদের সর্বনাশের জন্য কোম্পানি বাহাদুর জমিদারদের হাতে 'সপ্তম' ও 'পঞ্চম, অস্ত্র যোগায় নি কি ?'

গোবিন্দর মিতা মদন বলে, 'বুড়োদের মুখে কিন্তু প্রায়ই শুনেছি, কোম্পানি বাহাদুর দয়ালু ও ন্যায়-বিচারক। তাহ'লে তারা জমিদারদের দ্বারা রায়তদের উপর এতটা অত্যাচার সহ্য করে কেন ? প্রজাদের বুকের রক্ত দিয়েই জমিদাররা সদর জমা শোধ করে থাকে।'

গোবিন্দ—'ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, কোম্পানি বাহাদুর ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ব'লেই জমিদারের মধ্যেও সততা ও মনুষ্যত্ব আছে এই ভেবেই তারা আইন-কানুন করেছে। জমিদারেরা যে এমন শয়তান হ'তে পারে, তা তারা ভাবতেও পারে নি।'

রসময়—'কিন্তু দু'একজন ভাল জমিদারও তো থাকতে পারে ?'

নন্দ—'এ রকম জমিদারের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। শতকরা নিরানব্বই জন, এমন কি তার চেয়েও বেশি জমিদার গরীব প্রজাদের সর্বস্ব লুটে নেয়। মা ধরিত্রী এখনও যে কেন এই শয়তানদের কোলের উপর রেখেছেন তা বুঝতে পারি না।'

গোবিন্দ—'সব সময়েই চড়া সুরে কথা বল, সাঙাত ! কোন কাক হয়ত উড়ে যেয়ে জমিদারের কানে সমস্ত কথা বলে দেবে।'

নন্দ—'আমি তা কেয়ার করি না।'

এই সমস্ত কথাবার্তার পর অনেকক্ষণ ধরে তাস খেলা চলে। প্রায় দুপুর রাতে আমাদের পল্লী-রাজনীতিবিদরা যে যার বাড়িতে প্রস্থান করে।

## ঊনত্রিংশ অধ্যায়

### জমিদারের অত্যাচার

মাথট দিবে কিনা তা নিয়ে গোবিন্দ বিশেষভাবে চিন্তা করে! বাড়িতে এ সম্বন্ধে মা ও কাকার সঙ্গেও তার আলোচনা হয়। মা মত দেয় মাথটের পক্ষে; কাকা দেয় বিপক্ষে। আলোচনার সময় কালোমানিক জমিদারকে 'পত্নীর ভ্রাতা', 'শয়তান', ইত্যাদি সুমধুর শব্দে আপ্যায়িতও করে। গোবিন্দর শ্বশুর পদ্মলোচন পালও জমিদারের সঙ্গে বিরোধ বাধাতে গোবিন্দকে বারণ করে। গোবিন্দ শেষ পর্যন্ত স্থির করে যে, মাথট সে অবশ্যই দিবে, তবে দেওয়ার সময়, মাথট যে ন্যায়-সঙ্গত নয়, ইহা যে অত্যাচার-মূলক, তাহাও পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিবে।

নির্দিষ্ট দিনে জমিদারের পাইক হাজির হয়, গোবিন্দও ট্যাঁকে মাথটের বরাদ্দ বেঁধে নিয়ে জমিদারের কাছারিতে উপস্থিত হয়। গলায় গামছা জড়িয়ে সে জমিদারের উদ্দেশে মাটিতে দণ্ডবৎ করে। দেওয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করে:—

'সামন্ত তাহ'লে মাথট নিয়ে এসেছ?'

গোবিন্দ—'দেওয়ান মহাশয়, যদি মাপ করতেন, তা'হলে বড়ই উপকৃত হ'তাম। আমার বিস্তর দেনা!'

জমিদার—'পাজি নচ্ছার! এখনো মুখে মাপের কথা? তোর বাপ ছিল ভাল লোক। শুধু তারি খাতিরে তিন দিন সময় দিয়েছি। দেরি করার জন্য, আর তুই যে অন্যান্য প্রজাদের মানা করে বিষম ক্ষতি করেছিস্, সেজন্য তোকে শাস্তি দিতে চাই।

গোবিন্দ—'ধর্মাবতার! আমি মাথট দিতে কাউকে বারণ করি নি।'
জমিদার—'হারামজাদা! তুই নিশ্চয়ই চেষ্টা করেছিলি; আমি সব শুনেছি। রাত্রিতে মিটিং করে কি এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিস্ নি? তুই কি ঐ সভায় আমাকে ভয় দেখাস্ নি?
গোবিন্দ—'হুজুরকে ভয় দেখানোর মত কোন কথাই বলি নি।'
জমিদার—'তুই বলেছিস, পাজি! যদি অস্বীকার করিস্, জুতোপেটা করবো। তাহলে কি বলতে চাস, আমাকে গালি গালাজ দিয়ে রাত্রিতে মিটিং করিস নি?
গোবিন্দ—'মাথট সম্বন্ধে বা হুজুরকে গাল দেওয়ার জন্য কোন মিটিং হয়েছে বলে জানি না।'
জমিদার—'দু'রাত আগে, কুবের কামারের দোকানে তুই কি ছিলি নি? আমাকে গাল দিস্ নি?
গোবিন্দ—'সেদিন রাতে ওখানে ছিলাম, প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি সেখানে যাই। কিন্তু কোন মিটিং তো হয় নি। দোহাই ধর্মাবতার! আপনাকে আমি মোটেই গাল দিই নি।'
জমিদার—'আবার বলি, যদি অস্বীকার যাস্, জুতোর বাড়ি খাবি।
দেওয়ান এই সময় বলে,খুব সম্ভব গোবিন্দ গাল দেয় নি, অন্য কেহ দিয়েছে, গোবিন্দও তাতে সায় দিয়েছে।
জমিদার—'না,আমার বিশ্বাস এই পাজিটাই আমাকে ভয় দেখিয়েছে। আচ্ছা, যদি সে না ক'রে থাকে, তবে বলুক কে করেছে।
ন্যায়-ধর্মের অবতার এই জমিদারের কাছে বন্ধুদের নাম বলা উচিত নয় মনে ক'রে সে বলে যে কেহই তাকে গাল দেয় নি। জমিদার ইতিপূর্বে কারুর মুখে অতিরঞ্জিত বিবরণী শুনেছেন। তখন রাগে অধীর হয়ে সে গোবিন্দকে মারতে উদ্যত হয়। দেওয়ান ছোট লোকের গায়ে হাত তুলে হাত কাল করতে জমিদারকে নিরস্ত ক'রে গোবিন্দকে মাথট দিয়ে সরে পড়তে বলে। গোবিন্দ ট্যাঁক থেকে মাথটের বরাদ্দ খুলবার সময় বলে, "আমি মাথট দিচ্ছি, কিন্তু এই

রকম কর ধার্য করা ন্যায়-সঙ্গত নয়, ইহা কোম্পানি বাহাদুরের আইনেরও বাইরে।' জমিদার আর রাগ সামলাতে পারে না। সে হাতে একপাটি চটি তুলে নিয়ে গোবিন্দর অঙ্গে আঘাত করে ও সঙ্গে সঙ্গে নিম্নরূপ ভাষায় গালি বর্ষণও করে, 'শালা, পাজী নচ্ছার, আমার উপর অন্যায়-বিচারের অভিযোগ! চাষা ভূত, আবার আইনের কথা বলে। আমাকে কর্তব্য শেখাতে এসেছিস? জুতিয়ে মুখ খাটো করে দেবো। তোর হয়েছে কি? এইতো শুরু হ'লো। তোর এমন সর্বনাশ করবো, শেয়াল কুকুর তোর দুঃখে কাঁদবে। জমিদারের এই প্রচণ্ড রাগের মুখে সে আর কিছু বলতে সাহস করে না। বাঙালী রায়তের পক্ষে সে সত্যসত্য চরম দুঃসাহসই দেখিয়েছে। অপমান নীরবে সহ্য করেই সে কাছারি থেকে বেরিয়ে যায়।

জমিদার ও দেওয়ান তখন মাথট নিয়ে গাঁয়ে যে বিক্ষোভ এসেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে। উভয়েই কালোমানিককে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্তা করে। সে-ই গাঁয়ের মধ্যে বেশি বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। শাস্তি দিতে হ'বে। তবে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে? জমিদার কালোমানিককে ডেকে আনার জন্য হনুমান সিংকে পাঠিয়ে দিতে বলে। দেওয়ান বলে, একা হনুমানের সাধ্যে তা কুলাবে না, অন্ততঃপক্ষে বার জন লোককে পাঠাতে হবে। জমিদার বলে, আগে এক জনকে পাঠান যাক। তারপর অন্য ব্যবস্থা করা হবে।

হনুমান সিং কালোমানিককে খুঁজতে খুঁজতে মাঠে উপস্থিত হয়। কালোমানিক তখন আখের খেতে জল দেয়। সে শক্ত ভাষায় অস্বীকৃতি জানায়।

পশ্চিমবঙ্গের আগুরী সম্প্রদায়টা চিরদিনই সাহসী ও স্বাধীনতা-প্রিয় ব'লে প্রসিদ্ধ। গোবিন্দর অপমানে কাঞ্চনপুরে আগুরী চাষীদের মধ্যে সাংঘাতিক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ গোবিন্দকে জুতো মারার ব্যাপারে সকলেই বিশেষভাবে অপমানিত বিবেচনা

করে। মাঠ থেকে ফিরে এসে কালোমানিক যখন ঘটনাটা শুনে তখন সে ক্রোধে অধীর হ'য়ে পড়ে। মুখে যা আসে তাই বলে সে জমিদারকে গাল দেয়। আগুরীরা সকলেই গোবিন্দের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে। কিন্তু গাঁয়ে তাদের সংখ্যা মাত্র পঁচিশ ঘর। একা তারা কি করতে পারে? অন্যান্য চাষীরা জমিদাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো স্বপ্নেরও অগোচর বলে মনে করে। তা'ছাড়া ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তখন জমিদারের হাতে অসীম ক্ষমতা দিয়েছিল। তখনকার জমিদাররাও ছিল, অত্যাচার ও অনাচারের মূর্তিমান বিগ্রহ। কাজেই চুপ থাকা ছাড়া আর উপায় কি? কালোমানিক কিন্তু প্রতিশোধ নেবার জন্য অস্থির হ'য়ে পড়ে। সে কাজকর্ম ত্যাগ করে সারাদিন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়; গোবিন্দ খুল্লতাতের এই ভাবান্তর দেখে তাকে প্রশ্ন করে, কিন্তু কোন জবাব না পেয়ে, সে-ও নীরবতা অবলম্বন করে।

এই হতভাগ্য কৃষক পরিবারের দুর্ভোগের এখানেই শেষ নয়। একদিন রাতে গোবিন্দ ও বাড়ির মেয়েরা সকলেই নিদ্রিত, কালোমানিক অর্ধ জাগরিত অবস্থায় বিছানায় শুয়ে এদিক ওদিক করছে, কতকটা গরমের চোটে আর কতকটা বা মশার অত্যাচারে, এমন সময় বাড়ির কুকুর বাঘা খুব জোরে ঘেউ ঘেউ শব্দ করে ওঠে। বাঘা সাধারণতঃ নিশীথ রাতে অত জোরে চিৎকার করে না; কাজেই কালোমানিক মনে করে হয়তো চোর ঢুকেছে। বাঘার সুর ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর হ'তে থাকায় সে আর নিশ্চেষ্ট থাক্‌তে পারে না। সে বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে দুয়োর খোলে ও আস্তে আস্তে বাড়ির পেছনে গলিতে যায়। গলিতে ঢুকতেই সে দেখে, দু'জন লোক তার পাশ দিয়ে দৌড়ে পালায়। চাঁদ তখনো দিগন্ত রেখার পেছনে একেবারে আত্মগোপন করে নি। লোক দু'জনের মধ্যে এক জনকে সে বেশ চিন্‌তে পারে। লোকটা জমিদারের লেঠেল-সর্দার ভীমে কোটাল। কালোমানিক জোরে চেঁচিয়ে বলে, 'ভীমে! ভীমে!

চোর! চোর!' কিন্তু নিশীথ রাতে কে আর তার ডাকে সাড়া দেয়। পাড়া-পড়শীরা সকলেই ঘুমের ঘোরে অচেতন। প্রথমে সে মনে করে, লোক দু'টোকে তাড়া করবে। কিন্তু তারা তখন পুকুরের পাড় দিয়ে আম-বাগানের ভেতর বহু দূর চলে গিয়েছে। কাজেই পিছু নেওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে সিঁধ কেটেছে কিনা তা দেখবার জন্যে বড় ঘরের পেছনের দিকে সে যায়। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যেতেই ঘরের চালে আগুন দেখে সে ভয়ে শিউয়ে ওঠে। গোবিন্দ, তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের কি ক'রে বাঁচাবে এই ভাবনাতেই সে প্রথমে অস্থির হ'য়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে বড় ঘরের দুয়োরে লাঠির আঘাত করে চেঁচিয়ে বলে, 'গোবিন্দ! গোবিন্দ! উঠে পড়! উঠে পড়! আগুন! আগুন! বাড়িতে আগুন লেগেছে।' দুয়োরে আঘাত ও মাথার উপর চালে আগুনেরর চড় চড় শব্দে গোবিন্দ চমকে উঠে। এক লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে সে পত্নীকে ঘুম থেকে জাগায় ও দু'জনে ছেলেমেয়েদের কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কালোমানিক বেগে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে কাপড় চোপড় মূল্যবান যা কিছু হাতের কাছে পায় তা বের করে এনে উঠানে রাখে। তারপর সে প্রতিবেশীদের বাড়ির সামনে গিয়ে চেঁচায়, 'আগুন! আগুন! ওগো পাড়ার লোক উঠে পড়!' পাড়ার অনেকেরই ঘুম ভেঙে যায়। তারা ছু'টে এসে আগুন নিভাতে চেষ্টা করে। বহু চেষ্টা করেও বড় ঘরের আগুন নিভান সম্ভব হয় না। তবে অন্যান্য ঘর ও গোরুগুলো রক্ষা পায়।

আগুন লাগার সংবাদ গাঁয়ের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, গ্রামের সকলেই ঘটনাস্থলে আসে। সকলেই মুখে সহানুভূতি জানায়; কিন্তু কাজের বেলায় কেহই কিছু করে না। বড় ঘরখানাকে শেষ করে আগুন থেমে যায়। সেদিন বাড়ির সকলে উঠানেই রাত কাটায়। নন্দ কর্মকার, কপিল সূত্রধর, মদন মুদী, গোবিন্দ'র শ্বশুর পদ্মলোচন ও আরো কয়েকজন আগুরী এই বিপন্ন পরিবারের নিকট বসে থাকে।

বড় ঘর থেকে কালোমানিকই যে দু'চারটে জিনিস বের করে এনেছিল ; তাছাড়া আর কিছু এরা রক্ষা করতে পারে নি। ঘরের প্রায় সমস্ত জিনিস ও মূল্যবান দলিলপত্র সমস্তই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কালোমানিক সকলের কাছে রাতের ঘটনা বিবৃত করে। সকলেই তখন বুঝতে পারে যে, জমিদারের প্ররোচনায় তার লেঠেল-সর্দার ভীমা কোটালই গোবিন্দের ঘরে আগুন দিয়েছে। পরদিন সকালে কালোমানিক ফাঁড়িদারের কাছে গিয়ে ভীমা কোটালের নামে ঘরে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে। ফাঁড়িদার তদন্তে এলে পর, ডজনখানেক লোক এক বাক্যে বলে, ভীমা কোটাল তিন দিন থেকে গ্রামে অনুপস্থিত। কাজেই ফাঁড়িদার খোদাবক্স, তদন্ত ডিস্‌মিস্ করে ; জমিদারের অনুরোধক্রমে মন্তেশ্বরের দারোগার কাছে রিপোর্ট পর্যন্ত দাখিল করে না। গ্রামের লোক সকলেই জমিদারের কারসাজি বুঝতে পারে। আগুরীদের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। কালোমানিক রাগে দাঁতে দাঁত ঘষে, প্রতিশোধ নেওয়ার দারুণ তৃষা তার মনকে মথিত করতে থাকে।

# ত্রিংশ অধ্যায়

## গ্রাম্য মহাজন

জমিদারের কৃপায় পুড়ে-ছাই-হওয়া বড় ঘরখানা যে কি করে আবার তৈরি করা যায়, গোবিন্দ সেই চিন্তায় অস্থির হ'য়ে পড়ে। শুধু মাটির দেওয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে, বিচালির ছাউনী, বাঁশের কাঠামো, তালের খুঁটি ও তীর সবই আগুনের পেটে গিয়েছে। পঞ্চাশ-ষাট টাকার কমে ঘরখানা খাড়া করার উপায় নেই। কিন্তু এত টাকা গোবিন্দ কোথায় পাবে? তার হাতবাক্সে, বাক্‌স খালি রাখতে নেই ব'লে, মাত্র একটা টাকা ও কয়েকটি পয়সা আছে। গোবিন্দ তো গরীব চাষী; সঙ্গতিশালী চাষীদের ঘরেই কি কাঁচা টাকা থাকে? চাঁদী বল্‌তে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের অলঙ্কার ছাড়া কোন জিনিস বড় একটা থাকে না। মরাই বা ধানের গোলা, বিচালির পালা, গোরু ও বলদ, এই নিয়েই রায়তের সম্পত্তি। অর্থাভাব উপস্থিত হ'লে মহাজনের লোহার সিন্দুকই রায়তের একমাত্র সম্বল। এদের সুদের হার অবশ্যই বেশি; সেইজন্য, সুদখোর মহাজন ব'লে এদের দুর্নামও আছে। জমিদার ও মহাজন, দু'জনেই বাংলার রায়তদের শোষণ করেছে। তবে জমিদারদের মত মহাজনেরা অত্যাচার করতে পারে নি। পল্লী অঞ্চলে মহাজনদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে এবং তার স্থান দখল করছে সমবায় ঋণদান সমিতি। কিন্তু চাষীদের অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হয় না। জমিদারশ্রেণী কিন্তু বিলুপ্ত হয়েছে।

বাড়ি পোড়ার পরদিন গোবিন্দ তার মহাজনের বাড়িতে

এই বাড়ি কুবেরের কামারশালা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। গোবিন্দর মহাজনের নাম, গোলক পোদ্দার, জাতিতে সুবর্ণ বণিক। জাতিতে স্বর্ণকার না হ'লেও সোনা রূপার অলঙ্কার তৈরিই তার প্রধান ব্যবসা। খুব ভাল অলঙ্কার গড়তে পারে বলে বহুদূর পর্যন্ত তার সুনামও আছে। তার দোকানে কয়েকজন কারিগব রয়েছে, সে তাদের কাজকর্ম দেখা-শুনা করে। সোনা ও চাঁদির কেনাবেচাও সে করে, আর চালায় সুদের কারবার। বর্ধমান শহরেও তার দোকান আছে, তার দুই ছেলে সেই দোকান চালায়। গাঁয়ের লোক তাকে গাঁয়ের শ্রেষ্ঠ ধনী বলে প্রচার করলেও তার বসতবাটী ও হাল-চাল দেখলে তা কেউ মনে করতেই পারে না। বাড়ি উঁচো পাকা প্রাচীরে ঘেরা থাকলেও ভেতরে সমস্তই মেটে ঘর। নিজের ও পরিবারের লোকজনের জন্য সে খুব কম খরচ করে, পাল পার্বণও খুব কম পালন করে; ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও ভিখারীদের ভিক্ষে দিতেও সে নারাজ; এইজন্য পল্লীবাসীরা তাকে পয়লা নম্বরের কৃপণ বলে মনে করে। সকালে উঠে কেউ তার নাম মুখে আন্‌তে চায় না এই জন্যে যে, এতে নাকি সেদিন আর মুখে অন্ন উঠবার কোন উপায়ই থাকবে না; তা-সত্ত্বেও গোলক পোদ্দার বেশ সম্ভ্রান্ত লোক, কৃপণ হলেও সে লোককে ঠকায় না।

গোবিন্দ মহাজনের বাড়িতে প্রবেশ করে দেখে মহাজন তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীরের বারান্দায় মাদুর পেতে বসে কষ্টিপাথরে এক টুকরো সোনা কষে দেখছে। সামান্য একখানা ধূতিতে দেহের নিম্নাংশ আবৃত, উপরের অংশ অনাবৃত, বয়স পঞ্চাশের উপর। মাথা উঁচু করে, চোখ থেকে চশমা নামিয়ে গোবিন্দর দিকে দৃষ্টিপাত করে সে বলে,—

'আরে, সামন্ত যে! খবর কি? কাল রাতে তোমার বড় ঘর-খানা পুড়ে গিয়েছে শুনে বড়ই দুঃখিত হয়েছি। ঘরখানার সবই পুড়ে গিয়েছে?'

গোবিন্দ—'সমস্তই, পোদ্দার ম'শায়। একটুও খাড়া নেই। সব

পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছে।'

গোলক—'এমন পাজী কাজ কে করলো ?'

গোবিন্দ—'কি আর বল্‌বো ম'শায় ? গরীবের উপর সব সময়েই অত্যাচার। যে সময় আগুন লাগে ঠিক সেই সময় আমার কাকা ভীমা কোটালকে আর একটা লোকের সঙ্গে আম বাগানের দিকে ছুটে পালাতে দেখেছে।'

গোলক—'ভীমা কোটাল ! এ-সম্বন্ধে ফাঁড়িদারকে জানিয়েছ ?'

গোবিন্দ—'হাঁ, কাকা জানিয়েছে। কিন্তু জানেন তো, ফাঁড়িদার জমিদারের মুঠোর মধ্যে। জমিদারের লোকজন সাক্ষ্য দিয়ে বলে, ভীমে তিন দিন আগেই পাঁচ মাইল দূরে তার শ্বশুর বাড়িতে চ'লে গিয়েছে। এইভাবে সমস্তই চাপা দেওয়া হয়েছে, এর কোন রিপোর্টও মন্তেশ্বরের দারোগার কাছে দাখিল করা হয় নি। গরীব লোক আবার সুবিচার পায় কবে ?'

গোলক—'ও, ব্যাপারটা তা হ'লে এই রকম, সামন্ত। দুনিয়াটা বড়ই খারাপ, এ-জীবনে কতই না দেখলাম। এই জন্যেই চাষের জন্য কোন জমি করি নি, কোন জমিদারের ত্রী-সীমানা মাড়াতে চাই নি।'

গোবিন্দ—'আপনার ঘরে সোনা-রূপা আছে; আপনার না হয় জমি-জমা না করলেও চলে। কিন্তু চাষী আমরা আর কি করতে পারি ? জমিই আমাদের জীবন।'

গোলক—'তা সত্য। এখন কি করতে চাও ?'

গোবিন্দ—'বাড়ি যে পুড়িয়েছে, তাকে শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে কিছুই করবার নেই। তবে ঘরে ছাওনি তো দিতে হ'বে। এর-বেলায় আপনি ছাড়া আর কে আছে ? আপনি সত্য সত্যই আমার অন্নদাতা।'

গোলক—'সামন্ত ! তুমি আগে থাকৃতেই অনেক টাকা ধার নিয়েছ, যদিও টাকা আদায়ের জন্য আমি কখনও আদালতে যাইনে,

তাহ'লেও তো টাকা শোধ দিতে হ'বে। তুমি কি করে আবার টাকা ধার নিতে চাও ?'

গোবিন্দ—'কিন্তু ধার না করেই বা কি করে চলি ? তাহ'লে আমার বৌ-ছেলে কি রাতে খোলা মাঠে শুয়ে থাকবে ? আপনি টাকা না দিলে ঘর তুলবার কোন উপায়ই নেই।'

গোলক—'আচ্ছা দেখা যাক্ ; কত টাকা চাও ?'

গোবিন্দ—'ষাট টাকা না হ'লে চলবে না।'

গোলক—'ষাট টাকা ! এত টাকা কিসে লাগবে ? দেওয়াল মেঝে সবই ঠিক আছে, কতকগুলো খুঁটিও হয়তো আছে। তাছাড়া তোমার পালায় যথেষ্ট বিচালি রয়েছে, পুকুর পাড়ে কয়েক ঝাড় বাঁশও আছে। আমার মনে হয়, ত্রিশ টাকাতেই বেশ চল্‌বে।'

গোবিন্দ—'ষাট টাকার এক কড়ি কম হ'লেও চল্‌বে না। সমস্ত খুঁটি পুড়ে ছাই হয়েছে,পালায় যে বিচালি আছে তাতে বছর ধরে গোরু বলদের খোরাকেই টানাটানি পড়বে ; পুকুর পাড়ের বাঁশগুলো কাঁচা, তাতে ঘরের কাজ চলবে না।

গোলক—'টাকা তোমাকে নিশ্চয়ই দিতে পারি ; কিন্তু ভাবছি কি জান, আগেকার দেনার সুদ আর এই দেনার সুদ এক সঙ্গে তোমার পক্ষে টানা দুষ্কর হ'বে। জানতো, মাসে ফি টাকায় দু'পয়সা সুদ দিতে হ'বে।'

গোবিন্দ—'সুদের বোঝা নিশ্চয়ই ভারী হবে। কিন্তু তা ছাড়া রোগের যে অন্য কোন দাওয়াই নাই ; যেমন করে হোক, টান্‌তেই হ'বে।'

গোলক পোদ্দার তমশুক লিখে ও তাতে গোবিন্দ ও দু'জন সাক্ষীর নাম সই নিয়ে গোবিন্দকে টাকা গুণে দেয়। টাকা পাওয়ার পর গোবিন্দ ও কালোমানিক অবিলম্বে কাজে হাত দেয়। নন্দ কর্মকার ও কপিল সূত্রধর বিনা পারিশ্রমিকে তাদের গৃহ নির্মাণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

জমিদার ঘর পুড়িয়ে গোবিন্দকে যথেষ্ট শাস্তি দেয় নিশ্চয়ই ; কিন্তু যে গরীব লোকটি বড়লোক জমিদারের কথায় ও তার প্রভুত্ব অটুট রাখার জন্য আর একজন গরীবের যে সর্বনাশ করলো সে কি পুরস্কার পেল ? প্রবল-প্রতাপ জমিদার তাকে মাত্র দুই তঙ্কা বক্‌শিশ দেয়। ভীমা কোটাল তাতেই মহা সন্তুষ্ট ! সে ত্রিশ জন অনুচর লেঠেলকে নিয়ে পল্লীর শুঁড়িখানায় সস্তায় ধেনো মদ ও মুড়ি, ফুটকড়াই,পাটালি, ইত্যাদি চাট খেয়ে আনন্দে ধেই ধেই করে নাচে। গাঁয়ের লোক বুঝতে পারে যে, ঘর পোড়ানোর জন্য জমিদারের বক্‌শিশ পেয়ে ওরা এমন স্ফুর্তি করছে।

# একত্রিংশ অধ্যায়

## দুর্গানগরের নীল-কুঠিয়াল

দুর্গানগরে মালতীর শ্বশুর বাড়ির অনেকদিন খোঁজ-খবর নেওয়া হয় নি। এই কৃষক পরিবারে তেমন কোন ঘটনাও ঘটে নি এতদিন, মাত্র মালতীর ছেলে যাদবের অন্নপ্রাশনের সময় যা একটু ধূমধাম হয়েছিল, এই পর্যন্ত। এই কৃষক পরিবারের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বদনেব শ্রাদ্ধোপলক্ষে মালতী কাঞ্চনপুরে বাপের বাড়িতে এসেছিল, এসে বেশি দিন বাস করতে পারে নি। দুর্গানগরে এই কৃষক দম্পতি মোটের উপর সুখেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করছিল। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রেম-ভালবাসাও ছিল, কিন্তু তাহ'লে হবে কি? সংসারে নাকি কারুর অদৃষ্টে একটানা সুখ থাকে না। তাই মালতী ও মাধব উভয়ের জীবন আর একদিক দিয়ে দুর্বিষহ বোঝা হয়ে পড়েছিল; মালতীর দুঃখ, মধুর-ভাষিণী শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে নিয়ে। বৌ ও কন্যার উপর তার গালি-গালাজের ধারা অবিশ্রান্ত-ভাবে ও একটানা গতিবেগেই ব'য়ে চল্‌তো। বাস্তবিকপক্ষে, স্বামী ও পুত্র না থাক্‌লে, শাশুড়ীর অত্যাচারে মালতী কোনদিন আদুরীর মত বৈষ্ণবী হ'য়ে বিদায় নিত। কিন্তু দাম্পত্য প্রেম ও স্নেহের বাঁধন তাকে শ্বশুর-গৃহের সাথে আট্‌কিয়ে রাখে, মধ্যে মধ্যে শাশুড়ীর বাক্য যন্ত্রণার বিষ অবশ্যই সহ্য করতে হয় তাকে। মাধবের দুঃখটা কিন্তু অন্য ধরনের; তার ব্যথাটা নীলডাঙ্গার নীল কুঠিয়ালের সাথে তার সম্পর্কের ভেতরে।

নীলডাঙ্গা একেবারে নীলের মাঠ না হ'লেও নীলের আড্ডা-স্থল

বটে। নীলকে কেন্দ্র করেই এই গ্রাম গড়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে একে গ্রাম বলাও চলে না; নীলকুঠি ও তার আশে-পাশে বুনো কুলিদের কুটীর এই নিয়েই নীলডাঙ্গা। বুনো কুলিরা প্রধানতঃ ছোট নাগপুর ও সাঁওতাল পরগনার আদিম বাসিন্দা; এরা নীলকুঠিতে কাজ করে। কুঠিয়াল সাহেবের বাস-ভবনটা কিন্তু চমৎকার; প্রকাণ্ড অঙ্গন ও তার ভেতর দিয়ে দু-পাশে দেবদারু বৃক্ষ-শোভিত চওড়া রাস্তা। দেবদারু জাতীয় আরো নানা প্রকার গাছ ইংরেজরাই এ-দেশে আমদানি করে। সাহেবের বাসভবন বা কামরার সামনে নীল তৈরির বিরাট কুঠি; কুঠিটা ঘিরে বুনো কুলিদের জঘন্য কুটীর-শ্রেণী। কুঠিয়াল সাহেবের নাম জন মারে, অবশ্য খোদ মালিক নয়, কুঠির ম্যানেজার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে সে কাজ করে। মালিক হচ্ছে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগো কন্সার্ন', কোম্পানিটি বাংলার সবচেয়ে বড় ইণ্ডিগো-কোম্পানি, বিলাতের বাজারে এই কোম্পানিই সব চেয়ে বেশি নীল যোগায়। বাংলার রায়ত প্রায়ই ইংরেজী নাম ভালভাবে উচ্চারণ করতে পারে না, সেইজন্য জন মারেকে তারা 'মারি' সাহেব বলে ডাকে। মারি শব্দটার অর্থ বেত-মারা বা মহামারীও বটে। মারে সাহেবের সঙ্গে আশে পাশের চাষীদের যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তাতে এই রকম নামকরণ সার্থকই হয়েছে। সে প্রায়ই শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে কুলি ও রায়ত-দের প্রহার করে, আদর ক'রে সে এই চাবুকের নাম রেখেছে 'গদাধর'। এজন্য ও আরো পাঁচরকম কারণ বশতঃ লোকে তাকে মহামারীর মতই ভয় করতো। মিঃ মারের বয়স, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর, নীলের মাঠে মাঠে ঘোরাফিরার জন্য রংটা একটু রোদ-পোড়া গোছের। সকাল সাতটায় ছোট হাজরী, অর্থাৎ চা, রুটি ও আধ সিদ্ধ ডিম খেয়ে সে হাতে চিরসাথী 'গদাধরকে' নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ে ও মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে বেলা দশটায় কুঠীতে ফিরে আসে। এইবার সে বসে বিচারের গদিতে, কুলি ও রায়তদের আরজি শুনে

রায় দান করে। বেলা একটার সময় সে প্রাতরাশ গ্রহণের সময় অনেকখানি ক্ল্যারেট্ ও ব্রাণ্ডি পান করে। বিকেল বেলায় অনেকটা সখ ক'রে আবার ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ে ও রাত আটটার সময় বাসায় ফিরে এসে ডিনার খায়। রায়তদের সে জোর ক'রে নীলের চুক্তিতে আবদ্ধ করে, গরীব ও অসহায় চাষীদের জোর করে জমি কেড়ে নিয়ে নীল বোনে, অনেকের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, কুঠীতে তাদের আট্কিয়ে রাখে, নিজের লেঠেলদের দিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে লুঠ-তরাজও করে। লোকটা এরকম নির্মম ও নিমকহারাম হ'লেও সাহেব সুবোদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারের সময় ছিল সম্পূর্ণরূপে বিপরীত, একেবারে ভদ্রতা ও সৌজন্যের মূর্তিমান অবতার। সে ভাল ঘরের ছেলে, লেখাপড়াও কিছু জানে। দানখয়রাতেও তার সুনাম রয়েছে। পাশের একটা গাঁয়ের ইংরেজী স্কুলে সে মাসে মাসে চাঁদা দেয়। তার ঔষধের বাক্সটাও প্রকাণ্ড; সে গরীব লোকদের মুক্ত হস্তে, বিনা পয়সায় কুইনিন্ ও অন্যান্য ঔষধপত্র বিলি করে। এরকম দয়া মায়ার অবতার যে লোকটা সে রায়তদের সঙ্গে এমন নির্মম ব্যবহার করে কেন? এর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বোধ হয় তেমন প্রয়োজন নেই;এর সোজা উত্তর, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ-ই তাকে এমন জানোয়ারে পরিণত করেছে। মাধবের বাবা কেশবও কুক্ষণে মারে সাহেবের কাছে দাদন নেয় নিজের জমিতে নীলের আবাদ করার জন্যে। তার পর, মৃত্যু সময় পর্যন্ত সে প্রত্যেক বছর গাড়ি গাড়ি নীল কুঠিতে চালান দিয়েছে, প্রায়ই ঋণের দায় থেকে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টাও করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। নীল কুঠিয়ালের দাদন নিলে আর রক্ষা নেই, আজীবন দাসত্বের নিগড়েই বাঁধা থাকতে হবে। কেশব নীল কুঠিতে যত নীল গাছই সরবরাহ করুক না কেন, দেনা থেকে যাবেই। এই ঋণ আবার চলতে থাকবে পুরুষানুক্রমে। মাধব নিজেকে নীল কুঠিয়ালের কাছে হাত পা-বাঁধা অবস্থাতেই দেখতে পায় পিতার মৃত্যুর পরে। কুঠির দাদনের খাতায় তার নাম রয়েছে, কাজেই, নীলকে সে যত ঘৃণাই

করুক না কেন, তাকে নীল বুনতেই হবে। টাকা দিয়ে অব্যাহতি নেবার উপায় নেই। কুঠিয়াল সাহেব তাতে গররাজী। এতো আর সাধারণ দেনা নয় যে সোনা রূপো দিয়ে শোধ করা যায়? মাধব কুঠিতে সে যে সমস্ত নীলের বাণ্ডিল যোগায় তা প্রায়ই আকারে ছোট ও ওজনে কম সাব্যস্ত হয়; কাজেই তার ঋণের পরিমাণও বেড়ে যেতে থাকে। এই কুঠিয়াল সাহেব হচ্ছে আরব্য উপন্যাসের বুড়ো বোম্বেটের মত; একবার যার কাঁধে চাপবে, তার আর রক্ষা নেই, তাকে প্রাণান্ত করে তবে সে ছাড়বে। নীলকুঠি ও নীল চাষের জঘন্য প্রথা মানুষকে এমন দানবে পরিণত করে। গরীব ও অসহায় বাংলার চাষীদের উপর দুর্দান্ত নীল কুঠিয়ালদের এই রকম নির্মম অত্যাচার চলে বহু বৎসর ধরে।

নিজ আবাদ ও রায়তী—নীল চাষ হয় এই দুইরকম প্রথায়। প্রথম প্রথায় কুঠিয়াল নীলের আবাদ করে নিজের জমিতে, নিজের লোকজন নিয়ে। এতে অত্যাচার ও জুলুম তার নিজের লোকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু রায়তী প্রথায় সে রায়তদের টাকা দাদন দেয় এই শর্তে যে, তারা নিজের জমিতে নীল বুনে নীলকুঠিতে বিক্রি করবে। যত অনর্থের মূল এই রায়তী প্রথা। এতে রায়তদের অত্যন্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। সেজন্য তারা দাদন নিতে রাজী হয় না। কিন্তু চাষীদের জোর করে দাদন নিতে বাধ্য করা হয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই প্রথা ততটা নির্মম বোধ হয় না। চাষীরা নীল গাছ বেচে টাকা শোধ করে। কিন্তু সর্বনাশ সাধন করে ওজনদার, অর্থাৎ যে লোকটার হাতে নীল গাছ মেপে নেয়ার ভার থাকে সেই লোকটা। চাষী মাঠ থেকে হয় তো ছয় বাণ্ডিল নীলগাছ মেপে নিয়ে এলো, কিন্তু ওজনদারের হাতে পড়ে তা দাঁড়াল মাত্র দু'বাণ্ডিল। কাজেই তার অগ্রিম দাদনের টাকা শোধ হলো না। কুঠির সেরেস্তায় তার নামে ঋণের বোঝা বেড়ে উঠতে থাকে বছরের পর বছর ধরে।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি মাধব একদিন মাঠে জমি চষছে, এমন

সময়, মারে সাহেব অভ্যাসমত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এসে হাজির হয়। নিকটেই এক গাছতলায় এসে সে দাঁড়ায়। মাধব সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীর হাতে লাঙ্গল দিয়ে গাছতলায় এসে সাহেবকে সেলাম ঠুকে।

'কেহে, মাধব,' নীলকর সাহেব বলে, 'দেখছি, তোমার জমি আবাদের উপযুক্ত হয়েছে। এই জমিতে নীল বুনছো তো?' 'হুজুর', মাধব বলে, 'এ জমিতে যদি নীল বুনি তাহ'লে বাড়ির লোকজন কি খাবে? ধানবোনার জন্য জমি তৈরি করেছি, এতে যদি নীল বুনি তাহলে আমাদের না খেয়ে থাক্‌তে হবে।' 'নীল বুন্‌বে না তাতো আর বলছো না। কালই এসে দাদন নিয়ে যাও! তাছাড়া তুমি আমার কাছে ঋণী। যতদিন ঋণ শোধ না হয় ততদিন তোমাকে নীল বুনতেই হবে।'

'খোদাবন্দ! টাকা দিয়ে দেনা শোধ করবো। এছাড়া আর উপায় কি? মহাজনের কাছে টাকা ধার নিয়ে হুজুরের দেনা শোধ করবো।'

'টাকা দিয়ে কুঠির দেনা শোধ! এমন কথা কেউ কি কোনদিন শুনেছে? মনে হয়, নবকৃষ্ণ ব্যানার্জী তোমাদের সব শিখাচ্ছে।'

'গরীব পরোয়ার! আমাকে কেউ কোন কথা বলে নি। নীলের চাষে শুধু ক্ষতি হয়, লাভ কিছুই পাইনে, ধানের মরাইগুলোও খালি হয়ে পড়ছে।'

'নীল চাষ করে তোমার ক্ষতি হচ্ছে। এ-চমৎকার বুদ্ধি কে তোমার মাথায় ঢুকিয়েছে? তোমার বাবা প্রত্যেক বছর আমার নীল চাষ করতো; কোন ক্ষতি হয় নি। তুমি দেখ্‌ছি বাপের চেয়ে বেশি চালাক হয়ে পড়েছ! এবার দেখ্‌ছি এ-গাঁয়ের অনেক চাষী দাদন নিতে চাচ্ছে না। এর নিশ্চয়ই কারণ আছে। পাজী জমি-দার এর পেছনে রয়েছে। জমিদার ও তোমাদের সকলকে শিক্ষা

দেব। কাল সকালে কুঠিতে এসে দাদন নিয়ে যেয়ো। যদি না আস, তাহ'লে টের পাবে।'

'খোদাবন্দ! এ-বছরের মত মাপ করুন। হুজুরের হুকুম তামিল করবার ক্ষমতা নেই।'

'কি করতে যাচ্ছ, বুঝে দেখ, মূর্খ! দুষ্ট লোকের কুপরামর্শে ভুলো না। দাদন নিয়ে যাও, নীল বুনো।'

'মাপ করুন খোদাবন্দ। এ-বছর হুজুরের দেনা নগদ টাকায় শোধ করবো। ধর্মাবতার! দয়া করে গরীবের এই আরজি মঞ্জুর করুন।'

'তুমি নীরেট মূর্খ, মাধব! চোখ মেলে তাকিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছ। বলে রাখছি, যদি রেগে যাই, কোন শালা, এমন কি জমিদারও তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

'হুজুর যে দেবতাদের মত শক্তিমান তা জানি। হুজুরের সঙ্গে কে টোক্কর দিতে পারে? হুজুরকে রাগিয়ে কি বাঁচতে পারি? এই নির্দোষ মানুষকে দয়া করুন।'

'তুমি নির্দোষ লোক! আমার বিশ্বাস, তুমিই হচ্ছ এই গাঁয়ের দুষ্ট লোকদের সর্দার। তুমি এদেরকে দাদন নিতে বারণ করছো। জমিদার তোমাদের সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিচ্ছে। দেখি কে তোমাদের রক্ষা করে।'

'খোদাবন্দ! আমি কাউকে বারণ করি না। দয়া করে গরীবের আবেদন মঞ্জুর করুন।'

'তোমাদের আবেদন মঞ্জুর করা হবে না। তোমাকে নীল বুনিয়ে তবে ছাড়বো।'

'খোদাবন্দ! ঋণটি আমার বাপের, তবুও বলছি, আমি ঐ দেনা টাকায় শোধ দেব!'

'কুঠির সেরেস্তায় ঋণের খাতায় তোমার নাম রয়েছে আর তুমি বলছো নীল চাষ করবে না? কাল এসে যদি দাদন না নিচ্ছ, তাহলে

তোমার ও গাঁয়ের যে সব শালা দাদন না নিবে তাদের সর্বনাশ জেনে রাখ। মারে সাহেব যা বলে তাই করে।'

মাধব উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সাহেব তাতে কান না দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়।

মাধবের সঙ্গে আলোচনার সময় মারে সাহেব, জমিদার পেছন থেকে প্রজাদের উস্কানি দিচ্ছে বলে যে সন্দেহ করেছিল, তা মিথ্যে নয়। বাস্তবিক পক্ষে, জমিদারের আশ্বাস-বাক্যের জোরেই দুর্গানগরের প্রজারা দুর্দান্ত নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করেছিল। দুর্গানগর গ্রামটা ভাগীরথীর তীরবর্তী দক্ষিণ পল্লীর বাড়ুজ্যে বাবুদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। পুরাতন জমিদারের সঙ্গে মারে সাহেবের যথেষ্ট বনিবনা ছিল। কিন্তু নতুন জমিদার নবকৃষ্ণ ব্যানার্জী পিতার তুলনায় একেবারে বিপরীত ধরণের। তাঁর পিতা ছিলেন সেকেলে ধরনের লোক ; ইংরেজী লেখাপড়ায় ছিলেন অনভিজ্ঞ। রায়তদের মঙ্গলের দিকে তাঁর ততটা লক্ষ্য ছিল না ; কাজেই নীলকরদের অত্যাচারে তিনি হস্তক্ষেপ করতেন না। মারে সাহেব বিলক্ষণ শক্তিশালী বলেই তাঁর ধারণা ছিল। বিশেষতঃ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলার কলেক্টার—মারে সাহেব এদের সকলেরই প্রিয়পাত্র ; কাজেই বৃদ্ধ জমিদার এর সঙ্গে বিবাদ বাধান সুবিধাজনক নয় বলে মনে করতেন। নতুন জমিদার নবকৃষ্ণ কলিকাতার হিন্দু কলেজের ছাত্র। ছোট বেলা থেকে তিনি রায়তদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দেখে আস্‌ছেন। কলেজ-ছাড়ার পর কলিকাতায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের সভায় নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য কত বক্তৃতাই না করেছেন। অনেক জমিদারও যে অত্যাচারী তা-ও তিনি জানতেন। কাজেই পৈতৃক জমিদারীর দেখা-শুনার ভার গ্রহণ করেই তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁর জমিদারীতে 'জোর যার মুলুক তার' নীতি পরিত্যক্ত হ'বে ; প্রজারা আবওয়াব, মাথট, সেলামী, ইত্যাদি, কর থেকেও অব্যাহতি

পাবে। জমিদারের আমলারাও যাতে প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে না পারে, সে সম্বন্ধে তিনি ঘোষণা করেন যে, আমলারা সেলামী, আবওয়াব, পার্বণী, ইত্যাদি নিতে পারবে না। নবকৃষ্ণ, প্রজাদের জন্য অনেকগুলো বাংলা স্কুল এবং দক্ষিণ পল্লীতে একটা ইঙ্গ-বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দক্ষিণ পল্লীতে তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন এবং উহার ভার কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এক গ্র্যাজুয়েটের হাতে অর্পণ করেন। যাতে তাঁর রায়তদের উপর কোনরকম অত্যাচার করা না হয়, সেজন্য তিনি মারে সাহেবকেও পত্র দ্বারা জানান। এই পত্র থেকে মারে সন্দেহ করে যে রায়তদের নীলচাষ-বিরোধী আন্দোলনে এই জমিদারের গোপন হাত কাজ করছে। বাংলায় এরকম জমিদারের সংখ্যা একেবারে কম নয়। দুস্থ প্রজাদের অনেক সময় এঁরা অর্থ, খাদ্যদ্রব্য, ইত্যাদি দিয়ে সাহায্যও করেছেন। প্রজা ও জমিদারের মধ্যে এই হৃদ্য সম্পর্ক কারখানা-মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে আদৌ দেখা যায় না। গত পৌষ মাসে ধানকাটার পর মাধব সহ দুর্গানগরের প্রায় চল্লিশজন প্রজা নবকৃষ্ণ বাবুর কাছে মারে সহেবের অত্যাচারের কথা বলে, নবকৃষ্ণবাবু নীল-কুঠিয়ালের অন্যায় জুলুমের কাছে নতি স্বীকার করতে তাদেরকে বারণ করে। কুঠির ঋণ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তিনি প্রজাদের ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মাধবের সঙ্গে মারে সাহেবের পূর্বোক্তরূপ কথাবার্তা হয়।

মারে সাহেব যাতে দুর্গানগরে অত্যাচার করতে না পারে, সেজন্য তিনি কিছু লোক মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করেন। সাগরপুরের দারোগার কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণ ক'রে তিনি জানান যে, মারে সাহেব অত্যাচার করবে বলে দুর্গানগরের রায়তদের শাসিয়েছে, কাজেই উক্ত গ্রাম আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে! তিনিও আপন লোকজনকে প্রস্তুত থাকতে বলেন।

# দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

## নীল চাষের কাহিনী

মারে সাহেব যখন দুর্গানগরের বেয়াড়া, বেয়াদব রায়তদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নানারকম ফিকির উদ্ভাবনে রত, আর নবকৃষ্ণবাবু নীলকরের অত্যাচার থেকে রায়তদের রক্ষা করবার জন্য প্রতিকারোপায়ের উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে, নীল চাষ সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা যাক। ইউরোপের বাজারে তখন নীলের অত্যন্ত কদর। তাছাড়া বহু মানুষের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে ওতপ্রোত-বিজড়িত এই পদার্থটির কাহিনী নিশ্চয়ই ওখানে অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না।

মহাসাগরের বুক থেকে উত্থিত হওয়ার আদিম যুগ থেকেই নীলগাছটি ভারতের বন-জঙ্গলে আড্ডা গাড়ে। তবে ভারতবাসীরা নীলগাছকে কোন কাজেই লাগাতে পারে নি। শেষকালে ইংরেজদের সন্ধানী চোখ এর উপরে পড়ে, যার ফলে এর আবাদ ও প্রস্তুত করণের কাজ চারিদিকে ছেয়ে পড়ে। নীলের আবাদ হয় দুই রকমে, প্রথমতঃ চাষ-আবাদের সাধারণ নিয়ম-কানুন অনুসারে, দ্বিতীয়তঃ ছিটানী প্রথায়। দ্বিতীয় প্রথাটার সামান্য একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। বাংলায় প্রচুর বারি-বর্ষণের ফলে, এদেশের অগণিত নদীর দু'পারের বিশাল অংশ প্লাবিত হয়ে যায়। ফলে বিস্তর জমিতে পলিমাটি সঞ্চিত হয়। এই পলিমাটি শুকিয়ে যাওয়ার আগে চাষীরা তার সুযোগ নিয়ে নানা রকমের বীজ ছড়ায়। এই সমস্ত চর-জমিতে কোন রকম পরিশ্রম না করে এবং হাল-হাতিয়ার না চালিয়েই চাষীরা

ফসল ঘরে তুলে আনে। কেবলমাত্র বীজ ছিটাবার কষ্টটুকু তাদেরকে স্বীকার করতে হয়, এইজন্য এই প্রথা ছিটানী প্রথা নামে প্রখ্যাত। নদীতে জল কমতে আরম্ভ করে আশ্বিন-কার্তিক মাস থেকে। ছিটানী প্রথায় নীলচাষ এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়। কিন্তু সাধারণ প্রথায় নীলচাষ আরম্ভ হয় চৈত্র-বৈশাখ মাসে। দুই প্রকার চাষ-জাত নীল প্রায় একই সময়ে কাটা হয়, বর্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই।

নীলগাছ জমির উর্বরতা-শক্তি হ্রাস করে ফেলে। কোনদিক দিয়েই এই ফসল চাষীর একরত্তি মঙ্গল সাধনও করে না। কিন্তু তাহ'লে হবে কি? এতে কিন্তু চাষীকে শ্রম স্বীকার করতে হয় না বললেই চলে। প্রকৃতি-রানীই চাষীর হ'য়ে সব কাজ সম্পন্ন করে। বীজ বোনার দু'দিন পরেই অঙ্কুরোদ্গম হয়। সপ্তাহ খানিকের মধ্যেই সারা জমি আট ইঞ্চি লম্বা অগণিত নীলগাছে ছেয়ে যায়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে গাছ প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু হয়। এই সময় ইহা কাটবারও উপযুক্ত হয়। নিজাবাদের চাষীরা নীলগাছ কেটে গাড়ী বা বলদ বোঝাই করে কুঠিতে নিয়ে আসে। রায়তী আবাদের চাষীরাও নিজ ব্যয়ে নীলগাছ কেটে কুঠি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে বাধ্য হয়। তারপর এই সমস্ত নীলগাছ মেপে নেওয়া হয়। এতে চাষীদের উপর যে কতটা অবিচার করা হয়, তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অতঃপর কর্তিত নীলগাছ বড় বড় চৌবাচ্চায় পাটের মত জাগ দেওয়া হয়। চৌবাচ্চাগুলো পাকা, সিমেন্ট করা এবং এ-গুলো জোড়া জোড়া হিসাবে সারিবদ্ধ অবস্থায় সাজান। একসারি উচ্চ, ও আর এক সারি নিম্ন। উচ্চ সারির চৌবাচ্চাগুলোর সাথে নিম্ন সারির চৌবাচ্চাগুলোর যোগাযোগ সাধিত হয় কতক-গুলো ফুকারের সাহায্যে। ইচ্ছামত এই সমস্ত ফুকার খোলা বা বন্ধ করা যায়। মারে সাহেবের নীলডাঙ্গার কুঠিতে কমপক্ষে বার-জোড়া চৌবাচ্চা ছিল। উপরের সারির চৌবাচ্চাগুলোয় এবার কাটা নীলগাছগুলো রক্ষিত হয়। অতঃপর বাঁশের সাহায্যে এইগুলোয়

চাপ দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত বাঁশগুলোর সাথে সমকোণ করে বড় বড় শালকাঠ ঝুলিয়ে দিয়ে নূতন করে চাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর চৌবাচ্চাগুলো জলে ভর্তি করে নীলগাছগুলো জাগ দেওয়া হয়। নিকটবর্তী নদী বা জলাশয় থেকে জল নিয়ে এসে চীনা পাম্প দিয়ে চৌবাচ্চাগুলো জলে ভর্তি করা হয়। বার ঘণ্টার মধ্যে নীল-গাছের সমস্ত পাতা জলে ঝরে পড়ে এবং নীলগাছের সমস্ত নীলরস নিষ্কাশিত হয়। অতঃপর নীলগাছের সিটিগুলো তুলে ফেলা হয়। এইগুলো শুকিয়ে রাখা হয়। এই সিটি দিয়ে নীলকুঠির বয়লারের ইন্ধন যোগান হয়। নীল গাছের সিটি জমির উত্তম সারও বটে।

নীলগাছেব রস নিষ্কাশিত হওয়ার পর উপর সারির ফুকারগুলো খুলে দিয়ে নিচের সারির চৌবাচ্চাগুলো নীল জলে পরিপূর্ণ করা হয়। অতঃপর নৌকার দাঁড়ের আকারের প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা বংশদণ্ড নিয়ে নীলের কুলিরা মন্থন আরম্ভ করে। তারা নানান ধরনের ভাব-ভঙ্গি করে ও নানাপ্রকার গান গায় (অনেক সময় অশ্লীল ধরনের গান)। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে কুলিরা মন্থন করে। প্রকৃত নীল জিনিসটা এই সময় থিতাতে আরম্ভ করে। অতঃপর দুই ঘণ্টা ধবে থিতানোর পর উপরের নীলাভ জলটা চৌবাচ্চা থেকে বের করে নিকটবর্তী নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। এইবার গাঢ় তরল পদার্থ বয়লাবে জ্বাল দেওয়া হয়। এর পর নানা উপায়ে জল নিংড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। নিংড়ানো শেষে নীলেব মণ্ডকে বড় বড় চৌকস কেকের আকারে কাটা হয়। কেকগুলোর উপরে কুঠির ছাপ মারার পর বাঁশের সেল্‌ফে শুকাতে দেওয়া হয়। এজন্য নির্দিষ্ট কক্ষের ব্যবস্থা আছে। শুকাতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে। তখন এক একটা কেকের ওজন দাঁড়ায় প্রায় আট আউন্স। অতঃপর মাল বাক্স-ভর্তি করে কলকাতায় চালান দেওয়া; সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় লণ্ডনে নীলের বাজার ক্যাসল স্ট্রীটে। নিম্ন বঙ্গ ও বিহারে এক সময় এইভাবে নীলের চাষ ও নীল-শিল্প প্রচলিত ছিল।

## ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

### বাঙালীর বীরত্ব

অবিলম্বে দাদন নিতে, অন্যথায় চরম দুরবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য মারে সাহেব যেদিন দুর্গাপুরের চাষীদের শাসন করে, তার পরের দিন, বিকেল বেলায়, হাতে বিশেষ কাজ না থাকায়, মাধব কাঁধে গামছা ও হাতে হুঁকো নিয়ে এবং কল্‌কে থেকে উত্থিত তামাকের গন্ধে চারদিক আমোদিত করে গাঁয়ের মাঝখানে বকুলতলার দিকে যায়। গাছের চতুর্দিকে ইট-বাঁধানো রঙ্গমঞ্চ, তার উপর চার জন চাষী উপবিষ্ট। মাধব তাদের দলে মিশে পড়ে। ক্রমে আরো অনেকে এসে পড়ায় প্রায় বিশ জন চাষী বকুলতলায় সমবেত হয়। সকলেরই পরিধানে হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত ধুতি, দেহের উর্ধ্বভাগ অনাবৃত। কয়েক জনের কাঁধে অবশ্য গামছা শোভা পাচ্ছিল। কিন্তু প্রায় অর্ধেক লোকের হাতে এক-একটা হুঁকো। ধূমপান ও কাসা-কাসির সমারোহের মধ্যে নানাবিষয়ে আলোচনা চল্‌লেও নীলকর সাহেবের শাসানিই সেদিনকার মূল আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। মাধব শাদা-চুল এক বৃদ্ধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। লোকটা যখনই হুঁকোয় মুখ লাগায় তখনই কাসির ধুম পড়ে যায়। সবেমাত্র সে দীর্ঘসময়ব্যাপী কাসির পর্ব সমাপ্ত করেছে। মাধব তাকে জিজ্ঞাসা করে,—

'মুরুব্বী, তুমি কি বল? এই বিপদের সময় কি করা যায়?'

উত্তরে বৃদ্ধ চাষী চলে,—

'বাবা মাধব, কি আর বল্‌বো? বুড়ো হয়েছি, তিন পোয়া শেষ

হয়েছে, আর মাত্র এক পোয়া আছে ; কয়েকদিন পরেই দেহ ছাই হয়ে যাবে। আমি কিন্তু শান্তির পক্ষে। সারাজীবন ধ'রে নীলডাঙ্গার সাহেবের নীল চষেছি, অনেক কষ্টও পেয়েছি। এখন মরবার সময় আর সাহেবের সঙ্গে বিরোধ ক'রে কি লাভ ? তোমরা জোয়ান, সুখ-দুঃখের অনেক সময় তোমাদের আছে। যদি বাধা দিয়ে সফলকাম হও, তাহ'লে,আমার নিজের জন্যে নয়, পাঁচ জনার জন্যে, নিশ্চয়ই সুখী হ'বো। কিন্তু বাধা দিতে পারবে কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।'

'আমাদের বাধা দেওয়া নয়, মুরুব্বী। আমরা কে ? মারে সাহেবের কোন কাজেই আমরা বাধা দিতে পারি না। দয়ালু রাজা আমাদের সাহায্য করবেন বলেছেন।'

'জমিদার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অবশ্য ভালই করেছেন, কিন্তু দেখে নিয়ো, তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না। (টুপিওয়ালারা সব ভাই ভাই। ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, সবাই শাদা চামড়ার ভাইকে সাহায্য করবে।' )

তৃতীয় এক ব্যক্তি কিছুটা রাগ করেই ব'লে, 'বুড়ো, তাহ'লে কি করবে বল ? মারে সাহেবের দাদন নিয়ে যমের বাড়ি না যাওয়া পর্যন্ত নীল চাষ করবো ? বুড়ো হওয়ার জন্য দেখছি তোমার বুদ্ধিশুদ্ধিও লোপ পেয়েছে।'

'রাগ করো না,' বৃদ্ধ বলে, 'যৌবন বয়সে ঢের ঢের নীলকর সাহেবদের বাধা দেওয়ার ব্যাপার দেখেছি। ঐ সাহেবদের কিছুতেই পরাস্ত করা যায় নি, শেষ পর্যন্ত তারা জিতবেই। সেই জন্যই বলছি, বিরোধ করে কোন ফল হবে না। মাথা নুইয়ে চলাই ভাল।'

'বশ্যতা স্বীকার করা পাগ্‌লামির এক শেষ হবে',—চতুর্থ আর একজন কৃষক বলে। সমবেত অন্যান্য লোকের তুলনায় তার কাপড়চোপড় একটু মার্জিত ধরনের, সমবেত লোকজনের উপর তার কিছুটা

কর্তৃত্বও আছে বলে মনে হয়। 'নীলের জমি চষার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল। কুঠিয়ালের অভিশপ্ত টাকা নিয়েছ কি মরেছ। তোমার দেনা আর শোধ হবে না। বছর বছর বেড়েই চলবে। সব চেয়ে ভাল জমিতে তোমাকে নীল বুন্‌তে হবে। কুঠিতে নীলের বাণ্ডিল জমা দেওয়ার সময় এমন ক'মে যাবে যে, কোনদিনই ঋণ শুধ্‌তে পারবে না। জমিতে খাওয়ার মত ধান বুন্‌তে পারবে না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হ'বে। চাষী মরুক, আর বাঁচুক তার নীল হ'লেই যথেষ্ট, সে টাকা নিয়ে দেশে চলে যাবে। তবে পরলোকে নিশ্চয়ই সুবিচার আছে। যারা পরের সর্বনাশ করে তাদের কোনদিনই ভাল হয় না। এই হচ্ছে বিধির বিধান। না, না, আমরা কিছুতেই মাথা নোয়াব না। নবকৃষ্ণ বাবুকে দেবতারা চিরজীবী করুন। তিনি আমাদের সাহায্য করতে চেয়েছেন। তাঁর সাহায্যে আমরা দুষ্ট ফিরিঙ্গিকে বাধা দেব।'

এই বক্তৃতা দেয় স্বয়ং গ্রামের মোড়ল। শুনে সকলেই করতালি দেয়। বৃদ্ধ লোকটি কিন্তু কেঁদে ফেলে। প্রশংসা ধ্বনি শেষ হ'লে মাধব বলে,—

'মোড়ল যা বললেন, আমারও তাই মত; নীলকরের বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারি না। কিন্তু জমিদার যখন সহায়, তখন মারে সাহেব কি করতে পারে?'

মণ্ডল তখন আরো উত্তেজিত হ'য়ে বলে,—

'মারে শালাকে মারো! মারে শালাকে মারো! এই বলে আমরা লড়াই করবো; নীলকররা দেশের সর্বনাশ করেছে। ঐ শালারা আসার আগে, দেশ ছিল রামের অযোধ্যার মত সুখী। ওরা আমাদের উপর অত্যাচার করে, মারে, আট্‌কিয়ে রাখে, জ্বালাতন করে, মেরে ফেলে, বৌ-বেটীদের ইজ্জত নষ্ট করে। নীলকররা জাহান্নামে যাক! লাল বাঁদররা নিপাত যাক। মারে শালাকে মারো।"

সকলে দারুণ উত্তেজিত হ'য়ে ও অঙ্গভঙ্গি করে সমস্বরে চেঁচিয়ে বলে, 'মারে শালাকে মারো!' বৃদ্ধ কৃষক এতকাল নীরবে ছিল। আর চুপ থাকৃতে না পেরে, চিরস্তনী হুঁকোটা হাতে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায় ও বলে, 'আচ্ছা দেখা যাবে, কি করে তোমরা মাবে সাহেবকে মার। দেশের লোকের অনেক বীরত্ব দেখেছি। কথার বেলায় পাহাড় পর্বত, কাজেব বেলায় সরষের পরিমাণ। মুখে লম্বা কিন্তু হৃদয়ে খাটো। মুখে বড় বড় কথার হাঁক, কিন্তু সাহেব দেখলেই ভয়ে জড়সড় হও। মাবে সাহেব যখন দলবল নিয়ে আস্‌বে, তখন সবাই কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পালাবে।' বৃদ্ধের কথায় সবাই উত্তেজিত হয়ে পড়ে, কেহ-কেহ তাদের দূব করে দেওয়ার কথাও বলে। এমন সময় এসে পড়ে জমিদারেব গোমস্তা! তাকে দেখে সকলেই উঠে দাঁড়ায়। সকলের মাঝখানে মাদুরের উপর সে আসন গ্রহণ করে। গাঁয়েব ভাবী আক্রমণ সম্বন্ধে কিরকম প্রস্তুত হয়েছে সে এসেছে তা জানতে। সকলেই বলে তাবা প্রস্তুত আছে। গাঁয়ে কোন তলোয়ার নাই, বর্শাবও অভাব, তবে লাঠি আছে যথেষ্ট, তাই নিয়ে তারা সাহেবের লোকজনকে রুখবার প্রতিজ্ঞা করে। গোমস্তা সকলকে এক হয়ে দাঁড়াতে অনুবোধ করে ছোট্ট একটা বক্তৃতা করে। জমিদার সর্বতোভাবে যে তাদেরকে সাহায্য করবে, সেকথাও সে বলে। এতে অতিমাত্রায় আনন্দিত হয়ে তারা চেঁচিয়ে বলে, 'নবকৃষ্ণবাবু চিবজীবী হোক! নবকৃষ্ণবাবু চিরজীবী হোক!' এই বলে তারা আপন আপন বাড়িতে চলে যায়।

# চতুঃত্রিংশ অধ্যায়

## সংগ্রাম

সেকালে বাংলায় এমন কোন নীলকর সাহেব বা জমিদার ছিল না, যাদের নিজস্ব লেঠেল দল ছিল না। পাবনা জেলা ও ফরিদপুর জেলার লোক তখন সেরা লেঠেলরূপে গণ্য হোত; শান্তিপুর অঞ্চলের গয়লারা লেঠেলের কাজ করতো। এরা সবচেয়ে সাহসী ও দুর্দান্ত চাষী বলেও সারা বাংলায় এদের খ্যাতি ছিল। কিছু কিছু পশ্চিমা লেঠেলও থাকতো মজুদ ফৌজ হিসেবে। শেষোক্ত দলটাকে বন্দুক ছুড়াও শিখান হয়েছিল। সাধারণতঃ পাড়াগাঁয়ে যে সব দাঙ্গা হাঙ্গামা হ'ত তাতে বন্দুক বড় একটা ব্যবহৃত হ'ত না। বাঁশের লাঠিই অধিকাংশ লেঠেলের ছিল এক মাত্র অস্ত্র। লেঠেলদের সড়কীওয়ালাও বলা হ'ত, এরা লাঠির বদলে সড়কী ব্যবহারও করতো। লেঠেলদের সঙ্গে আর থাকতো ঢাল।

একদিন ভোর বেলায়, সূর্যোদয়ের অনেক আগে, মারে সাহেবের প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন সড়কীওয়ালা খুব উঁচো পাড়যুক্ত পুকুরের পার্শ্ববর্তী আম বাগান থেকে ভীষণ সোরগোল করে দুর্গানগরবাসী চাষীদের কুটীরের দিকে অগ্রসর হয়। ঘুম থেকে উঠে তারা চোখে জলও দেয় নি এমন সময় লেঠেলরা তাদেরকে আক্রমণ করে। জমিদারের লোকজনও তেমন প্রস্তুত ছিল না; আর থাকলেই বা কি? তারা মারে সাহেবের পেশাদার লেঠেলদের সামনে দাঁড়াতে পারতো না। এ-সম্বন্ধে বাঙালীদের কোনরকম যে ত্রুটি ছিল তা নয়। তবে নবকৃষ্ণ ব্যানার্জীর বাবা মারে সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করা ভাল

মনে করতেন না বলে তাঁর লেঠেলরা নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকার দরুন একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে, এমন কি লেঠেলগিরি ভুলেই গিয়েছে। নবকৃষ্ণ নিজে শিক্ষিত ও সদয় প্রকৃতির ছিলেন বলে লেঠেলদের সংস্কার সাধনের দিকে তেমন নজরও দেন নি। চাষীদের সড়কী ছিল না, কাজেই তারা তেমন বাধা দিতে পারে না। জমিদারের লেঠেলরাও প্রস্তুত ছিল না তবুও গ্রামবাসীরা সমবেত হয়ে লেঠেলদের উপর ইট ও হাঁড়ি বর্ষণ করে। তারা কাস্তে,কুড়ুল নিয়েও যুদ্ধে এগিয়ে আসে। মারে সাহেব স্বয়ং শাদা আরবী ঘোড়ায় চড়ে সড়কীওয়ালাদের সঙ্গে এসেছে। জয় তাদের সুনিশ্চিত বলেই মনে হয়।

এই সময় জমিদারের লেঠেলরা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। উভয় পক্ষের হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ ; একবার মনে হয়, জমিদার পক্ষই বুঝি জয়লাভ করে ; এমন সময় মারে সাহেব দুবার পিস্তলের আওয়াজ করে। বিরোধী দলের মনে অমনি দারুণ শংকার সৃষ্টি হয়। তারা ছুটে পালাতে আরম্ভ করে। সাহেবের লেঠেলরা তখন তাদের তাড়া করে, কয়েকজন রায়তকে বন্দী করে ও কৃষকদের বাড়ি লুট্‌তে থাকে। উভয় পক্ষের লোকজনের গায়েই কিছু কিছু আঘাত লাগে, তবে মাধবের আঘাতটা সাংঘাতিক। লেঠেলরা তার বাড়ি প্রথমে লুট্‌তে চেষ্টা করলে, সে প্রাণপণে বাধা দেয়। কাজেই তার গায়ে সড়কীর আঘাত লাগে। আঘাত পাওয়ার পর বাড়ির কাছে একটা ঝোপের মধ্যে সে লুকিয়ে ছিল। ফিরবার সময় সাহেবের সড়কীওয়ালারা তাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাকেও নিয়ে চলে, কারণ, যদি মাধব মারা পড়ে, তাহলে সাহেবকে যথেষ্ট দুর্ভোগের সম্মুখীন হ'তে হবে। বন্দীদের কুঠিতে নিয়ে আসার পর মণ্ডল ও অন্যান্য বন্দীকে একটা বড় গুদাম ঘরে আটক রাখা হয়। একমাত্র মাধবকে নিয়ে যাওয়া হয় নদীর দিকে। লুট্‌তরাজ করা বা রায়তদের অঙ্গে আঘাত করার উদ্দেশ্য অবশ্য মারে সাহেবের ছিল না। তার অজ্ঞাতসারেই এই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়।

# পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

## "শ্বশুর বাড়ি"

বাংলার নীলকরদের স্থবর্ণ যুগে প্রত্যেক কুঠিতে গুদাম ঘরের মত এক প্রকাণ্ড ঘর দেখা যেত ; কুঠির লোকজনের কাছে এই ঘর ছিল 'শ্বশুরবাড়ি' নামে পরিচিত। বাংলার শ্বশুরালয় ধরাতলে স্বর্গরূপেই গণ্য ; দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ পৃথিবীর অভিশপ্ত বুকে এই পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্রেই মানুষ যা একটু নির্মল সুখ-শান্তি উপভোগ করে। নীলকুঠির শ্বশুরবাড়ি কিন্তু এমন সুখের জায়গা নয়। এ হচ্ছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর স্থান! শ্বশুর বাড়ির সুখ-সম্ভোগের বদলে এখানে মিলে লাথি, ঘুষি, জুতোর-বাড়ি, গদাধর নামক চাবুকের আঘাত ও বুকে বাঁশডলার দরুন দুঃসহ ব্যথা। এখানে গান-বাজনার সুমধুর আওয়াজের পরিবর্তে শোনা যায় করুণ আর্তনাদ ও নিরাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাসের আওয়াজ শ্বশুরালয়ের উপাদেয় ভোজ্য বস্তুর বদলে এখানে মিলে মাত্র দিনে একমুঠো ভাত ও ডাল শরীরটাকে কোনরকমে টিকিয়ে রাখার জন্যে। বাস্তবিকপক্ষে, অবাধ্য ও দেনাদার চাষীদের আট্‌কে রাখার জন্য ইহা অন্ধকারময় কারাগার, কুঠিয়াল সাহেব নিজে থেকেই এই কারা-গারের সৃষ্টি করেছে। লোকে বিদ্রূপচ্ছলেই এর নাম রেখেছে 'শ্বশুর বাড়ি'। শোয়া-বসার জন্য একখানা মাদুরও এখানে নাই, আসবাবপত্র বল্‌তে দেখা যায় বাঁকা, পুরোনো বুটজুতো, দু'একটা সড়কী, কতকগুলো বেতের ছড়ি ; একটা মাত্র গবাক্ষ তা আবার অনেক উঁচোতে। এ-হেন অপরূপ ঘরে দুর্গানগরের মণ্ডল ও আরো দশ জন গ্রামবাসীকে আবদ্ধ রাখা হয়। আটক রাখার মিনিট পনের

সময়ের মধ্যে সাক্ষাইৎ যম মারে সাহেব, দুর্ধর্ষ দেওয়ান ও যমদূতের মত দু'জন সড়কীওয়ালা ঘরের ভেতর প্রবেশ করে। মারে সাহেবের বসবার জন্য একখানা চেয়ার আনা হয়; দেওয়ান ও সড়কীওয়ালারা তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। মণ্ডলকে কাছে ডেকে এনে মারে সাহেব তাকে বলে, 'ওহে মণ্ডল, তুমি এখন ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল। মারে সাহেব শালাকে মারো বলেতো খুব ফুটুনি করেছিলে। এখন এই ফুটুনির কি হলো?'

মণ্ডল—'খোদাবন্দ আমি অমন কথা মুখে আনিনি। আমার সর্বনাশ করার জন্যে শত্রুরা আপনার কাছে লাগিয়েছে।'

কুঠিয়াল—'তোমার জাতের মতই তুমি মিথ্যেবাদী শূয়োর। তুমি কি মনে কর, তোমাদের মধ্যে কি হয় না হয় আমি কিছুই জানতে পারি না? তুমি ও আর এক পাজী মাধব আমাকে মারবে বলে শাসিয়েছ, অন্যান্য চাষীকে আমার বিরুদ্ধে লড়তে উস্কানি দিয়েছ। জমিদার শালা তোমাদের রক্ষে করবে বলেছিল। তোমার বাবা নবকৃষ্ণ কোথায়? এখন সে তোমাকে রক্ষে করুক।'

মণ্ডল—'হুজুর সর্বশক্তিমান! হুজুর বাঁচালেও বাঁচাতে পারেন, মারলেও মারতে পারেন। খোদাবন্দ, গরীব প্রজাকে রক্ষা করুন।'

কুঠিয়াল—'যেসব দোষ করেছ, তাতে মেরে ফেলা উচিত, কোনো বাবাও রক্ষে করতে পারবে না। কিন্তু দুটো শর্তে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। তোমাকে এক্ষুণি নীলের জন্য দাদন নিতে হবে ও পুলিস তদন্তের সময় গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বল্‌বে, তোমাদের উপর কোন অত্যাচার হয় নি, স্বেচ্ছায় নীলের দাদন নিয়েছ।'

মণ্ডল—'ধর্মাবতার! দাঙ্গার কথা বেমালুম চেপে যেতে রাজী আছি; কিন্তু দোহাই আপনার; দাদন থেকে আমাকে মাপ করুন এবার।'

এ-কথায় মারে সাহেব ভয়ানক চটে গিয়ে মণ্ডলকে মেঝের উপর চিৎ করে শুইয়ে বুকে বাঁশ ডলার জন্য সড়কীওয়ালাদের হুকুম দেয়। যমদূতের মত সড়কীওয়ালা দুজন মণ্ডলকে ফেলে দিয়ে তার বুকে বাঁশ ডল্‌তে আরম্ভ করে। মণ্ডল যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে— 'বাবা গো! মা গো! প্রাণ যে যায়! রক্ষা কর।'*

মারে সাহেবের তখন বেজায় স্ফূর্তি; স্ফূর্তির চোটেই সে বলে,— 'দেখি কোন্ বাপ তোমায় সাহায্য করে। এখন মারে সাহেবকে মারবার কি হলো? সড়কীওয়ালারা, জোরে বাঁশ চালাও।'

মণ্ডল আরো বেশি আর্তস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে—'বাবাগো! মাগো! প্রাণ গেল, গেল, গেল! সাহেব, দাদন দাও।'

সড়কীওয়ালারা সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়। মণ্ডলকে বসিয়ে এক ঘটি জল পান করতে দেওয়া হয়।

মারে সাহেব বলে যে মণ্ডলের এত শীগ্‌গীর চৈতন্য হ'তে দেখে সে খুশি হয়েছে। এ-শিক্ষা মণ্ডল শীগ্‌গীর ভুলে যাবে না বলে সে আশাও প্রকাশ করে। বাকী দশ জন বন্দীকে যখন দাদনের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তারা সঙ্গীর নাজেহাল অবস্থা দেখে অতি সহজেই স্বীকৃতি প্রকাশ করে। তখন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় শ্বশুর বাড়ি থেকে দপ্তরখানায়, সেখানে মণ্ডল নাম সই করে ও বাকী দশজন টিপসই দিয়ে চুক্তিপত্রে সম্মতি দেয়; দাদনও দেওয়া হয়। নীল কুঠিয়াল অতঃপর তাদেরকে এই ব'লে বিদায় দেয় যে, যদি তারা দারোগা বা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সাক্ষ্য দেয় তাহ'লে তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে প্রাণে মেরে ফেলা হ'বে। দুপুর বেলায় তারা কুঠি থেকে গাঁয়ে চলে যায়।

মাধবকে শ্বশুর বাড়িতে না আট্‌কিয়ে যে নদীর ধারে নিয়ে যাওয়া হয় তা আগেই বলা হয়েছে। মারে সাহেব মাধবের আঘাত দেখে বুঝতে পেরেছিল যে, ইহা মারাত্মক না হ'লেও সাংঘাতিক। পুলিস যদি তাকে হাতে পায় তাহ'লে মামলা গুরুতর দাঁড়াতে পারে। এই-

জন্য তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া দরকার। কুঠির নাপিতকে দিয়ে ক্ষতস্থল বেঁধে দিয়ে মারে সাহেব তার নিজের নৌকায় তাকে বহুদূরে প্রেরণ করে, পুলিসের হয়রানি থেকে অব্যাহতি লাভের আশায়।

## ষষ্ঠত্রিংশ অধ্যায়

### পুলিস তদন্ত

জমিদার নবকৃষ্ণ ব্যানার্জী যে দাঙ্গা বাধার আগে সাগরপুরের দারোগাকে জানিয়ে দাঙ্গা নিবারণের জন্য অনুরোধ করেছিল, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। মারে সাহেব কিন্তু আগের থেকেই তার উপর টেক্কা মারে। দুর্গানগরের জনকয়েক অবাধ্য রায়তকে যে সে ভয় দেখাতে উদ্যত হয়েছে, তা দারোগাকে জানায়। দারোগা মারে সাহেবের নোটিশ পেয়ে একেবারে আনন্দে লাফ মেরে উঠে। বহুদিন থেকেই নীলডাঙ্গার কুঠি ও সাগরপুর থানার মধ্যে দহরম মহরমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে পুলিসের সাহায্য না পেলে নীল কুঠিয়ালরা যে সমস্ত অত্যাচার করতো তার অর্ধেক করতেও সাহস পেত না। পুলিস নিশ্চেষ্ট থাকতো অবশ্যই ঘুষ পেয়ে। কুঠিয়াল সাহেবরা এই ঘুষকে বলতো 'চাঁদির জুতো'। অবস্থা এই রকম ছিল বলে, দারোগারা ভারী দাঙ্গার সন্ধান পেলেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তো। দাঙ্গা বাধলে দারোগারা সাধারণতঃ দু'পক্ষ থেকেই ঘুষ নেয়। নবকৃষ্ণ ব্যানার্জীর কাছ থেকে ঘুষ পাওয়ার কোন আশাই ছিল না। কাজেই আলোচ্য ব্যাপারে দারোগা যে কোন্ পন্থা নিবে তা বেশ বোঝা যায়। মনে মনে সে স্থির করে, 'দাঙ্গা বাধার আগে কিছুই করবে না; দাঙ্গার পর সে ঘটনাস্থলে গিয়ে কিসে দু'পয়সার মুখ দেখা যায়, সে ব্যবস্থা ক'রে নিবে।' নবকৃষ্ণ বাবুর কাছে যে এক পয়সাও পাওয়া যাবে না, তা সে বেশ বুঝতে পারে। মারে সাহেবের কাছে বেশ দু'পয়সা পাওয়ার আশায় বুকটা তার আনন্দে নেচে ওঠে।

বন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারে সাহেব দারোগার কাছে রিপোর্ট পাঠায়। দারোগা তখন ঘোড়ায় চড়ে বক্সী, পাঁচ ছয় জন বরকন্দাজ ও একদল চৌকিদার নিয়ে অগ্রসর হয়। দক্ষিণ পল্লীর ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় নধকৃষ্ণ'র সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। নবকৃষ্ণ দাঙ্গার কথা ও রায়তদের উপর অত্যাচার, বিশেষতঃ মাধবের অন্তর্ধানের কথা সবিস্তারেই বর্ণনা করে। দারোগা একপক্ষের কথা শুনে, ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করার আগে কোন কিছু বলতে অস্বীকার করে। প্রকারান্তরে সে কিছু ঘুষ পাওয়ার ইঙ্গিতও করে। নব্য শিক্ষিত নবকৃষ্ণ বাবু তা বুঝতে পারলেও, দারোগাকে তার দায়িত্ব পালনের জন্য উপদেশ দিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যথাযথ রিপোর্ট পাঠাতে অনুরোধ করে।

নবকৃষ্ণ বাবুর কাছ থেকে যে কিছু মিলবে না দারোগা তা আগেই বুঝেছিল। কাজেই মন ক্ষুণ্ণ না হয়েই সে দুর্গানগরের দিকে যাত্রা করে। নীল কুঠীয়ালের পক্ষে অনুকূল রিপোর্ট দাখিল করবে বলেই সে স্থির করে। নবকৃষ্ণ বাবুর মুখে মাধবের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদে সে আরো বেশি আনন্দ লাভ করে। ব্যাপারটা তার কাছে বিধাতার আশীর্বাদ বলেই মনে হয়। কারণ, এতে সে কুঠিয়াল সাহেবের কাছে থেকে মোটা ঘুষ আদায় করতে পারবে। এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে সে আনন্দে আত্মহারা হয়েই জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে অগ্রসর হয়। রায়তদের সর্বনাশেই তো পুলিস অফিসারদের লাভ। অপরাহ্নে দারোগা সদলবলে দুর্গানগরে উপস্থিত হয়।

বাংলার পল্লীতে দারোগার আবির্ভাব, আজকাল না হ'লেও যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ে গ্রামবাসীর মনে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করতো। সঙ্গে সঙ্গে সিদে-পত্র আদায়েরও ধুম পড়ে যেতো। দারোগা দুর্গানগরে ঢুকতেই বরকন্দাজ ও চৌকিদাররা লুট-তরাজ আরম্ভ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্তর খাওয়ার জিনিসপত্র যোগাড় করা হয়। গাঁয়ের মুসলমানদের কাছ থেকে আধ ডজন মুরগী ও

দু'ডজন ডিমও আদায় করা হয়। হিন্দুরা যোগায় চাল, ডাল, শাক্-সবজী, তেল ও ঘি। মোট কথা, যে সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়, তাতে থানার লোকজনের স্বচ্ছন্দে এক মাসেরও বেশি সময় চলে যাবে। ভীতু গ্রামবাসীরা দুর্বৃত্ত দারোগাকে অনেক পয়সা টাকা উপঢৌকনও যোগায়।

অতঃপর দারোগা তদন্ত আরম্ভ করে। গ্রামবাসীরা মারে সাহেবের ভয়ে বলে যে গ্রামে কোনরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নি। মাধবকে তারা অনেক দিন থেকেই দেখতে পাচ্ছে না, কোথায় গিয়েছে, বলতে পারে না। জমিদার তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে তারা বুঝতে পারলেও, মারে সাহেবের সঙ্গে সে এঁটে উঠতে যে পারবে না তা তারা মনে মনেই অনুভব করেছিল। কাজেই সদাশয় নবকৃষ্ণ বাবুকে অপদস্থ করা ছাড়া উপায় ছিল কোথায়? তদন্ত আরম্ভ করা হয় মাধবের বাড়ির নিকটে। সাহেবের গোমস্তা ও জমিদারের গোমস্তা উভয়েই হাজির ছিল। সাহেবের গোমস্তা বক্সীর কানে কানে কি বলে, বক্সীও তা দারোগাকে চুপি চুপি জানায়। সাহেবের গোমস্তা ও বক্সীর মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল তা জানা না গেলেও জমিদারের গোমস্তার মতে, দারোগাকে বক্সীর মারফতে অনেক টাকা ঘুষ দেওয়া হয়েছিল।

সাক্ষ্য নেওয়ার পর দারোগা দৃপ্তকণ্ঠেই জমিদারের গোমস্তাকে বলে, 'এখন দেখা যাচ্ছে, জমিদার মারে সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করেছে। আর শুধু তাই নয়, মাধবকে লুকিয়ে রেখে, ভাললোক মারে সাহেবের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক মামলা আনয়নেরও চেষ্টা করেছে।'

বক্সী তখন রিপোর্ট লিখে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করে। সন্ধ্যায় থানায় ফিরবার সময় দারোগা কুঠিতে মারে সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে মোটা টাকা ঘুষ নিয়ে যেতে অবশ্যই ভুলে যায় না।

নীলকুঠিয়ালরা রায়তদের উপর যে সমস্ত অত্যাচার করতো তার

মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অত্যাচারটা 'সাত কুঠির জল খাওয়ানো' নামে পরিচিত। অবাধ্য রায়তকে কুঠির পর কুঠিতে স্থানান্তরিত ক'রে তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাই এর তাৎপর্য। মাধবকে এইভাবে সাত কুঠির জল খাওয়ানো হয়। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, পাছে আহত মাধবকে নিয়ে পুলিসের ফ্যাসাদে পড়তে না হয় এইজন্য হতভাগ্য মাধবকে এই দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। দারোগার রিপোর্ট পাওয়ার পর, ম্যাজিস্ট্রেট নবকৃষ্ণ বাবুর উপর কড়া পরোয়ানা জারি ক'রে তাকে অবিলম্বে মাধবকে হাজির করার নির্দেশ দেয়। জমিদারকে তখন মাধবের সন্ধান করতে হয়, পুলিসও জোরে অনুসন্ধান করে, যে মাধবকে লুকিয়ে রেখেছে তার কাছ থেকে মোটা ঘুষ আদায় করার লালসায়। মিঃ মারেও মাধবকে লুকিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

নীলডাঙ্গা কুঠি থেকে প্রথমে মাধবকে নৌকায় নিয়ে আসা হয় কুলডাঙ্গা কুঠিতে, সেখান থেকে ভাগীরথীর তীরবর্তী সেরপাদায়, সেরপাদা থেকে তাকে প্রেরণ করা হয় পূর্ববঙ্গের দূরবর্তী কোন এক কুঠির দিকে। পথিমধ্যে কৃষ্ণধাম, রাধানগর, চক্রদ্বীপ, সারিসমুদ্র এই সব কুঠি ঘুরিয়ে তাকে চালান দেওয়া হয় ইছামতীর তীরবর্তী মৌলবীগঞ্জে। সাব্যস্ত করা হয়েছিল, এখানেই তাকে আটক রাখা হ'বে; কিন্তু এখানকার কুঠির ঘাটে নামাবার সময় বেচারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। রাত্রিতে মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয় নদীর জলে আর তা ভেসে যায় বঙ্গোপসাগরে। এইভাবে দরিদ্র বাঙালী চাষীর জীবনের শেষ যবনিকা পড়ে।

মাধবের মৃত্যুসংবাদ দুর্গানগরে অনেকদিন পরে পৌঁছায় কোন চৌকিদারের মুখে। পুত্রশোকে সুধামুখী পাগল হ'য়ে শেষপর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে মরে, বিধবা কাদম্বিনী শ্বশুর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। মালতী স্বামীর ঘরবাড়ি ও জমিজমা বিক্রি করে নগদ একশ' টাকা নিয়ে কাঞ্চনপুরে ভাইয়ের বাড়িতে আসে। গরীব ভাইয়ের

গলগ্রহ না হ'য়ে সে কিছু টাকা চড়া সুদে খাটায় ও কিছু টাকায় ধান কিনে চাল বিক্রি করতে আরম্ভ করে। এতে মা ও ছেলের সংসার-যাত্রা স্বচ্ছন্দেই চলে। পুত্র যাদব রাখালের কাজ করেও মাসে বার-গণ্ডা পয়সা রোজগার করে। গোরু চরাবার সময় সে গোবর কুড়িয়ে আনে, মালতী তা দিয়ে ঘুঁটে তৈরি করে বিক্রি করে। মা ও ছেলের সংসার এমনিভাবে চলে যায়।

নবকৃষ্ণ ব্যানার্জী পূর্বোক্ত দাঙ্গায় ও তৎসংক্রান্ত মামলায় হেরে গেলেও শেষপর্যন্ত বিজয়লক্ষ্মী তাঁর অঙ্কশায়িনী হয়। কারণ তিনি নীলকরদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন শেষপর্যন্ত তা জয়-যুক্ত হয়। মিঃ মারে যে জোর-যার-মুলুক-তার নীতি অবলম্বন করেছিল, শেষপর্যন্ত তা টিকে থাকতে পারে নি। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা সাংঘাতিক আন্দোলন আরম্ভ করে, যার ফলে, বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্সার্ন শেষ পর্যন্ত কুঠিটা বেচে ফেল্‌তে বাধ্য হয়। মারে সাহেব ছিল এই কোম্পানির কর্মচারী।

## সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

### রক্ত-পিপাসু জমিদার

জমিদারের বিরাগ-ভাজন হওয়ার পর, কালোমানিক প্রতিশোধ নেবার জন্য যে কিভাবে কাঞ্চনপুরের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায় তার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। মনের কথা সে কাউকে খুলে বলে না কাজেই তার মনে যে কি ছিল, তা কেউ বল্‌তে পারে না। তবে এখন পর্যন্ত সে জমিদারের কোন ক্ষতিই করতে পারে নি।

একদিন সকালে জয়চাঁদ রায়চৌধুরী কাছারিতে ব'সে আছে, এমন সময় তার লেঠেল সর্দার ভীমা কোটাল এসে গড় হয়ে দণ্ডবৎ করে। জয়চাঁদ বলে,—'তুই একেবারে অপদার্থ ভীমে! এখন পর্যন্ত হারামজাদা কালোমানিকটার কিছুই করতে পার্‌লিনে? ও শুধু এ-গাঁয়ে নয়, আশে-পাশের গাঁগুলোতেও আমার বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। ওকে শেষ করতে পারিস্‌নে?'

ভীমা—'ধর্মাবতার! যদি জান্‌তে পারতাম, হুজুর এই চান, তবে কোনদিন পৃথিবী থেকে তাকে বিদেয় নিতে হোত।'

জয়চাঁদ—'কিন্তু আমার মনের ভাব যে তাই, তা এতদিনেও বুঝতে পারিস্‌ নি? ও যতদিন স্বচ্ছন্দে ঘুরে-ফিরে বেড়াবে, ততদিন আমার মনে শান্তি নেই; কি জানি, কখন কি করে বসে।'

ভীমা—'আমি মনে করতাম হুজুর শুধু তাকে প্রহার দিতে চান। হুজুরের জন্য ভীমা সর্দার কি না করতে পারে? বাঘের দুধ এনে দিতে বলুন, এনে দিব। হুকুম দেন, কালোমানিকের মাথা এক্ষুণি নিয়ে আস্‌ছি?'

জয়চাঁদ—'আমি ঠিক তাই চাইনে; গোলমাল না করে যাতে কাজ হাসিল হয়, এই আমার ইচ্ছে?'

ভীমা—'আজই করা হবে, খোদাবন্দ!'

এই বলে ভীমা কোটাল কাছারি থেকে বের হ'য়ে জমিদারের গুণ্ডাদের সাথে পরামর্শ করে, সন্ধ্যায় কালোমানিক কোথায় কোথায় যায় তা জেনে নিয়ে সেইমত বন্দোবস্ত করে।

সন্ধ্যার সময় কালোমানিক কাঞ্চনপুরের চার মাইল উত্তর-পূর্বে কাদরা গ্রাম থেকে যাত্রা করে। গ্রামবাসীরা কালোমানিককে রাত্রিতে থেকে যেতে বলে, কিন্তু সে অপরিমিত দৈহিক শক্তি ও স্বাভাবিক বোকামি বশতঃ কারুর বারণ না শুনে বেরিয়ে পড়ে। মাজায় গামছা এঁটে ও বিরাট বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে সে অন্ধকারের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাঠে রাস্তা নেই, তবে ধান কাটা শেষ হয়েছে। দৈত্যের মত পা ফেলে সে জোরে জোরে চলে! মাঠে একটাও লোক নেই, পাখীরাও চলে গিয়েছে, শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। নৈশ পাখীর ডানার শব্দ। এক মাইল চলার পর মাথার উপর চাঁদ ওঠে, সে আরো জোরে পথ চলে। তার অকুতোভয় বুকে ভয়ের লেশ মাত্র নাই। প্রায় অর্ধেক পথ সে অতিক্রম করেছে। সাম্‌নে জলজ গাছ-গাছড়ায় পরিপূর্ণ মস্ত একটা পুকুর ও উচ্চ অশ্বত্থ গাছ। গাছতলায় চাঁদের আলোয় কালোমানিক একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে। চারিদিকের গাঁগুলো এখান থেকে দু-দু মাইল দূরে। কাজেই তার তাক লেগে যায়, লোকটা কে হ'তে পারে। ছ'জন লোকের চেয়েও সে বেশি শক্তি ধরে। কাজেই কোন কিছু গ্রাহ্য না করেই সে এগিয়ে চলে। গাছের বিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে, এমন সময় ভীমা কোটালকে বল্‌তে শুনে—'বেঁচে থাক ভাই, কালোমানিক! বেঁচে থাক! তোমার জন্যে অনেকক্ষণ ব'সে আছি।' কালোমানিক মোটেই ভয় না পেয়ে বলে, 'তবেরে, ভীমে, তোর মরণ এসেছে।' এই বলেই সে ভীমার কাঁধে

তার বিরাট লাঠির আঘাত করে, এক মুহূর্তে ভীমা পড়ে গিয়ে মাটিতে হাত পা দাপাতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় আঘাত হানার আগেই কালোমানিক দেখে দশ-বার জন লেঠেল তাকে ঘিরে ফেলেছে। তারপর ভীষণ লড়াই আরম্ভ হয়। কালোমানিক কয়েকজনকে জখমও করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ধরাশায়ী হ'য়ে প্রাণত্যাগ করতে হয়। ভীমা সর্দার দু'খানা হেঁসে এনেছিল। সে কালোমানিকের দেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে পুকুরের পাড়ে মাটি চাপা দেয়। কয়েকদিন পর শেয়ালে মৃতদেহ টেনে বের করে। এ যে কালো-মানিকের দেহাংশ তা সকলেই বুঝতে পারে। জয়চাঁদ পুলিস অফিসারকে ঘুষ দেওয়ায় সমস্তই চাপা পড়ে যায়।

# অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

## পঞ্চম

একদিন দুপুর বেলায় গোবিন্দ গৃহ-সংলগ্ন পুকুরে পা ধুচ্ছে এমন সময় জমিদারের পিওন তার হাতে এক টুকরো কাগজ দেয়। কাগজে লেখা ছিল নব্বুই টাকার উপর খাজনা বাকী পড়েছে; গোবিন্দ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। এক পয়সাও খাজনা বাকী সে ফেলে রাখে নি, তবুও বকেয়া খাজনার দাবি? ভগবান কি এত অবিচার সহ্য করবে?

ব্যাপারটা এই যে, জমিদার ভীমা কোটালকে গোবিন্দর ঘরে যখন আগুন দিতে বলে, তখন শুধু বাড়ি পোড়ানই উদ্দেশ্য ছিল না। দাখিলাগুলোও যাতে পুড়ে যায়, এই ছিল জমিদারের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। জমিদার জয়চাঁদ এখন গোবিন্দর সর্বনাশ সাধনে উদ্যত হয়েছে।

তখনকার রাজস্ব বিধিতে সাংঘাতিক দুটো ধারা ছিল। উক্ত বিধির সপ্তম ও পঞ্চম ধারা বলে ও দুটো সাধারণতঃ সপ্তম ও পঞ্চম নামে পরিচিত ছিল। সপ্তম অনুসারে জমিদার খাজানা-পরিশোধে অক্ষম রায়তকে গ্রেপ্তার করতে পারতো। পঞ্চম অনুসারে প্রজার সর্বস্ব বিক্রি করতে পারতো। আইনের এই জুলুম চলে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধ'রে। তারপর অবশ্য ভাল একটা আইন জারি করা হয়।

গোবিন্দর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক্ দেওয়া হয় মাঠের পাকা ফসল, মরাইয়ের ধান, ঘরবাড়ি, গোরু বলদ সমস্তই। ক্রোকের ষষ্ঠদিনে

ফোড়শ আমিন এসে বিক্রি করার তারিখ ও সময় ধার্য করে। এই অফিসার বিক্রির শতকরা দশ ভাগ কমিশন বাবদ পাবে। মুক্তি-লাভের উপায় অবশ্যই আছে; কিন্তু গোবিন্দর পক্ষে তা অসম্ভব। যার সম্পত্তি ক্রোক দেওয়া হয়েছে, সে পাঁচ দিনের মধ্যে উপযুক্ত জামিনদার দিয়ে পনর দিনের মধ্যে ও সম্বন্ধে মামলা রুজু করতে পারে; তবে সমস্ত বকেয়া খাজানা সুদসহ শোধ দিতে হবে। গোবিন্দ বহু চেষ্টা করেও জামিনদারের ব্যবস্থা করতে পারে না।

অতঃপর বিক্রয়ের ভয়াবহ দিন এসে পড়ে। মাঠের ফসল, মরাইয়ের ধান বিক্রি করেও খাজানা শোধ হয় না। সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি এবং বাড়ির থালাঘটি ও মেয়েদের গায়ের অলঙ্কার পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়। এইভাবে আইন দেবতাকে তুষ্ট করা হয়। গোবিন্দ পথের কাঙ্গালে পরিণত হয়।

১৮৫৯ সনের দশ আইন বাংলার চাষীকে এই দারুণ অত্যাচার থেকে অনেকটা মুক্ত করে। নতুন আইনে স্থির করা হয়, রায়ত যে সমস্ত জমি বিশ বছর ভোগ করছে, তার খাজনা বাড়ানো চল্‌বে না। বার বছর জমিজমা ভোগ করলে, ন্যায্য খাজানায় ইজারা বন্দোবস্ত করতে হ'বে; খাজনা বাড়াতে হ'লে এক বছরের নোটিশ দিতে হবে। জমিদারকে খাজনার দাখিলা দিতে হ'বে ইত্যাদি। মোটের উপর এই আইন যদি আর কয়েক মাস আগে জারি হোত, তাহলে আর গোবিন্দকে এমন সর্বস্বান্ত হ'তে হোত না। এখন বেচারীর উপায়? জমিদার যখন তার ঘর পোড়ায়, তখন সে এতটা কাহিল হয় নি। পোড়া ঘর এখন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চমের কল্যাণে শুধু শূন্যগর্ভ ঘরই দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির মেয়েরা ভীষণ সোরগোল করে কাঁদছে। কিন্তু তার তো শুধু অনুশোচনা করলে চলে না। তাকে বেরিয়ে পড়তে হয় ক্ষুধিত স্ত্রীপুত্র কন্যাদের আহারের অন্বেষণে। গোলক পোদ্দার তাকে বিশেষভাবেই সাহায্য করে, কম সুদের হারে টাকা ধার দেয়। এই সমস্ত ঋণের টাকা শোধ দিতে তার

দশ বছর লাগে। এ দশ বছরের কাহিনী বলা নিষ্প্রয়োজন। এই কাহিনী হচ্ছে আত্মত্যাগ ও মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করার মর্মন্তুদ কাহিনী। তবে এইটুকু মাত্র বলা যেতে পারে, গোবিন্দ যখন মহাজনের শেষ কিস্তি শোধ দেয়, তখন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে ভোজ দিয়ে তুষ্ট করে।

## ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

### দুর্ভিক্ষ ও মহামারী

জমিদারের প্রকোপ থেকে কোনরকমে গোবিন্দ যখন মুক্তিলাভ করে, তখন মনে করা গিয়েছিল যে, বাকী জীবনটা তার সুখেই কাটবে। কিন্তু তার ভাগ্যে তা সম্ভব হয় না। ১৮৭০ সালে কাঞ্চনপুরে সাংঘাতিক মহামারী উপস্থিত হয়। কয়েক বছর আগে, যশোহরের জলাভূমিতে এই রোগ আত্মপ্রকাশ করে। ইহা ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে যাত্রা শুরু করে; গ্রামেব পর গ্রাম উজাড় করে এই মহাব্যাধি ভাগীরথী পার হয়ে বর্ধমান জেলাও আক্রমণ করে। ক্রমে কাঞ্চনপুরও আক্রান্ত হয়। অনেকে প্রাণত্যাগ করে। প্রত্যেক দিনই শোনা যায়, 'হরি, হরিবোল! হরিবোল! হরি!' পুকুরের পাড়ে চিতা আর নিভতে চায় না। গোবিন্দ জীবনে গাঁয়ের এমন দৃশ্য আর কোনদিন চোখে দেখে নি। গোবিন্দও রোগে আক্রান্ত হয়। বাড়ির আর সবাই কয়েকদিনের মধ্যে সেরে উঠলেও গোবিন্দ কয়েক সপ্তাহ পড়ে থাকে। শেষে রোগ আক্রমণ করে সুন্দরীকে ও এই রোগে সে মারা পড়ে। মায়ের মৃত্যু গোবিন্দ'র বুকে শেলের মতই বাজে। নিজেকে বাস্তবিকই সে অসহায় শিশু মনে করে। যাহোক, ধারকর্জ করেও সে যথারীতি মায়ের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এবারও তাকে গোলক পোদ্দারের কাছে ঋণ নিতে হয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে সে চার আনা হিসাবে ভোজন দক্ষিণা এবং শত শত কাঙালীকে পয়সা ও অন্ন দ্বারা তৃপ্ত করে।

কথায় বলে, দুর্ভাগ্য যখন আসে, ঝাঁক বেঁধে আসে। গোবিন্দ

সামন্তর অদৃষ্টে এই প্রবচনটা বিশেষভাবেই প্রতিফলিত হয়। একটার পর একটা বিপদ লেগেই আছে; একটার তাল না সামলাতেই আর একটা এসে পড়ে। এতদিন পর্যন্ত সে শির উন্নত রেখে সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম করেছে; কিন্তু দেহ তার ক্রমশঃ দুর্বল হ'য়ে পড়ে; কাজেই ১৮৭৩ সালের মন্বন্তরে সে যে ভেঙে পড়বে, তাতে আর আশ্চর্যের কি থাকতে পারে?

এই বৎসরের গোড়াতেই, তদানীন্তন ছোট লাট স্যার জন ক্যাম্বেলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আসন্ন মন্বন্তরের পূর্বাভাষ বুঝতে পেরে সিমলায় শৈল-বিহার-নিমগ্ন তদানীন্তন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারত সরকার পূর্ব থেকে প্রস্তুত হয়, দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের বাঁচাবার জন্য বহু খাদ্যশস্য সঞ্চিত রাখে। পরবর্তী ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পলও যথেষ্ট তৎপরতা দেখান। ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে তত-বেশি লোক ক্ষয় হয় না।

অনাবৃষ্টিই দুর্ভিক্ষের কারণ। গোবিন্দ জমিতে এক চতুর্থাংশ শস্যও পায় না। কি করে সংসার চালাবে সেই ভাবনায় সে অস্থির হয়। যে ফসল সে পায় তাতে মাত্র তিন মাস চলবে; অতঃপর দিন মজুরি? কিন্তু সকলেরই যে একই অবস্থা। কে কাকে খাটায়? এখন কি উপায়? তখন বর্ধমান যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। মহারাজা মহাতাব্ চাঁদ বাহাদুর রিলিফ খুলে প্রত্যেক দিন দু'হাজার কুলি খাটাচ্ছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, সজল চোখেই গোবিন্দ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে বর্ধমানের উদ্দেশে। জীবনে সে কখনো দিন মজুর হিসেবে খাটে নি। এখন প্রবীণ বয়সে তাকে দিন মজুরের হীন জীবন যাপন করতে হবে, চিন্তায় তার বুকের রক্ত শুকিয়ে আসে। অন্যান্য মজুরের মতই সে মহারাজার রিলিফে কাজ করে দৈনিক পারিশ্রমিক পায়। কিন্তু অবমাননার অস্বোয়াস্তি দিনরাত তার মনকে পীড়া দেয়। সমস্ত তেজোবীর্য তার শুকিয়ে যায়। নিজের দুর্গত অবস্থার জন্য সে দিন রাত চোখের জল ফেলে। তার স্বাস্থ্য ভেঙে

পড়ে, দেহটা কঙ্কাল-সার হয়। হৃদয়ও তার ভেঙে পড়ে। একদিন সকালে গৃহ ও ভালবাসার লোকজন থেকে বহু দূরবর্তী তার দীন কুঁড়ে ঘরে দেখা যায়, তার মৃত দেহ পড়ে আছে। এই শোচনীয় সংবাদ শুনে, তার ছেলে তাড়াতাড়ি বর্ধমান এসে, পিতার মৃতদেহ চিতায় স্থাপন করে ভস্মীভূত করে। গোবিন্দ এমনি ক'রে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করে।

সমাপ্ত